জ্যাকলন্ডন অমনিবাস

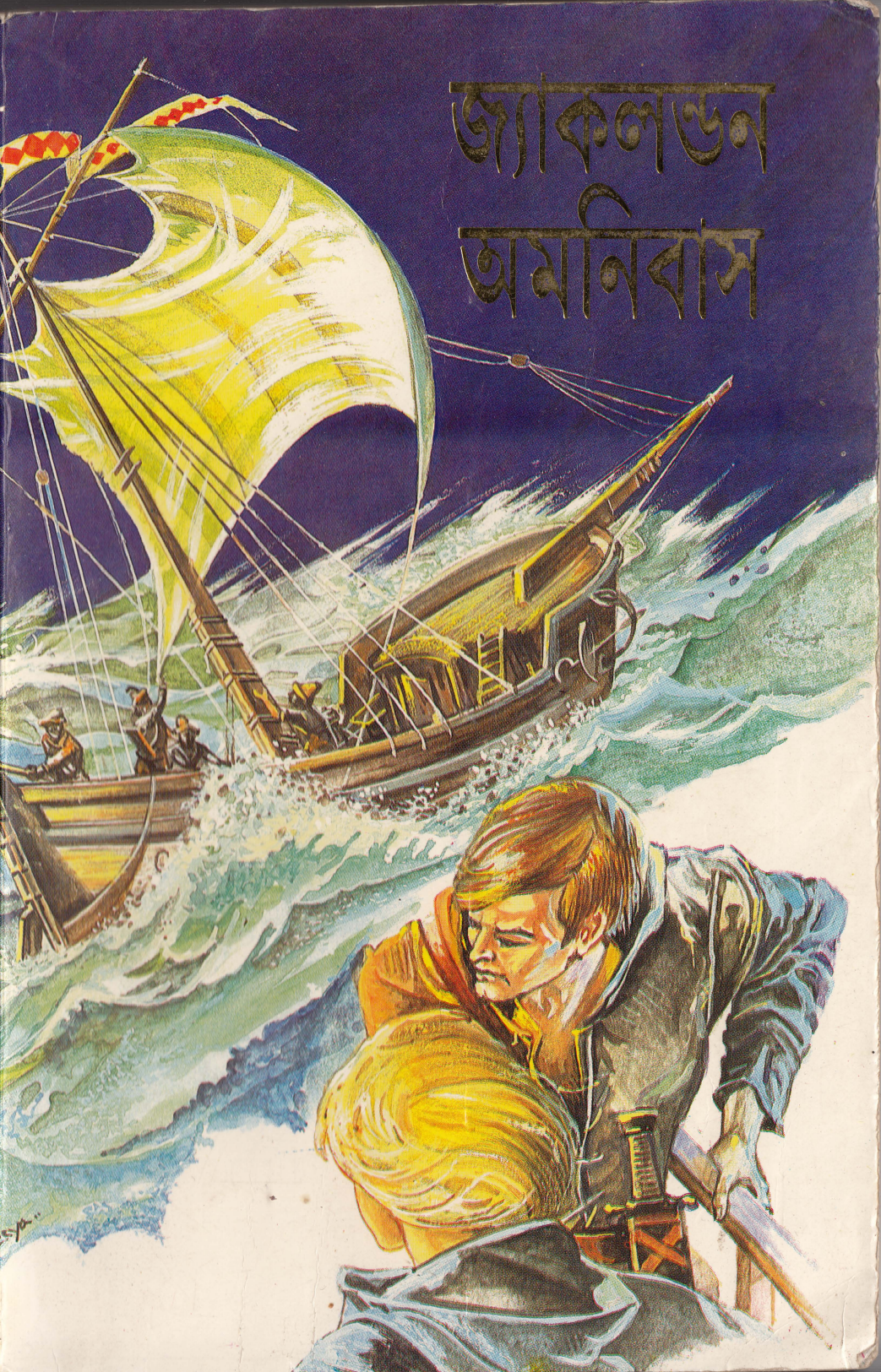

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

জ্যাক লণ্ডন অমনিবাস

জ্যাক লণ্ডন অমনিবাস

অনুবাদঃ ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

JACK LONDON OMNIBUS
Translated by Dhrubajyoti Choudhury

প্রকাশকাল ঃ
কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৮

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
সত্য চক্রবর্তী

প্রকাশক ঃ
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রণে ঃ
আদ্যাশক্তি প্রিণ্টার্স
২৪৩/২সি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৬

দাম ঃ আশি টাকা

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বাবা)

ও

আভাময়ী চৌধুরী (মা)-কে

অনুবাদক

জ্যাক লন্ডন (১৮৭৬-১৯১৬) ঃ তাঁর জীবনই ছিল তাঁর সাহিত্য

'শান্তশিষ্ট আত্মতৃপ্ত হয়ে বেঁচে থাকাটাই অনেক বেশি সহজ ; অবশ্য এই রকম শান্তশিষ্ট, তৃপ্ত জীবনযাপনকে আদৌ বেঁচে থাকাই বলা যায় না।'

—জ্যাক লন্ডন

জ্যাক লন্ডনের এই উক্তিটি থেকেই তাঁর জীবনদর্শনের মূলমন্ত্রটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সবটুকু উপদানই তিনি পেয়েছেন তাঁর নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

মাত্র ৪০ বছর বেঁচেছিলেন জ্যাক লন্ডন। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনের প্রথম যৌবনেই ঝিনুকচালানের বোম্বেটেগিরি, সরকারি টহলদারি, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে সিল শিকারি, যুদ্ধকালীন সংবাদদাতা, ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিকতা—এই সমস্ত বিচিত্র পেশার মাধ্যমে তিনি ভরে তুলেছিলেন তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ঝুলি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে সুদূর উত্তরের 'ক্লনডাইক' অঞ্চলে যে 'স্বর্ণ অভিযান' বা 'গোল্ড রাশ' শুরু হয়, দুঃসাহসী জ্যাক লন্ডন ছিলেন তাঁর প্রথম অভিযাত্রীদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, তিনিই ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রথম আমেরিকান লেখক ও সুদক্ষ বক্তা।

চরম দারিদ্র্য থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব কৃতিত্বে জ্যাক লন্ডন হয়ে উঠেছিলেন আমেরিকার জনপ্রিয়তম এবং অন্যতম ধনী লেখক। কিন্তু তাঁর অস্থির অতৃপ্ত জীবনদেবতা বেশিদিন তাঁকে এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করতে দেননি। মাত্র ৪০ বছর বয়সেই বেশিমাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন জ্যাক লন্ডন। কিন্তু তাঁর জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও বিশ্বসাহিত্যে তিনি রেখে গিয়েছেন এক চিরস্থায়ী ছাপ।

অনুবাদক

অনুবাদকের দু চারটি কথা

খুব ছোটবেলায় হঠাৎই জ্যাক লন্ডনের 'হোয়াইট ফ্যাঙ' বইটির একটি বাংলা অনুবাদ আমার হাতে এসে গিয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে সেই বইখানি পড়ে ফেলতে গিয়ে জ্যাক লন্ডনের রচনার প্রতি আমার গড়ে উঠেছিল এক তীব্র আকর্ষণ। পরবর্তী জীবনে বিশ্বসাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া ও লেখালেখি করার খুব ক্ষুদ্র চেষ্টা করেছি; কিন্তু জ্যাক লন্ডনের ওপর শৈশবে গড়ে ওঠা সেই অমোঘ আকর্ষণ কখনো ভুলতে পারিনি।

বেশ কয়েক বছর আগে বইমেলার আড্ডাতেই একদিন আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সুহৃদ শ্রীমান দেবকুমার বসু আমাকে 'জ্যাক লন্ডনের' কাহিনীগুলি বাংলায় অনুবাদ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অতএব এই বইখানি যদি পাঠকদের কিছুমাত্রও তৃপ্তি দিতে পারে, তাহলে তার সবটুকু কৃতিত্ব-ই স্নেহভাজন দেবকুমারের।

পরিশেষে এই বইটির পেছনে আর একজনের নীরব অবদানের কথা স্বীকার করতেই হবে। তিনি হলেন আমার সহধর্মিনী শিখা চৌধুরী। বহুদিন যাবৎ লেখালেখির কাজ শুরু করলেও প্রতিদিন নিয়মিত বসে গুছিয়ে লেখা আমার কোনদিনই অভ্যাস ছিল না। সেই কঠিন কাজটাই এই ভদ্রমহিলা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন।

সূচীপত্র

আদিম আহ্বান (CALL OF THE WILD) ৯

বেঁচে থাকার রূপকথা (LOVE OF LIFE) ৩৩

দলছুট (THE APOSTATE) ৪৪

একটু আগুনের জন্য (TO BUILD A FIRE) ৫৯

জিস্ আক-এর কাহিনী (THE STORY OF JEES UCK) ... ৭১

পাসুকের প্রেম (GRIT OF WOMEN) ৮৬

সমুদ্র নেকড়ে (THE SEA WOLF) ৯৮

বিপ্লবী (THE MEXICAN) ১৫৫

বড়দিনের আগন্তুক (TO THE MAN ON THE TRAIL) ... ১৬৮

রূপান্তর (SOUTH OF THE SOLT) ... ১৭৩

লিট্ লিট্-এর বিয়ে (THE MARRIAGE OF LIT LIT)... ১৮৫

জীবন প্রবাহ (THE LAW OF LIFE) ১৯১

শেষ দন্তের কাহিনী (THE WHITE FANG) ১৯৬

পুরুষের বিশ্বাস (THE FAITH OF MAN) ২৬২

শেষ প্রশ্ন (THE GREAR INTEROGATION) ২৭৫

CALL OF THE WILD

আদিম আহ্বান

এক ঃ আলো থেকে আঁধারে

জজসাহেব মনিবের বাড়িতে বাক্-এর দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল যেন একটা সুখ-স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। চার বছর আগে এই বাড়িতেই সে জন্মেছিল। ওর বাবা ছিল প্রকাণ্ড এক 'সেণ্ট বার্নার্ড', আর মা ছিল সুন্দরী 'স্কটিশ শেপার্ড'। বাবার বিরাট আকৃতি আর মা-র সৌন্দর্য—এ দুটোই বাক্-এর মধ্যে পুরোপুরি ফুটে উঠেছিল। সাদা লোমভর্তি চওড়া বুক, মুখে আর মাথায় বাদামী রংয়ের ছোপ। সরু কোমর, সব মিলিয়ে বাক্-এর চেহারাখানা ছিল ঝক্‌ঝকে ধারালো তরোয়ালের মতো চোখ ধাঁধানো। বাক্ চলাফেরাও করত খুব ভারিক্কী চালে। বাড়ির অন্যান্য কুকুর-গুলোকে সে কোনোরকম আমলই দিত না। মনিবের সুবিশাল বাড়ির সব জায়গাতেই বাক্ অবাধে ঘুরে বেড়াত একেবারে লাটসাহেবি চালে। বাচ্চা থেকে বুড়ো—বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই ওর ছিল একই রকম স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক। জজসাহেবের ছোট্ট নাতি-নাত্‌নিরা বাগানের ঝোপঝাড়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে—বাক্ সঙ্গে আছে তাদের অভিভাবক, খেলার সাথী, এমনকি কখনো কখনো তাদের পিঠে চড়াবার ঘোড়া হয়েও। বাড়ির ছোক্‌রারা সাঁতার কাটতে পুকুরে নেমেছে কিংবা শিকার করতে বেরিয়েছে, বাক্ তাদের অবিচ্ছেদ্য সহচর। কিশোরীরা, তরুণীরা ভোরে বা সন্ধ্যায় বেড়াতে বেরিয়েছে, সঙ্গে নিশ্চয়ই আছে দেহরক্ষী বাক্। এমনকি, স্বয়ং জজসাহেব রাতে লাইব্রেরির ঘরে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে লেখাপড়ার কাজ করছেন, তখনও দেখা যাবে বাক্ ঠিক তাঁর পায়ের নিচে চটিজুতোর সামনে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে।

এইভাবে দারুণ খোশমেজাজে যখন বাক্ সময় কাটাচ্ছে তখন হঠাৎ একদিন সুদূর মেরু অঞ্চলের কাছে আলাস্‌কার 'ক্লনডাইক' অঞ্চলে অফুরন্ত সোনার ভাণ্ডারের খোঁজ পাওয়া গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে হাজার হাজার লোক রাতারাতি ভাগ্য ফেরাবার আশায় সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ঐ অঞ্চলের রাস্তা তখন ছিল যেমন কঠিন তেমনই বিপজ্জনক। দিনের পর দিন প্রাণটি হাতে করে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বরফে ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে রাস্তা করে চলতে হত। বাক্-

এর মতো লোমে ঢাকা, শক্তসমর্থ ভাল জাতের কুকুরে টানা 'স্লেজগাড়ি'ই ছিল সেখানে যাওয়ার একমাত্র উপায়। কাজে কাজেই ভাগ্যান্বেষীর দল যে কোনো উপায়ে চড়া দামে চারদিক থেকে ঐ ধরনের কুকুর জোগাড় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এইসব অভিযানের কাহিনী তখন খবরের কাগজে, পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই বেরোত। কিন্তু বাক্ তো আর কাগজ-টাগজ পড়ত না, তাই এতসব কাণ্ডকারখানার খোঁজও রাখত না। তাই সেদিন বিকেলে যখন ম্যানুয়েল নামে বাগানের মালীটা ওকে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তখন বাক্ মনে করেছিল যে ওরা অন্যান্য দিনের মতোই বেড়াতে বেরিয়েছে। তাছাড়া, মনিবের বাড়ির সবাইকে বিশ্বাস করতে হয়, —ছোটবেলা থেকে বাক্ সেটাই জেনে এসেছে। কিন্তু এই ম্যানুয়েল লোকটা ছিল একেবারে পাকা জুয়াড়ি আর ফন্দিবাজ। কি করে জুয়ো খেলার জন্য পয়সা জোগাড় করবে, সেটাই ছিল ওর একমাত্র চিন্তা। ম্যানুয়েল বাক্‌কে নিয়ে সোজা চলে এল কাছাকাছি একটা ছোট্ট স্টেশনে। সেখানে একটা লোক আগে থেকেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল। ম্যানুয়েলের হাতে বেশ কয়েকটা টাকা গুঁজে দিয়ে সে চাপা গলায় বলল—'মালটা বেশ ভাল করে বেঁধে-ছেঁদে আমার হাতে দাওতো বাপু!' ম্যানুয়েল একটা মোটা দড়ি বাক্-এর গলার কলারের নিচে বেশ ভাল করে পেঁচিয়ে দিয়ে উত্তর দিল—'এটাতে জোরে চাপ দিলেই বাছাধনের দম বেরিয়ে যাবে, বুঝলেন!' লোকটা এবার খুশি হয়ে মাথা নাড়ল।

গলায় দড়ি পরানোটা বাক্-এর মোটেই পছন্দ হয়নি। তবে ম্যানুয়েল ওর বাড়ির লোক বলে ও প্রথমটায় কিছুই বলেনি। ঐ অচেনা লোকটা যখন দড়িটা হাতে নিল, তখন বাক্ একটা চাপা গর্জন করে প্রতিবাদ জানাল।—ভাবল, এতেই কাজ হবে। তার বদলে দড়িটা ওর গলার ওপর আরো চেপে বসে ওর প্রায় দম বন্ধ করে দিল। রাগে অস্থির হয়ে বাক্ লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল; কিন্তু লোকটা একটা হ্যাঁচ্‌কা টান মেরে মাঝপথেই ওকে উল্টে ফেলে দিল। তারপর দড়িটাকে ওর গলায় আরো বেশি জোরে পেঁচিয়ে দিতে লাগল। বাক্ যতক্ষণ পারল, নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে গেল। তারপর এক সময় চেতনা হারিয়ে ফেলল সে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর বাক্ টের পেল যে, সে একটা চলন্ত ট্রেনের মাল রাখার কামরায় বসে আছে। জজসাহেবের পরিবারের সঙ্গে এর আগেও সে বহুবার ট্রেনে চেপেছে। চোখ মেলে তাকিয়েই বাক্ পাশের লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—এই লোকটাই তাকে চুরি করে এনেছে। গলায় আগের মতো প্রচণ্ড চাপ দিয়ে যতক্ষণ

না বাক্‌কে আবার অচেতন করে ফেলা হল ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্‌ লোকটার হাত, পা আর পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা করতে লাগল। এবার যখন বাক্‌-এর হুঁশ ফিরল, তখন সে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরে একটা সরাইখানার পেছনের ঘরে পৌঁছে গেছে। যে চোরটাকে ও কামড়ে দিয়েছে, সে আর সরাইখানার মালিক—এই দুজনে মিলে এবার ওকে জোর করে চেপে ধরে ওর গলার ভারী পেতলের কলারটা কেটে খুলে ফেলল। তারপর খাঁচার মতো একটা বড় কাঠের বাক্সে ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে গুদামঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেল। বাক্‌-এর গলায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, আর দারুণ তেষ্টাও পেয়েছিল ওর। কিন্তু শরীরের যন্ত্রণার থেকেও একটা অসহায় রাগ আর দুঃখেই ও কষ্ট পাচ্ছিল বেশি। সারারাত ও সেই খাঁচাটার মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করল। মানুষের কাছ থেকে এরকম ব্যবহার ও কখনো পায়নি—তাই ব্যাপারটা যে কি ঘটেছে, সেটা ও কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। এই লোকগুলো কি করতে চায় তাকে নিয়ে—কেন-ই বা তাকে এরকম একটা খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে? কেনই বা অকারণে তার সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হচ্ছে? এত কষ্টের মধ্যেও মাঝে মাঝে ওর মনে হচ্ছিল, হয়তো বা জজসাহেব নিজে বা বাড়ির আর কেউ এসে ওকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাবে। যতবারই সরাইখানার মালিকটা আলো হাতে এসে গুদামঘরের দরজা খুলছিল, ততবারই ও এই আশায় লাফিয়ে উঠ্‌ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কেউই এল না ওকে মুক্তি দেওয়ার জন্য।

পরের দিন সকালে চারটে গুণ্ডার মতো লোক এসে ওর খাঁচাটা একটা ট্রাকে তুলে স্টিমারঘাটে নিয়ে গেল। অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে খাঁচাবন্ধ বাক্‌ও স্টিমারে চড়ে একটা বড় রেলজংশনে গিয়ে নামল। এবার এক দূরপাল্লার ট্রেন বাক্‌কে নিয়ে ছুটে চলল দু'দিন দু'রাত। এই পুরো সময়টা বাক্‌ কোনোরকম খাবার বা একফোঁটা জলও খায়নি। ক্ষিধে, তেষ্টা আর আতঙ্কে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল সে। শেষ পর্যন্ত ওর ট্রেন যখন 'সিআট্‌ল' শহরে এসে থামল, তখন ওর লাল চোখ আর রাগী শয়তানের মতো চেহারা দেখলে স্বয়ং জজসাহেবও বোধহয় ওকে চিনতে পারতেন না। কুলীরা ওর খাঁচাটাকে পাঁচিল ঘেরা একটা বড় খোলা জায়গায় এনে রাখল। এবার লাল সোয়েটার পরা একটা লোক হাতে মোটা লাঠি আর শাবল নিয়ে ওর খাঁচার দিকে এগিয়ে এল। বাক্‌ বুঝতে পারল, এবার নিশ্চয়ই এই লোকটাও ওর ওপর জোরজুলুম করবে। কিন্তু বাক্‌ এতক্ষণে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। রাগে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে ও বন্ধ খাঁচার শিকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা অবশ্য তাতে একটুও ঘাবড়াল না। মুচ্‌কি হেসে শাবলের চাড় দিয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে

দিয়ে লাঠি বাগিয়ে তৈরি হয়ে রইল। খাঁচা থেকে বেরিয়েই বাক্ লোকটার গলা কামড়ে ধরবার জন্য লাফ দিল আর মাঝপথেই চোয়ালে প্রচণ্ড একটা লাঠির বাড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। যতবারই ও ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, ততবারই কখনো মাথায়, কখনো বা মুখে লাঠির বাড়ি খেয়ে ছিট্‌কে পড়তে লাগল। ওর নাক, মুখ, কান দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল সমানে। ওর গায়ের চক্‌চকে লোমগুলো ধুলোয়, কাদায়, রক্তে চট্‌চটে হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চালিয়ে এক সময় ও চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

হুঁশ ফেরার পর বাক্-এর মনে হল, কেউ যেন নিংড়ে ওর শরীর থেকে সবটুকু শক্তি বার করে নিয়েছে। লাল সোয়েটার পরা লোকটা এতক্ষণে সরাইখানার মালিকের চিঠি থেকে বাক্-এর সব খবর জেনে নিয়েছে। সে এবার বলে উঠল—'তাহলে বাক্, সব ঠিক আছে তো? ভালভাবে থাক, কেউ কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু বদমাইসি করলেই ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব, বুঝলি?' কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বেশ নিশ্চিন্তভাবে বাক্-এর মাথাটা বার কয়েক চাপড়ে দিল।

বাধা দেওয়ার মতো বিন্দুমাত্র শক্তিও আর এখন বাক্-এর শরীরে ছিল না। তাছাড়া, এতক্ষণে ও বুঝে গেছিল যে, যে মানুষের হাতে লাঠি আছে, সেই প্রভু—তার সঙ্গে লড়াই করে কোনো লাভ নেই। তাকে ভালবাসতে না পারলেও, তার কথা মানতেই হবে। তাই লোকটা যখন ওর জন্য খাবার আর জল নিয়ে এল, তখন ও নির্বিবাদে সেগুলো খেয়ে নিল।

কয়েকদিন এই লোকটার কাছে থাকবার পর পেরোঁ নামে একটা বেঁটে, ছোটখাট লোক এসে বাক্‌কে তিনশো ডলার দিয়ে কিনে নিল। লোকটা ছিল কানাডা সরকারের ডাকহরকরা। তারপর আরো কয়েকটা কুকুর কিনে ফ্রাঙ্কো নামে এক সহকারীর সঙ্গে সে জাহাজে চড়ে বসল। দক্ষিণের জন্মভূমি থেকে চিরবিদায় নিল বাক্। যে তিনটে কুকুর জাহাজে বাক্-এর সঙ্গী হল, তাদের নাম কার্লি, ডেভ্ আর স্পিট্‌জ্। বহুদিন ধরে চলার পর অবশেষে জাহাজ একদিন সুদূর উত্তরে 'ডাইয়া'-র সমুদ্রতীরে এসে নোঙর ফেলল। বাক্ বাইরে আসা মাত্র কন্‌কনে ঠাণ্ডায় যেন ওর সারা শরীর জমে গেল, আর ঠাণ্ডা, সাদা, নরম কাদার মতো কি একটা জিনিসের মধ্যে ওর পা ডুবে গেল। আকাশ থেকেও ঐ সাদা জিনিসটা সমানে ওর গায়ে ঝরে পড়তে লাগল, গলে যেতে লাগল। বরফ পড়ার সঙ্গে বাক্-এর এই প্রথম পরিচয়।

দুই : জোর যার, মুল্লুক তার

'ডাইয়া'তে এসে বাক্ টের পেল যে, সে তার এতদিনকার পরিচিত সভ্য জগৎ থেকে উপ্‌ড়ে এসে পড়েছে ঠিক উল্টো এক জগতে। 'জোর যার, মুল্লুক তার'—এটাই হচ্ছে এই জগতের একমাত্র চালু আইন। যে সব কুকুরগুলো এখানে এসে জড়ো হচ্ছিল, ঠিক বুনো নেকড়েদের মতোই তাদের চালচলন—আর সব সময়েই তারা লড়াই করছে। এ রকম ধরনের কুকুর বাক্ আগে কখনো দেখেনি। তাদের লড়াই করবার কায়দাও একদম আলাদা। যে আক্রমণ করে, সে লাফিয়ে এসে চোখের পলকে কামড় বসিয়ে আবার লাফিয়ে সরে যায়। লড়াই করতে করতে যদি কেউ মাটিতে পড়ে যায়, তবে তার ভাগ্যে নিশ্চিত মৃত্যু। যে সব কুকুরগুলো গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছে, তারা তক্ষুনি পড়ে যাওয়া কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। 'ডাইয়া'তে এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর জাহাজের বন্ধু কার্লির এই অবস্থা হতে দেখে বাক্ বুঝে নিল, কারো সঙ্গে লড়াই বাধলে কিছুতেই মাটিতে পড়ে যাওয়া চলবে না। আরো একটা অভিজ্ঞতা বাক্-এর হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ওর মনিব ওর বুকে আর গলায় বক্‌ল্‌স্ আর চামড়ার চওড়া ফিতে এঁটে ওকে অন্য কুকুরদের সঙ্গে 'স্লেজ' গাড়িতে জুড়ে দিল। জজসাহেবের বাড়িতে বাক্ ঘোড়াদের এইভাবে মুখে লাগাম পরিয়ে গাড়ির সঙ্গে জুড়তে দেখেছে। ঘোড়াদের দিয়ে যেরকম মালপত্তর বওয়ানো হয়, বাক্‌কেও সেরকম প্রত্যেকদিন অন্যান্য কুকুরদের সঙ্গে 'স্লেজ'গাড়ি টেনে জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ বয়ে আনতে হত। মোটবওয়া জানোয়ারের কাজ করতে গিয়ে বাক্-এর মনে প্রথমটায় খুবই দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু এতদিনে ও বুঝে গেছিল যে, তার দুঃখের এখানে কোনো দামই নেই, মনিবরা লাঠি আর চাবুকের ডগায় তার বাধ্যতা আদায় করে নেবে। তাই বাক্ মন দিয়ে তার এই নতুন কাজ শিখতে লেগে গেল। ওর গাড়ি টানবার ক্ষমতা আর বুদ্ধি দেখে ওর মনিবরা প্রথম দিন থেকেই ওর ওপর খুশি হয়ে উঠল। পেরোঁর কাছে কানাডা সরকারের বহু জরুরি ডাক আর কাগজপত্র জমে গেছিল ও প্রত্যেক দিনই আরো জমে যাচ্ছিল, তাই সেগুলো বিলি করবার কাজে সুদূর 'ক্লনডাইক' এলাকার দিকে বেরিয়ে পড়তে আর ও দেরি করতে চাইছিল না। একদিনের মধ্যেই সে আরো কয়েকটা ভাল জাতের শক্ত সমর্থ কুকুর জোগাড় করে আনল—তাদের নাম বিলি, জেন আর 'সোল-লেক' বা 'রাগী মানুষ'। এই শেষ কুকুরটার একটা চোখ কানা। 'স্লেজ' টানার অভিজ্ঞতায় ও তল্লাটে তার জুড়ি ছিল না।

এখানে এসে প্রথম দিন রাতে ঘুমতে গিয়ে বাক্ খুব বিপদে পড়ে গেল। যে ধূ ধূ মাঠের মধ্যে ওর মনিবরা তাঁবু খাটিয়েছিল, বাক্ প্রথমে সেখানেই গিয়ে ঢুকল, কারণ ঢাকা ছাদের নিচে ঘেরা জায়গাতে ঘুমনোই ওর এতদিনের অভ্যেস। কিন্তু পেরোঁ আর ফ্রাঙ্কো ওকে সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর বাইরে তাড়িয়ে দিল। বরফে ঢাকা মাঠের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল বাক্—কোথায়, কী ভাবে যে এই হাড়কাঁপানো শীতে বরফের মধ্যে ও শোবে, তা ও বুঝে উঠতে পারছিল না। অন্যান্য কুকুরগুলোই বা গেল কোথায় ? হঠাৎ একটা জায়গায় ওর সামনের পা দুটো বরফের মধ্যে ঢুকে গেল, আর ওর পায়ের তলায় কি যেন একটা নড়ে উঠল। প্রথমে বাক্ খুব চমকে গেছিল। পরে ও বুঝতে পারল যে বিলি বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। এবার বাক্ ব্যাপারটা বুঝতে পারল। সে-ও একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর গায়ের তাপে গর্তের ছোট বদ্ধ জায়গাটা গরম হয়ে উঠল। এবার মহা আরামে ঘুমিয়ে পড়ল বাক্। সকালবেলায় যখন ওর ঘুম ভাঙল, তখন বাক্ প্রথমে বুঝতেই পারছিল না, ও এই গর্তের মধ্যে কি করে এল। সারারাত ধরে বরফ পড়ে ও একেবারে চাপা পড়ে গেছিল। হঠাৎ ওর মনে একটা দারুণ আতঙ্ক হল—ওর মনে যেন ফাঁদে আট্‌কা পড়ার একটা আদিম ভীতি জেগে উঠল। একটা গর্জন করে সোজা লাফিয়ে উঠে বরফের স্তূপের তলা থেকে বেরিয়ে এল বাক্, আর সঙ্গে সঙ্গেই এখনকার সব কথা ওর মনে পড়ে গেল।

এদিন আরো তিনটে কুকুর জোগাড় করে পেরোঁ আর ফ্রাঙ্কো তাদের লম্বা সফরে বেরিয়ে পড়ল। ওদের স্লেজ গাড়িতে জোড়া হল মোট ন'টা কুকুর। দলপতি হল স্পিট্‌জ্। আগে ডেভ আর পেছনে 'সোল-লেক'—'স্লেজ' চালানোয় বহু অভিজ্ঞ এই দুই যোদ্ধার মাঝখানে বাক্‌কে রাখা হল, যাতে ও তাদের সঙ্গে ঠিকমতো তাল মিলিয়ে স্লেজ টানাতে পোক্ত হয়ে উঠতে পারে। দুই অভিজ্ঞ সহকর্মীর শাসানি আর কামড়ে বাক্ খুব শিগ্‌গিরই এক ওস্তাদ স্লেজ টানিয়ে কুকুর হয়ে উঠল। দিনের পর দিন শূন্য ডিগ্রীর বহু নিচে কঠিন তুষার প্রান্তরের বুক চিরে তারা উত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রতিদিন একই নিয়মে তারা চলত, খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই তাদের পথচলা আরম্ভ হত, আর যাত্রা শেষ হত সন্ধ্যে গড়িয়ে যাওয়ার পর। প্রত্যেক কুকুরের খাবারের জন্যে দৈনিক বরাদ্দ ছিল এক পাউণ্ড করে আগুনে সেঁকা সার্ডিন মাছ। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগুনের পাশে বসে সবাই একটু গা গরম করে নিত। তারপরেই যে যার নিজের মতো বরফের মধ্যে গর্ত করে শুয়ে পড়ত। বাক্-এর দৈনিক বরাদ্দ ছিল একটু বেশি, দেড় পাউণ্ড মাছ।

কিন্তু বেশি খেয়েও কোনো সময়েই বাক্-এর যেন পেট ভরত না। পুরনো জীবনে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বাক্-এর খুব বাছাবাছি ছিল। নিজের পছন্দমতো খাবার ছাড়া ও কিছু খেত না, আর খেতও খুব ভদ্রভাবে, আস্তে আস্তে। কিন্তু এখানে সে রকম বাছবিচার করবার কোনো উপায় ছিল না। অবশ্য সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যে কোনো খাবারই লোভনীয় মনে হত, আর পেটে গেলেই হজম হয়ে যেত। তাছাড়া, খেতে দেরি করলেই অন্যান্য কুকুরেরা ওর ভাগের বাকি খাবারটুকু খেয়ে নেবে। তাই বাক্‌কেও তার খাবারটুকু আর সবার মতোই একেবারে গোগ্রাসে গিলে খেতে হত। অন্য কুকুরগুলো সুবিধে পেলেই মনিবদের খাবার চুরি করে খেত। আস্তে আস্তে বাক্-ও এই চুরিবিদ্যায় পাকা হয়ে উঠল। ও এতদিনে হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছিল যে, এখানে বেঁচে থাকতে গেলে পুরনো জীবনের চালচলন একেবারে ভুলে যেতে হবে। আস্তে আস্তে পোষমানা জীবনের আয়েসি ভাব মুছে গিয়ে ওর শরীর ঠিক লোহার মতো কঠিন হয়ে উঠল—চোখ, কান আর নাকের ক্ষমতাও বেড়ে গেল বহুগুণ। লোহার ভাঁটার মতো শক্ত থাবা দিয়ে ঘা মেরে কঠিন বরফ ফাটিয়ে তার তলা থেকে খাবার জল বার করতে, থাবার মধ্যে ঢুকে থাকা বরফের কুচি দাঁত দিয়ে টেনে আনতে, ঠাণ্ডা বাতাস বাঁচিয়ে ঠিক জায়গাটিতে ঘুমনোর গর্ত খুঁড়তে এখন আর বাক্-এর কোনোরকম অসুবিধেই হয় না। বহুদিন আগে বাক্-এর বুনো পূর্বপুরুষরা মানুষের কাছে পোষ মেনেছিল। বহু পুরুষ ধরে মানুষের সংসারের পোষা জীব হয়ে থাকতে থাকতে ওদের এইসব আদিম অনুভূতি আর ক্ষমতা চাপা পড়ে গেছিল। কিন্তু এখন নিয়মবাঁধা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে বাক্ যেন সেই সব ক্ষমতাগুলো আবার ফিরে পেতে লাগল। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ কোনো শীতের রাতে কি যেন এক অজানা বিষণ্ণতায় বাক্-এর মন ভরে যেত, তখন ও খোলা আকাশের নিচে বসে তারাদের দিকে নাক তুলে একটানা কান্না কেঁদে যেত। যুগ যুগ ধরে ওর পূর্বপুরুষরা এইভাবেই আকাশের তারাদের কাছে তাদের দুঃখের কথা জানিয়ে এসেছে।

তিন ঃ বাঁচা মরার লড়াই

দিনের পর দিন বাক্ আর তার সঙ্গীরা একইভাবে এগিয়ে চলল। রাস্তায় প্রায়ই ওদের নানা রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হত। একবার তো বাক্ আর ডেভ পাতলা বরফ ভেঙে জলের মধ্যে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল। ওদের যখন টেনে তোলা হল, তখন

ওরা জমে অসাড় হয়ে গেছে। আগুন জেবলে তার চারপাশে দৌড় করিয়ে তবে ওদের শরীরে সাড় ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। অবশেষে ওরা একদিন 'ডসন'-এ এসে পৌঁছল। সেখানে একটা দিন বিশ্রাম নিয়েই আবার শুরু হল ওদের দৌড়। বাক্-এর সঙ্গে দলের অন্যান্য কুকুরদেব এতদিনে বেশ বোঝাপড়া হয়ে গেছিল। তবে দলের নেতা 'স্পিট্জ্'-এর সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ছিল একেবারে সাপ আর নেউলের। স্পিট্জ্ যেন বুঝতে পেরেছিল, দক্ষিণ দেশ থেকে আসা এই অন্য ধরনের কুকুরটা একদিন ওর দলপতির জায়গাটা দখল করে নেবে। আর সত্যি সত্যিই সেটাই ছিল বাক্-এর ইচ্ছে। ও কোনো সময়েই স্পিট্জ্-এর সর্দারি মানতে চাইত না। যখনই স্পিট্জ্ দলের কোনো কুকুরকে শাসন করতে যেত, তখনই বাক্ মধ্যিখানে পড়ে সেই কুকুরটার হয়ে লড়াই শুরু করে দিত। এর ফলে আস্তে আস্তে অন্য কুকুরগুলো আর মোটেই স্পিট্জ্কে মানত না, ভয় করত না। নিজেদের মধ্যেও তারা সব সময় ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি লাগিয়েই রাখত। পেরোঁ আর ফ্রাঙ্কো তো একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ওরা অবশ্য ভালভাবেই জানত যে, এই সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি, বিশৃঙ্খলার আসল কারণ হচ্ছে বাক্। কিন্তু বাক্ ছিল মহা চালাক। সে এমন-ভাবে মনিবদের আড়ালে গণ্ডগোল আর মারামারি লাগিয়ে দিত যে, ওকে হাতে নাতে ধরার কোনো উপায়ই ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্পিট্জ্ একেবারে ক্ষেপে উঠল, ওর একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল, কিভাবে বাক্কে একেবারে খতম করে দেওয়া যায়। বাক্-ও জানত যে, স্পিট্জ্-এর সঙ্গে একটা শেষ লড়াই ওকে করতেই হবে, তাতে হয় সে বেঁচে থাকবে, নয়তো স্পিট্জ্। অবশেষে একদিন এসে গেল সেই চরম মুহূর্তটি। সেদিন যেখানে ওরা রাতের মতো বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেখানে হঠাৎ একটা খরগোসের দেখা পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের দল সেটাকে ধরবার জন্য তাড়া করল। কাছেই পুলিশদের একটি ছাউনি ছিল, সেখানে ছিল একপাল শিকারি কুকুর। তারাও এদের সঙ্গে যোগ দিল। বাক্ যখন খরগোসটাকে প্রায় ধরে ফেলেছে, তখন স্পিট্জ্ অন্য দিক দিয়ে ঘুরে এসে খরগোসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ঝট্কায় সেটাকে মেরে ফেল্ল। তারপর অসতর্ক ছুটন্ত বাক্কে আচমকা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ওর গলা কামড়ে ধরতে গেল। পড়ে যাওয়া মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। তাই চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়াল বাক্। ও বুঝতে পারল যে, এবার শেষ লড়াই-এর সময় এসে গেছে,—হয় মরো, নয় মারো। দুজনের মধ্যে শুরু হল এক মরণপণ লড়াই। অন্যান্য কুকুরগুলো অধীর আগ্রহে ওদের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যে পড়ে যাবে, সে-ই হবে ওদের খাবার। স্পিট্জ্ বহুদিনের অভিজ্ঞ লড়িয়ে

কুকুর। সে বারবার লাফিয়ে এসে আক্রমণ করে কামড়ে বাক্‌কে প্রথমটায় একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলল—বাক্‌-এর সারা গা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাক্‌-এর বুদ্ধিরই জয় হল। ও বার বার নিচু হয়ে গিয়ে স্পিট্‌জ্‌-এর সামনের দুটো পা কামড়ে ধরে হাড় ভেঙে দিয়ে স্পিট্‌জ্‌-কে খোঁড়া করে দিল। স্পিট্‌জ্‌ কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল বটে, কিন্তু ওর গায়ে আর কোনো জোর ছিল না। এবার সুযোগ বুঝে বাক্‌ লাফিয়ে গিয়ে কাঁধে ধাক্কা মেরে স্পিট্‌জ্‌কে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরের দল সরে এসে মিশে গেল একটি বিন্দুতে আর সেই বিন্দুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল স্পিট্‌জ্‌-এর দেহ।

চার ঃ দলপতি বাক্‌

পরের দিন ভোরে যাত্রা আরম্ভ করার সময়েই পেরোঁ আর ফ্রাঙ্কো টের পেল যে, বাক্‌ স্পিট্‌জ্‌-কে খতম করে দিয়েছে। ওরা স্পিট্‌জ্‌-এর জায়গায় 'সোল লেক'-কে স্লেজের মাথায় জুড়তে গেল। কিন্তু বাক্‌ তক্ষুনি লাফিয়ে পড়ে 'সোল-লেক'-কে সরিয়ে দিয়ে নিজে স্পিট্‌জ্‌-এর জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক লড়াই করেছে, অনেক রক্ত ঝরিয়েছে সে এই জায়গায় দাঁড়ানর জন্য। এই জায়গা ও কিছুতেই আর কাউকে ছেড়ে দেবে না। তাই এবার খোলাখুলি বিদ্রোহ করে বসল বাক্‌। যতবারই 'সোল-লেক'-কে সামনে নিয়ে যাওয়া হল, ততবারই ও চাপা একটা গর্জন করে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল। 'সোল-লেক' এর-ও দলপতি হতে মোটেই আগ্রহ ছিল না। সেনাপতি নয়, সৈন্য হয়ে কাজ করতেই তার বেশি আগ্রহ। যাইহোক, পেঁরো আর ফ্রাঙ্কো একঘণ্টা ধরে সমানে ধমকিয়ে লাঠি আর চাবুকের ভয় দেখিয়েও বাক্‌কে বাগে আনতে পারল না। মনিবদের লাঠি আর চাবুকের নাগাল এড়িয়ে গজরাতে গজরাতে ঘুরতে লাগল বাক্‌। শেষ পর্যন্ত ওর দুই মনিব হাল ছেড়ে দিয়ে বাক্‌কেই স্পিট্‌জ্‌-এর জায়গায় নিয়ে গেল। দলপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্‌ বাকি দলকে একেবারে পুরোপুরি নিজের আয়ত্তে নিয়ে এল। এমন কি দলের সবচাইতে ফাঁকিবাজ আর বেয়াড়া কুকুর জো, যাকে স্পিট্‌জ্‌-ও বাগে আনতে পারেনি, তাকেও বাক্‌ শাসিয়ে আর কামড়িয়ে নিজের কব্জায় এনে ফেলল। কয়েক-দিনের মধ্যে পুরো দলটার কাজকর্মের ধারাই পালটে গেল, সব কটা কুকুর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি কামড়াকামড়ি একেবারে বন্ধ করে দিয়ে বাক্‌-এর সঙ্গে একমনে স্লেজ

টানার কাজে লেগে গেল। ফলে প্রত্যেকদিন গড়ে প্রায় চল্লিশ মাইল করে দৌড়ে 'ডসন' থেকে মাত্র দু সপ্তাহের মধ্যেই ওরা পথের শেষ গন্তব্যস্থল 'স্ক্যাগওয়ে'তে গিয়ে পেঁছিল। এত কম সময়ে এর আগে আর কোনো দল এই রাস্তা পেরোতে পারেনি। কাজে কাজেই পেরোঁ ফ্রাঙ্কো আর বাক্ রাতারাতি এই শহরের 'হিরো' বনে গেল। কিন্তু এর দু'তিন দিনের মধ্যেই সরকারি নির্দেশে পেরোঁ আর ফ্রাঙ্কো-কে অন্য জায়গায় চলে যেতে হল। বাক্-এর সঙ্গে এই ওদের শেষ দেখা। যাওয়ার আগে ফ্রাঙ্কো বাক্‌কে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলেছিল। মনিব হিসাবে সে হয়ত কঠোর ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর ছিল না। বাক্‌কে সে সত্যিই ভাল-বেসে ফেলেছিল, কারণ এরকম কুকুর সে আর দুটি দেখেনি।

এবার বাক্-এর মনিব হল একজন দো-আঁশলা স্কচ। বাক্ ও তার দলবল আবার ডসন-এর পথে তাদের ক্লান্তিকর ফেরৎ যাত্রা শুরু করল। এবার তাদের স্লেজটা ছিল প্রধান সরকারি ডাকগাড়ি, তাই তাতে মালের বোঝাও ছিল অনেক বেশি। এতে বাক্‌দের খাটুনি বেড়ে গেল বহুগুণ। ওরা এখন খুব ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাক্ সম্পূর্ণ একমনে তার কাজ করে চলেছিল।

প্রতিদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতে খাওয়া দাওয়ার পর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছ ঘেঁষে গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকত বাক্—আর আগুনের শিখার দিকে আধবোজা স্বপ্নাতুর চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে অনেক চিন্তা খেলা করে যেত। মাঝে মাঝে ওর মনে পড়ে যেত জজসাহেবের বাড়ির কথা, সেখানকার উষ্ণতা, আরাম, সাঁতারের পুকুর, বাচ্চাগুলো, অন্য পোষা কুকুরগুলোর কথা,—সে যেন অন্য কোনো এক জীবনের স্মৃতি। তবে সেই পুরনো দিনগুলোর কথা ভেবে এখন আর ওর তত মন খারাপ করত না, বরং আদিম পূর্বপুরুষদের যে সমস্ত অনুভূতি ওর মধ্যে নতুন করে জেগে উঠছিল, সেগুলোই ওর চিন্তাকে বেশি করে নাড়া দিত। বাক্ প্রায়ই স্বপ্ন দেখত, আগুনের সামনে ওর যে প্রভু দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন আসলে একটা গুহামানব। তার হাতে ধরা আছে ভারী মুগুর। বাক্ যেন তার সঙ্গে কোনো এক গুহার মধ্যে বসে আছে। গুহামানব মনিবের মাথাটা ছোট, হাতদুটো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, সারা গায়ে বড় বড় লোম।

জজসাহেবের বাড়িতে যে পোষা শিম্পাঞ্জিটা ছিল তার সঙ্গেই যেন এর চেহারার, চলাফেরার বেশি মিল। গাছের ডালে আর মাটিতে তার সমান গতি। সন্ধ্যে নেমে এলেই তার মনিব গুহার মুখে আগুন জেবলে দু'হাতে মাথা ঢেকে গুহার ভেতরে

বসে থাকে আর প্রায়ই ভয়ে ভয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকায়,—অনেক জোড়া হিংস্র চোখ যেন সেখানে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। ঘুমের মধ্যেই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে বাক্‌ চোখ খুলে দেখত, ভোর হয়ে গেছে।

এবার যখন বাক্‌-এর দল 'ডসন' গিয়ে পেঁছিল, তখন ওরা সকলেই খুব দুর্বল আর রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু ওদের কপালে বিশ্রাম জুটল না। দুদিনের মধ্যেই চিঠিপত্তরের বোঝা নিয়ে ওদেরকে আবার 'স্ক্যাগওয়ে'র দিকে বেরিয়ে পড়তে হল। এর মধ্যে বরফ পড়া শুরু হওয়ায় ওদের যাওয়ার রাস্তাকে নরম আর পেছল করে তুলল। ফলে ওদের খাটুনি আর বিপদ আরো বেড়েই গেল। গাড়ি যারা চালাত তারা অবশ্য কুকুরগুলোকে প্রাণপণে যত্ন করত। কিন্তু তাতে কোনো ফল হত না।

পাঁচ ঃ মরণের মুখোমুখি

তিরিশ দিন বাদে বাক্‌-এর দল যখন আবার 'স্ক্যাগওয়ে'তে এসে পেঁছিল, তখন চরম ক্লান্তি আর দুর্বলতায় ওরা সকলেই ধুঁক্‌ছে, গাড়িচালকদের অবস্থাও শোচনীয়। ওরা সবাই ভেবেছিল এবার নিশ্চয়ই একটা লম্বা বিশ্রাম পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রত্যেকদিন এত লোক ভাগ্য ফেরাবার আশায় 'ক্লনডাইক' এলাকায় এসে ঢুকছিল, আর তাদের খোঁজ খবর দেওয়া নেওয়ার জন্য সবসময়েই এত চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছিল যে, ডাকগাড়ি বেশি দিন বন্ধ রাখার কোনো উপায়ই ছিল না। তাই বাক্‌দের ডাকগাড়ি 'স্ক্যাগওয়ে'তে এসে পেঁছিনোর দু'দিনের মধ্যেই সরকারি আদেশ এলো যে, ডাকগাড়ি চালু রাখার জন্য ক্লান্ত, দুর্বল কুকুরগুলোকে বাতিল করে দিয়ে নতুন তাজা কুকুরের দল জোগাড় করা হবে। পুরনো কুকুরগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। এতে বেশ কিছু পয়সাও আসবে—কতগুলো ঝিমিয়ে পড়া, দুর্বল কুকুর সভ্য মানুষের কাছে এছাড়া আর কি-ই বা আশা করতে পারে? অতএব, তিন দিন বাদেই হল্‌ আর চার্লস নামে দুটো চাষাড়ে গোছের লোক নামমাত্র দামে সব সাজসরঞ্জাম সুদ্ধ বাক্‌দের পুরো দলটাকে কিনে নিল—ঐ দিনই তারা 'ডসন'-এর দিকে যাত্রা করবে। নতুন মনিবদের তাঁবুতে গিয়ে বাক্‌ দেখল যে, সে একটা ছন্ন-ছাড়া, নোংরা পরিবারের মধ্যে এসে পড়েছে। এরা যেভাবে পারল স্লেজগাড়িতে মালপত্র বোঝাই করতে লাগল। তাতে বাক্‌ ভালভাবেই বুঝতে পেরে গেল যে এদের না আছে কোনো অভিজ্ঞতা, না আছে কাজের কোনো ছিরি ছাঁদ। এদের ব্যাপার স্যাপার দেখে আশেপাশের তাঁবুর অনেক লোকজন জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি করে হাসছিল।

একজন তো বলেই ফেলল—'ওহে, তোমাদের মালপত্তরের বোঝাটা তো খুবই বড় আর ভারী হয়ে গেছে দেখছি। আমি হলে মোটেই এই ভারী তাঁবুটাকে বয়ে বেড়াতাম না। শীতকাল তো চলেই গেছে, এখন আর তাঁবু খাটিয়ে ভেতরে না শুলেও চলবে। তাছাড়া, অত ভারী বোঝা এই কুকুরগুলো টানতেও পারবে না—দেখছ না, ওদের কি হাল হয়েছে?' চার্লস বা হল্ অবশ্য এসব কথায় কান দিল না। বাঁধাছাঁদা শেষ করে হল্ একহাতে স্লেজ চালানোর লাঠি, অন্যহাতে চাবুক নিয়ে হেঁকে উঠল, 'হেই চল্ চল্। আগে বাড়!' এত দুর্বলতা সত্ত্বেও কুকুর-গুলো প্রাণপণে গাড়িটাকে চালু করার চেষ্টা করল। গাড়ি কিন্তু এক চুলও নড়ল না। 'হতভাগা কুঁড়ের দল' বলে গালাগাল দিতে দিতে হল্ সমানে ওদের ওপর চাবুক কষাতে লাগল। তাতেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত একজন দর্শক আর থাকতে না পেরে বলে উঠল—'দেখ হে বাপু, তোমরা গোল্লায় যাও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু কুকুরগুলোর জন্যই বলছি, তোমাদের গাড়ির চাকা-গুলো বরফের মধ্যে বসে গিয়েছে। সেগুলোকে অন্ততঃ একজন খুলে দাও।' হল্‌কে অগত্যা তাই করতে হল। আর, চাকাগুলো মাটি থেকে খুলে আসা মাত্রই বাক্ আর তার দল স্লেজে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সোজা দৌড় লাগাল। ফলে যেমন তেমন করে বাঁধা গাড়ির জিনিসপত্র আলগা হয়ে গিয়ে সামনে ছিট্‌কে পড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতে লাগল। একটা মোড় বেঁকবার সময় হল্ নিজেই পা-পিছ্‌লে স্লেজের নিচে গড়িয়ে পড়ল। বাক্‌রা কিন্তু দৌড় থামাল না। বিনা দোষে চাবুক খেয়ে ওরা খুব রেগে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে যে অপূর্ব একখানা অবস্থা দাঁড়াল তেমন হাসির খোরাক 'স্ক্যাগওয়ে'র লোক বহুদিন পায়নি। যাই হোক্ কয়েকজন লোক দয়া করে কুকুরগুলোকে টেনে ধরে গাড়িটাকে থামাল। তারপর তারা হল্‌কে বুঝিয়ে বলল—'দেখ বাপু, যদি সত্যি সত্যি তোমাদের 'ডসন' পৌঁছবার ইচ্ছে থাকে তো গাড়ির লটবহর অর্ধেক কমিয়ে দাও, আর গাড়ি টানার জন্য কুকুরের সংখ্যা ডবল বাড়িয়ে দাও। তোমরা কি ভেবেছ যে ট্রেনে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছ?' ঠেকে শিখে এতক্ষণে হল্ আর চার্লস-এর মনে খানিকটা সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। এবার ওরা অর্ধেক মালপত্তর ছেঁটে ফেলে, আরো ছটা কুকুর কিনে গাড়িতে জুড়ে 'ডসন'-এর দিকে যাত্রা শুরু করল। কিন্তু মেরু অঞ্চলের তুষার প্রান্তরের ওপর দিয়ে দিনের পর দিন স্লেজগাড়িতে চলার কোনোরকম অভিজ্ঞতাই ওদের ছিল না। যে নতুন কুকুরগুলো ওরা জোগাড় করেছিল, সেগুলোও গাড়ি টানতে জানত না একেবারেই। তাছাড়া, একটানা অনেকদিনের জমা ক্লান্তি, একঘেয়েমি আর দুর্বলতায় বাক্ আর

দলবল একেবারেই নিস্তেজ আর নিরুৎসাহ হয়েপড়েছিল, কাজে আর ওদের কোনোরকম ইচ্ছা বা আগ্রহই ছিল না। যে পরিবেশের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছিল তা-ও একেবারে যাচ্ছেতাই। হল্, চার্লস্ আর তার গিন্নী সারাক্ষণই নিজেদের মধ্যে এমন খেয়োখেয়ি, ঝগড়া লাগিয়ে রাখত যে কোনো কোনোদিন কুকুরগুলোকে খেতে দিতেও ওরা ভুলে যেত। তাছাড়া মালপত্তর খুলতে আর বাঁধতেই ওদের প্রায় অর্ধেক দিন কেটে যেত। চলতে চলতেও মাঝে মাঝেই ওদেরকে গাড়ি থামিয়ে আল্‌গা হয়ে যাওয়া মালপত্তর আবার বাঁধতে হত। এর ফলে যতখানি রাস্তা প্রত্যেকদিন ওদের চলার কথা, তার অর্ধেকটুকুও ওদের যাওয়া হয়ে উঠত না। তার ওপর চার্লস্-এর বৌ প্রথমদিকে কুকুরগুলোকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেশি খাওয়াত—তার ধারণা ছিল, বেশি খাওয়ালেই বোধহয় কুকুরগুলো বেশি দৌড়বে। শুধু তাই নয়। এতগুলো কুকুরের এই পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যতটা দরকার, ততটা খাবারই নেওয়া হয়নি। ফলে শিগ্‌গিরই কুকুরদের খাবারের ভাঁড়ারে দারুণ টান পড়ল—আর তখন ওদের ভাগ্যে জুটতে লাগল আধপেটা খাবার। হাড়ভাঙা খাটুনির পর প্রায় প্রত্যেকদিন এই অনাহারে ক্লান্ত, দুর্বল কুকুরগুলো একে একে মরে যেতে লাগল। যে সব কুকুর আর দৌড়তে না পেরে শুয়ে পড়ত, হল্ সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে মেরে ফেলত। বাক্ বুঝতে পারল যে, যে কোনো সময়ে এই একইভাবে তারও প্রাণ যেতে পারে। যাই হোক্, স্রেফ মনের জোরে সে কোনোরকমে তার দলকে টেনে নিয়ে চলল। আস্তে আস্তে ওদের কারুর গায়ে আর এক ছটাক মাংসও রইল না—চেহারাগুলো হয়ে উঠল হাড়সর্বস্ব চামড়া ঢাকা জীবন্ত কঙ্কালের মতো। দুর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত কিরকম যেন একটা ঘোরের মধ্যে ওদের দিনগুলো কেটে যেতে থাকল—এমনকি চাবুক বা লাঠির ঘা খেয়েও আর ওদের শরীরে কোনো সাড়া জাগত না। এতদিনে বসন্তকাল এসে গেছিল। ওদের চারপাশে প্রকৃতি অপরূপ সাজে সেজেছে, চারদিকে সবুজের, নতুন প্রাণের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কিন্তু এসব দেখবার বা বুঝবার কোনোরকম অবস্থাই তখন আর ওদের ছিল না। অবশেষে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে মর-মর অবস্থায় ওরা একদিন এসে পৌঁছল 'সাদা নদীর' ধারে জন থর্নটনের তাঁবুতে। সেখানে পৌঁছেই সব কটা কুকুর মড়ার মতো যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর জন থর্নটন হল্‌কে বলল 'খুব সাবধান, মশাই। সব জায়গায় বরফ গলতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় আপাততঃ কয়েকদিন কোনোরকম চলা-ফেরার ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।' বলা বাহুল্য, হল্ ওর কথায় কান দিল না। বরং বেশ একটু চালের মাথায় বলল—'আরে ছাড়ুন তো মশাই, যত সব বাজে কথা। রাস্তার মধ্যেও তো এক জায়গায় দেখলাম

যে বরফ সব গলে যাচ্ছে, অপেক্ষা করার উপদেশ পেলাম। তা, দিব্যি তো চলে এলাম এতদূর পর্যন্ত।' জন থর্নটন নিরসভাবে উত্তর দিল—'সে আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন। তবে, লোকগুলো আপনাকে একদম ঠিক কথাই বলেছে। আমাকে আলাস্কার সব সোনা এনে দিলেও আমি এই ধরনের বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ চালানর মতো বোকামি করব না।' এবার হল্ খুব রেগে গেল। গোঁয়ারের মতো কর্কশভাবে ও বলে উঠল—'ঠিক আছে, মশাই। আপনি খুব চালাক, তাইতো? তবে আমরা এখুনি 'ডসনের' দিকে এগোচ্ছি।' এই বলে হল্ হাতের চাবুক আঁক্ড়ে কুকুরগুলোকে হুকুম দিল—'হেই, ওঠ্ সব। চল্। বাক্, উঠে পড়্, এগো।' কুকুরগুলো প্রথমে কোনো সাড়া দিল না। তারপর হল্-এর চাবুকের ঘা যখন অনবরত ওদের গায়ে এসে আছ্ড়ে পড়তে লাগল, তখন ওরা কোনোরকমে টল্তে টল্তে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বাক্ উঠল না, ওঠবার কোনো চেষ্টাও করল না। যেমন শুয়ে ছিল, তেমনই শুয়ে রইল। হল্ এবার চাবুক ছেড়ে লাঠি হাতে নিল। কিন্তু বাক্ মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছিল, ও কিছুতেই উঠ্বে না। যে ধরনের বরফ আজ ও পেরিয়ে এসেছে, তাতে ওর মনে হচ্ছিল যে, সামনে বরফের নিচে ওদের জন্য নিশ্চয়ই কোনো দারুণ বিপদ লুকিয়ে আছে। তাই, অনবরত লাঠির ঘা খেয়েও বাক্ কোনো সাড়া দিল না। তাছাড়া, এতদিন ধরে অসহ্য কষ্ট সহ্য করে ওর সমস্ত বোধ-শক্তিও অসাড় হয়ে গিয়েছিল—ওর মনে হচ্ছিল যেন লাঠির বাড়িগুলো বহুদূর থেকে ওর গায়ে এসে পড়ছে। আস্তে আস্তে হল্-এর লাঠির নিচে ও মরণের মুখে ঢলে পড়তে লাগল। কিন্তু জন থর্নটন আর সহ্য করতে পারল না। একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে সে হল্কে মাটিতে ফেলে দিয়ে বলল—'খবরদার! তুমি যদি কুকুরটাকে আর একবারও পেটাও তাহলে তোমাকে খুন করে ফেলব, বুঝলে?' হল্ কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। কোমরে গোঁজা লম্বা ছুরিটা হাতে নিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ও বলে উঠ্ল, 'সাবধান! ভাল চান তো সরে যান বলছি। এটা আমার কুকুর, আমি এটাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করব। 'ডসন' আমি যাবই।' থর্নটন কিন্তু মোটেই ঘাবড়াল না। বরং একটা কুড়ুলের বাঁট দিয়ে সজোরে হল্-এর মুঠিতে বাড়ি মেরে ছুরিটা ওর হাত থেকে ফেলে দিল। তারপর ছুরিটা দিয়ে বাক্-এর গলার আর বুকের চামড়ার সব বাঁধনগুলো কেটে দিল।

হল্-এর আর লড়বার সাহস ছিল না। তাছাড়া বাক্কে দিয়ে যে আর কাজ করান যাবে না, সেটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। তাই মিনিট কয়েক পরে হল্ সপরিবারে বাক্ ছাড়াই গাড়ি নিয়ে বরফ জমা নদীর বুকে গিয়ে নামল। বাক্

মাথা উঁচু করে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। থর্নটন পাশে বসে পড়ে ওর সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দেখল, বাক্-এর কোনো হাড় ভাঙেনি বটে, কিন্তু সারা শরীরে কাটাছেঁড়ার দাগ আর বহুদিনের অনাহারের ছাপ। থর্নটন বাক্‌কে যখন খুঁটিয়ে দেখছে, তখন হঠাৎ নদীর দিক থেকে একটা বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল। থর্নটন আর বাক্ চম্‌কে সেদিকে তাকিয়ে দেখল, নদীর বুকে বরফের মধ্যে একটা বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। চোখের নিমেষে হল্ ও তার সঙ্গীরা গাড়ি আর সবকটা কুকুরের সঙ্গে সেই ফাটলের মধ্যে পড়ে নদীর অতলগর্ভে ডুবে গেল। জেগে রইল খালি বিরাট একটা হাঁ করা গর্ত।

থর্নটন খানিকক্ষণ বাক্-এর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বাক্-এর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল—'আহারে, বেচারা।' বাক্ উত্তরে দুর্বলভাবে থর্নটনের হাত চেটে দিল।

ছয়ঃ ভালবাসা, ভালবাসা

গত শীতকালে থর্নটনের পা ঠাণ্ডায় জমে অসাড় হয়ে গেছিল। তাই এখানে তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিয়ে ও জখম পা সারিয়ে তুলছিল। ওর সঙ্গী-সাথীরা দূরে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা নৌকা তৈরি করছিল। তাই থর্নটনের তাঁবুতে সবারই তখন অফুরন্ত অবসর। সারাদিন নদীর ধারে শুয়ে, পেটভরে খেয়ে, গায়ে রোদ লাগিয়ে আর বিশ্রাম করে অল্পদিনের মধ্যেই পুরোপুরি সেরে উঠল বাক্। এখানে আর যে দুটো কুকুর ছিল, স্কিট আর নিক, তাদের সঙ্গেও বাক্-এর খুব ভাব হয়ে গেল। স্কিট আবার বাক্-এর শরীরের সমস্ত কাটাছেঁড়া গুলোকে খুব যত্ন করে চেটে পরিষ্কার করে দিত। এদের কাছে এসে বাক্ যেন একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেল। থর্নটনের ওপর গভীর ভালবাসায় বাক্-এর সারা মন ভরে উঠল। বাক্ আগে আর কোনো মানুষকেই এভাবে ভালবাসেনি। নিশ্চিত মরণের হাত থেকে থর্নটন ওকে বাঁচিয়েছে, সেটাই একমাত্র কারণ নয়। থর্নটনের মতো প্রভু বাক্ আর কখনো পায়নি। পোষা কুকুরগুলোকে থর্নটন ঠিক নিজের ছেলেমেয়েদের মতো ভালবাসত। তাদের সঙ্গে কথা বলত, খেলত, আদর করত। বাক্‌কে যখন ও আদর করত, তখন ও মাথাটা টেনে এনে নিজের মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে বাক্‌কে আস্তে আস্তে সামনে, পেছনে ঠেলত। আর নিচু গলায় 'পাজিটা, ছুঁচোটা, শয়তানটা'—গলে আদরের গালাগাল দিয়ে যেত। এ সব সময় অসহ্য সুখে, আনন্দে বাক্-এর

সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসত। বাক্-এর ভালবাসা দেখানোর উপায়টিও ছিল চমৎকার। মনিবের পুরো হাতখানাকে নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে এমন জোরে ও টানাটানি করত যে বেশ খানিকক্ষণ থর্নটনের হাতের ওপর ওর দাঁতের দাগ ফুটে থাকত! এক সেকেণ্ডের জন্যও বাক্ থর্নটনকে চোখের আড়াল করতে চাইত না। ওর খালি ভয় হত, অন্যান্য প্রভুদের মতো থর্নটনও হয়তো হঠাৎ একদিন ওকে ছেড়ে চলে যাবে। থর্নটন যখন কোথাও বসে কাজকর্ম করত, তখন বাক্ কাছাকাছি কোথাও বসে একদৃষ্টে প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। এমন কি, রাত্তিরে ঘুমতে ঘুমতেও বাক্ কখনো কখনো চম্‌কে জেগে উঠে চুপি চুপি থর্নটনের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ওর ঘুমন্ত প্রভুর নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনে যেত। কিছুদিন পর থর্নটনের দুই সঙ্গী, হ্যান্‌স আর পিটার নৌকা নিয়ে এসে পেঁছিল। বাক্ বুঝে নিল যে এই দুজন তার প্রভুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই এই দুজনের সঙ্গে ওর-ও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তবে থর্নটন ছাড়া আর কাউকেই ও বিশেষ আমল দিত না। থর্নটন একবার কি খেয়ালের বশে মজা করবার জন্য বাক্‌কে প্রায় একশো ফুট উঁচু একটা টিলার ওপর থেকে নিচে লাফাতে বলেছিল। বাক্ প্রভুর কথামতো লাফ দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। থর্নটন তো হতভম্ব। শেষপর্যন্ত টিলার একদম কিনারা থেকে কোনোরকমে বাক্‌কে জাপটে ধরে ফেলে গড়াগড়ি খেতে খেতে দুজনেই কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছিল। আর একবার নদীর চোরা স্রোতে পড়ে গিয়ে থর্নটন যখন মরতে বসেছে, তখন বাক্ সেখান থেকে প্রভুকে টেনে তুলেছিল।

দুই বন্ধু এসে পেঁছনর পর থর্নটন তাঁবু গুটিয়ে ওর দলবলকে নিয়ে নৌকা করে 'ডসন' গিয়ে পেঁছিল। এখানে সন্ধ্যেবেলাটা ওরা একটা সরাইখানায় খুব জমিয়ে আড্ডা মারত। কিন্তু একদিন একটা গুণ্ডা গোছের লোক হঠাৎ থর্নটনের গায়ে হাত তুলেছিল, ঘুষি মেরেছিল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই বাক্ একটা ভয়ংকর গর্জন করে ঠিক বিদ্যুতের মতোই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু বুঝে ওঠবার আগেই দেখা গেল, গুণ্ডাটার গলাটা অর্ধেক ফালা হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে থর্নটন ওকে সরিয়ে নিল, নইলে লোকটা সেখানেই মরে যেত। সরাইখানার অন্যান্য লোকেরা কিন্তু বলল, বাক্ কিছুমাত্র অন্যায় করেনি। এই ঘটনার পর থেকে শুধু 'ডসন' নয়, গোটা আলাস্‌কা অঞ্চলের সব ছাউনিতেই লোকের মুখে মুখে বাক্-এর নাম ছড়িয়ে পড়ল। থর্নটনের একগাছি চুল ছোঁওয়ার সাহসও আর কারুর রইল না। বাক্-এর চেহারাখানাও এখন হয়ে উঠেছিল অতুলনীয়—শক্তি আর সৌন্দর্য যেন ওর প্রতিটি পেশী থেকে ফুটে বেরোত।

কিছুদিন এখানে থাকবার পর থর্নটন আর তার দুই সঙ্গী ঠিক করল, এবার শীতে ওরা পূর্বদিকে সোনার খোঁজ করতে যাবে। এত দূরে ওরা যাবে যেখানে এখনো পর্যন্ত কেউ গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু এতটা পথ চলবার জন্য যে সব সাজসরঞ্জাম দরকার, তা কেনার মতো পয়সা ওদের কাছে ছিল না। শেষ পর্যন্ত বাক্-ই সে সমস্যারও সমাধান করে দিল। একদিন সরাইখানায় বসে কার কুকুরের গায়ে কত জোর তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। থর্নটন হঠাৎ মুখ ফস্‌কে বলে ফেলল যে, বাক্ এক হাজার পাউণ্ডের বোঝা চাপানো স্লেজগাড়ি একলাই একশো গজ টেনে নিয়ে যেতে পারে। ম্যাথুসন নামে এক বড়লোক ব্যবসায়ী সঙ্গে সঙ্গে ষোলশো ডলার বাজি ধরতে চাইল। থর্নটন বুঝল যে সে খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে। কিন্তু তখন আর কথা ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই—সারা শহরে তাহলে ওদেরকে নিয়ে হাসাহাসি পড়ে যাবে। তাই, ধারধোর করে আর নিজেদের পকেট থেকে শেষ পয়সাটিও বার করে দিয়ে ও বাজিটা রাখল। ঐ ম্যাথুসনেরই একটা স্লেজগাড়ি এক হাজার পাউণ্ড ময়দার বস্তা নিয়ে সরাইখানাটার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি থেকে দশটা কুকুরকে খুলে নিয়ে একলা বাক্‌কে গাড়িটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল এই অসম্ভব বাজি দেখতে। বাক্-এর চেহারা দেখে সবাই ওর তারিফ করতে লাগল। কিন্তু দশটা কুকুরের বোঝা বাক্ একলা টেনে নিয়ে যেতে পারবে—এটা প্রায় কেউই সম্ভব বলে মনে করল না। চারিপাশের অস্থিরতা, উত্তেজনা দেখে বাক্-ও বুঝতে পারছিল যে এবার প্রভুর জন্যে ওকে একটা দারুণ কিছু করতে হবে নিশ্চয়ই। থর্নটন বাক্-এর পাশে বসে পড়ে ওর মাথাটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল—'বাক্, আমার মুখ রাখিস্, কেমন? দোহাই তোর।' কথাগুলো বলতে বলতে গলাটা ধরে এল ওর। বাক্ উৎসাহে, উত্তেজনায় ছট্‌ফটিয়ে উঠল—আর যেমন ওর স্বভাব, থর্নটনের হাতটা টেনে কামড়ে ধরে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে গলার মধ্যে একটা চাপা আওয়াজ করল। যেন জানিয়ে দিল, 'বুঝতে পেরেছি। সব ঠিক আছে।' আশেপাশের লোকেরা অবাক হয়ে ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখছিল। এরপর থর্নটন উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'বাক্ তৈরি হ' এবার।' বাক্ ওর বাঁধনগুলোতে টান লাগিয়েই আবার ঢিলে দিল। এইভাবেই তৈরি হতে হয়, সে জানে।

'ডাইনে বাক্।'

বাক্ নিচু হয়ে ঝট্‌কা মেরে ডানদিকে ঘুরে গেল। গাড়ির চাকাগুলো গভীর ভাবে বরফের মধ্যে বসে গেছিল। ডানদিকের চাকাগুলো চড়্‌চড়্ করে বরফের মধ্যে

থেকে উঠে এল।

'এবার বাঁয়ে।'

বাম দিকের চাকাগুলোও একইভাবে খুলে এল। চারিপাশের উত্তেজনা এতক্ষণে চরমে উঠে গেছিল। লোকেরা যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল।

'সামনে। বাক্, এবার সামনে এগিয়ে চল্।'—থর্নটনের গলা থেকে কথাগুলো যেন বন্দুকের গুলির মতো ছিট্‌কে বেরোল।

বাক্ শরীরের সবটুকু জোর লাগিয়ে সামনের দিকে টান মারল। বিশাল বুকখানাকে মাটির কাছে নামিয়ে, মাথাটা সামনের দিকে ঠেলে, পাগলের মতো পা চালিয়ে যেতে লাগল ও। কঠিন বরফের বুকে ওর নখের দাগ বসে যেতে লাগল। দু'একবার ওর পা পিছলেও গেছিল প্রায়। তারপর আস্তে, খুব আস্তে—স্লেজগাড়িটা একটু একটু করে নড়তে লাগল। প্রথমটা ঝাঁকুনি খেতে খেতে, তারপর গড়্‌গড়্ করে চলতে লাগল গাড়িটা। থর্নটন পেছনে দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বাক্-কে উৎসাহ দিয়ে যেতে লাগল। যেখানটায় একশো গজ শেষ হয়েছে, ঠিক সে জায়গাটায় আগে থেকেই দাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে পৌঁছেই থর্নটনের কথামতো বাক্ থেমে গেল। সমস্ত দর্শকরা এবার আনন্দে ফেটে পড়ল। সবাই সবার সঙ্গে হাত মেলাতে লাগল, আকাশে টুপী ছুঁড়তে লাগল। বাক্-এর জয়ধ্বনিতে ভরে গেল চারদিক। থর্নটন বাক্-এর পাশে বসে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল—বড় আনন্দের এই কান্না। বাক্ যথারীতি থর্নটনের হাতখানা কামড়ে ধরে গলার মধ্যে চাপা আওয়াজ করে উঠ্‌ল—যেন জিজ্ঞেস করল, 'কি, সব ঠিক আছে তো?' ওখানকারই এক বড় ব্যবসাদার এগিয়ে এসে থর্নটনকে বলল—'চোখে না দেখলে এ ঘটনা বিশ্বাস করতাম না, মশাই। সত্যি, আপনার কুকুরের জবাব নেই। আমি এখুনি ওর জন্য বারোশো ডলার দিতে রাজি আছি। দেবেন আমাকে কুকুরটা?'

থর্নটন উঠে দাঁড়াল। দু'গাল বেয়ে তখনো জল গড়াচ্ছে ওর। কোনোরকমে ও উত্তর দিল—'বাক্‌কে কোনো দাম দিয়েই কেনা যায় না, মশাই। আপনি এখুনি সরে পড়ুন এখান থেকে। গোল্লায় যান।'

সাত ঃ মানুষের ভালবাসা

বাজি জেতা টাকায় সব সাজসরঞ্জাম কিনে থর্নটন আর তার সঙ্গীরা অজানা পুবের দিকে বেরিয়ে পড়ল। সেখানকার এক রহস্যময়, হারিয়ে যাওয়া খনির গল্প

বহুকাল ধরে ভাগ্যান্বেষীদের হাতছানি দিয়ে আসছে,—সেখানে নাকি লুকনো আছে এক অফুরন্ত সোনার ভাণ্ডার। মাসের পর মাস নির্জন, অচেনা প্রান্তরের বুক চিরে ওরা এগিয়ে চলল। নদীর মাছ, শিকার করা জানোয়ারই হল তাদের প্রধান খাবার। কখনো বা দিনের পর দিন তারা একই জায়গায় তাঁবু ফেলে বসে থাকত। বাক্ জীবনে কখনো এত আনন্দে দিন কাটায়নি। অনেক সময় থর্নটনের শিকার করা প্রাণী টেনে নিয়ে আসা ছাড়া ওর আর কোনো কাজই থাকত না। তখন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁবুর আগুনের পাশে বসে থাকত। সভ্যজগত থেকে বহুদূরে খোলা আকাশের নিচে বেড়াতে বেড়াতে, জ্বলন্ত আগুনের পাশে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে বাক্ যেন হঠাৎ জেগে উঠে শুনতে পেত, গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা ডাক ভেসে আসছে। ডাকটা ওর কানে এলেই কি যেন এক অচেনা, অজানা আবেগে ওর সারা মন দুলে উঠত। ওর মনে হত, ঐ বনই তার আসল ঘর, ঐ ডাক যেন তাকে ঘরে ফিরে যেতে বলছে। গুহামানব প্রভুর সঙ্গে ও আগুনের ধারে বসে আছে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আধো ঘুমের মধ্যে এই কল্পনাটাও প্রায়ই এখন ওর মনে আবার খেলে যেত। বাক্ এখন প্রায়ই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ঘুরে বেড়াত। তাঁবুতে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ কান খাড়া করে ও কি যেন শুনত, তারপর দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে বনের ভেতর ঢুকে যেত। সেখানে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, ঝরনার পাশে পাশে বেড়িয়ে বেড়াত, পাখিদের কলকাকলি শুনত, লুকিয়ে বসে থেকে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারদের চলাফেরা লক্ষ্য করত। তবে সবচাইতে ওর ভাল লাগত গ্রীষ্মের রাতে তারার আলোয় গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে। জঙ্গলের প্রত্যেকটা শব্দ ও কান পেতে শুনত, আর খুঁজে বেড়াত কে ওকে এইভাবে ডাকে। কিন্তু হঠাৎ একসময় থর্নটনের কথা ভেবে ওর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠত। সঙ্গে সঙ্গেই ও দৌড়ে ফিরে আসত প্রভুর কাছটিতে।

অবশেষে থর্নটন আর তার সঙ্গীরা একটা বড় উপত্যকায় এসে পৌঁছল। জায়গাটার একদিকে উঁচু পাহাড়ের সারি, অন্যদিকে নদী আর ঝরনায় ভরা গভীর জঙ্গল। পাহাড়গুলোও ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এখানেই থর্নটনেরা খুঁজে পেল এক অফুরন্ত সোনার ভাণ্ডার। কাজে কাজেই ওরা আর হারিয়ে যাওয়া সেই অজানা খনির খোঁজে না এগিয়ে এখানেই থেকে গেল। একটা বড় পুকুরের কাছে কাঠ আর লতাপাতা দিয়ে ওরা একটা বড় ছাউনি বা 'কেবিন' তৈরি করল। প্রত্যেকদিন ওরা মাটি খুঁড়ে পাত্রে রেখে ধুয়ে সোনার গুঁড়ো আলাদা করত, আর বড় বড় চামড়ার থলিতে সেই গুঁড়ো ভরে রাখত। এখানে কয়েকদিন থাকবার পর একরাতে হঠাৎ

বাক্ চমকে জেগে উঠল। কান খাড়া করে ও শুনল, জঙ্গলের গভীর থেকে লম্বা, একটানা একটা করুণ ডাক ভেসে আসছে। এত স্পষ্টভাবে এই ডাক আগে আর কখনো বাক্ শোনেনি। একলাফে ঘুমন্ত ছাউনি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বনের ভেতর ঢুকে গেল ও। যেদিক থেকে ডাকটা ভেসে আসছিল, সেদিকে খানিকক্ষণ দৌড়বার পর একটা ফাঁকা জায়গায় পেঁছে বাক্ দেখল, একটা রোগা নেকড়ে আকাশের দিকে নাক তুলে বসে এই একটানা কান্না কেঁদে যাচ্ছে। বাক্‌কে এগোতে দেখেই নেকড়েটা পালাতে লাগল। কিন্তু বাক-ও ওর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে লাগল। এবার নেকড়েটা বুঝতে পারল যে, এই বিরাট কুকুরটা তাকে মারতে চায় না। তখন ও দাঁড়িয়ে পড়ে বাক্-এর সঙ্গে একবার নাক ঘষাঘষি করল। এরপরে দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। পুরো একটা রাত, একটা দিন ধরে খেলা করতে করতে ওরা দুজন ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলের মধ্যে। বাক্-এর মনে প্রথমে দারুণ আনন্দ হচ্ছিল,—পেয়েছে, কে তাকে এইভাবে ডাকে তা সে খুঁজে পেয়েছে। খোলা আকাশের নিচে তার বনের সেই জাতভাই-এর সঙ্গে সে খুশিমতো দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পরের দিন সকালে একটা ছোট্ট নদীর ধারে এসে হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল থর্নটনের কথা,—আর ও এগোতে পারল না। ওর নতুন নেকড়ে বন্ধু অনেক চেষ্টা করল ওকে আরো গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে। কিন্তু বাক্-এর মনে এখন ঘরের পিছুটান জেগে উঠেছে, এবার ও ফিরে যেতে লাগল। নেকড়েটা অনেক দূর পর্যন্ত বাক্-এর সঙ্গে সঙ্গে এল। তারপর মাটিতে বসে পড়ে আকাশের দিকে নাক তুলে আবার শুরু করল সেই একটানা করুণ কান্না।

ছাউনিতে ফিরে এসে বাক্ এবার আদরে আদরে থর্নটনকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। দু-তিন দিন ও থর্নটনকে ছেড়ে একপাও নড়ল না। কিন্তু তারপরেই অরণ্য থেকে ভেসে আসা সেই ডাক আবার ওকে উতলা করে তুলল। ওর খালি মনে পড়তে লাগল বনের বন্ধু সেই নেকড়েটার কথা, তার সঙ্গে খোলা আকাশের নিচে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ানোর কথা। আবার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে প্রায়ই ওর সেই বন্ধুকে খুঁজে বেড়াতে লাগল বাক্। প্রায় প্রতিটি রাত এখন ও বাইরেই কাটাত, ছাউনিতে ফিরত না। ছাউনি থেকে বেরিয়ে জঙ্গলে ঢোক্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্-এর হাবভাব যেন একেবারে পাল্‌টে যেত। ঠিক বনের প্রাণীর মতোই ও তখন নিঃশব্দে, হাল্‌কা পায়ে চলাফেরা করত, শিকার ধরত। নিজের খাবার এখন ও নিজেই জোগাড় করে নিত। নদীর মাছ, ঝোপের পাখি, ঘুমন্ত খরগোস, কিছুই ওর নাগাল এড়িয়ে যেতে পারত না। চোখেমুখে বাদামি ছোপ আর বুকে ধবধবে

সাদা লোমে দুটো চিহ্ন বাদ দিলে ওকে এখন একটা প্রকাণ্ড নেকড়ে বলেই মনে হত।

আবার শীতকাল ঘুরে এল। ওপরের পাহাড় থেকে চমরী গাইয়ের দল নিচের উপত্যকায় নেমে আসতে লাগল। বাক্ এখন বড় বড় জানোয়ারদের সঙ্গে নির্ভয়ে লড়াই করত, একটা বড় অন্ধ ভালুককেও ইতিমধ্যে ও ঘায়েল করেছে। তাই এবার ও একটা চমরী গাইয়ের পালের বিশালদেহী দলপতিকেই তাড়া করে বসল। পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় রেড ইণ্ডিয়ানদের তীরে দলপতিটা জখম হয়েছিল। যন্ত্রণায়, রাগে পাগলের মতো হয়ে সে বাক্‌কে তার প্রকাণ্ড দুই শিং-এর ডালপালার মধ্যে গেঁথে ফেলতে চাইল বারবার। পালের অন্যান্য পুরুষগুলোও তাদের দলপতিকে পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু বাক্-এর গতি আর বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা ওদের ছিল না। দিনের পর দিন বাক্ দলটার পেছনে ধাওয়া করে চলল। আর সুযোগ পেলেই দলপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত যূথপতিকে একলা ফেলে রেখেই চমরী গাইয়ের দলটা গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল, আর নিঃসঙ্গ যূথপতি বাক্-এর কাছে মারা পড়ল। বাক্ দুদিন ধরে মনের আনন্দে ওর এই প্রকাণ্ড শিকারের মাংস খেল, সেখানেই বিশ্রাম করল। তারপরেই ও সোজা দৌড় লাগাল নিজেদের আস্তানার দিকে। কয়েকদিন ধরেই থর্নটনের কথা ওর খুব মনে পড়ছিল। কিন্তু যতই ও এগোতে লাগল, ততই ওর মনে কিরকম একটা যেন অস্বস্তি হতে লাগল, আর সেটা বেড়েই চলল। ওর খালি মনে হতে লাগল, ওর মনিব খুব বিপদে পড়েছে। সারা জঙ্গলটাও যেন কেমন থম্‌থমে হয়ে আছে—হাওয়ায় দূর থেকে যেন কেমন একটা অচেনা গন্ধ ভেসে আসছে। বনের জীবজন্তুগুলোও যেন কোনো এক অজানা আতঙ্কে চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। খুব সাবধানে, নিঃশব্দ পায়ে বাক্ নিজেদের ছাউনির কাছে গিয়ে পৌঁছল। প্রথমেই ওর নজরে পড়ল, 'নিক্' নামে কুকুরটা একটা ঝোপের মধ্যে মরে পড়ে আছে—তার সারা গায়ে তীর বেঁধা। ছাউনির দিক থেকে বহু অচেনা গলার বিকট চীৎকারও ওর কানে এল। গুঁড়ি মেরে, আস্তে আস্তে বাক্ আরো এগিয়ে গিয়ে দেখল, ওদের প্রিয় আস্তানাটা ভেঙে চুরমার হয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে, আর একদল 'ইহাত' রেড ইণ্ডিয়ান সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর যুদ্ধজয়ের তাণ্ডব নাচ নেচে চলেছে। সামনেই হ্যান্‌স আর পিটার মরে পড়ে আছে। একটু দূরে পুকুরটার মধ্যে ওর প্রিয়তম প্রভু থর্নটনের আধডোবা প্রাণহীন দেহও দেখতে পেল বাক্। তারপর ও আর কিছু দেখবার চেষ্টা করল না। যে সব 'ইহাত'রা খুন আর ধ্বংসের পৈশাচিক আনন্দে

নাচগান করছিল, তারা হঠাৎ একটা ভয়াবহ গর্জন শুনতে পেল। পরের মুহূর্তেই সাক্ষাৎ শয়তানের মতো ভয়ংকর মূর্তিতে উল্কাবেগে তাদের মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাক্। প্রথমেই রেড ইণ্ডিয়ানদের দলপতির গলার নলীটা দু'টুকুরো হয়ে গেল। তারপর বাক্ ঝোড়ো হাওয়ার মতো রেড ইণ্ডিয়ানদের দলের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগল আর যাকে সামনে পেল, তারই টুঁটি ছিঁড়ে দিতে লাগল। এত জোরে ও ছুটে বেড়াচ্ছিল যে রেড ইণ্ডিয়ানরা ওর দিকে তীর বা বর্শা ছুঁড়ে মারবার কোনো সুযোগই পাচ্ছিল না। দু'একবার সে রকম চেষ্টা করাতে ওদের নিজেদের লোকই মারা পড়ল। চরম আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ওরা এবার প্রাণপণে জঙ্গলের দিকে পালাতে লাগল—এতক্ষণে ওদের স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে নিশ্চয়ই ভয়ানক কোনো প্রেতাত্মা ওদের পিছু নিয়েছে। বাক্ কিন্তু ছাড়ল না, পেছন পেছন তাড়া করে একটার পর একটা রেড ইণ্ডিয়ানকে টেনে নামিয়ে মেরে ফেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত লোকগুলো একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে জঙ্গলের নানাদিকে ছড়িয়ে লুকিয়ে পড়ল। একসময় ক্লান্ত হয়ে ওদের ভাঙা ছাউনির কাছে ফিরে এল বাক্। যে পুকুরটার মধ্যে থর্নটনের মৃতদেহ পড়ে ছিল, বাক্ সারাদিন ধরে তার পাড়ে বসে রইল। কখনো কখনো বা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওদের প্রিয় আস্তানাটার ধ্বংসস্তূপের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অসহায়, অবুঝ একটা দুঃখ ওর ভেতরে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল। নিষ্ঠুর মনিবদের বহুরকম অত্যাচারেও বাক্ কখনো ভেঙে পড়েনি। কিন্তু এখন ওর মনে হচ্ছিল যেন ওর বুকের ভেতরটায় একটা অসহ্য কষ্ট হচ্ছে—সেখানটায় যেন সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। খিদে পাওয়া বা মার খাওয়ার যন্ত্রণা ও ভাল করেই জানে। এখনকার এই যন্ত্রণা সেগুলোর চাইতে একেবারেই আলাদা, কিন্তু অনেক, অনেক বেশি তীব্র। তবে, এই যন্ত্রণার ভেতরেও রেড ইণ্ডিয়ানদের মৃতদেহগুলো দেখে বাক্-এর মনে মাঝে মাঝে একটু গর্বও হচ্ছিল—তার প্রভুর জাত, শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে মারা এত সহজ? এর চাইতে তো অনেক বেশি কঠিন চমরী গাই বা বুনো ভালুক শিকার করা!

আট ঃ প্রত্যাবর্তন

রাত হয়ে এল। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভরে গেল চারদিক। পুকুরের পাড়ে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাক্-এর সমস্ত ইন্দ্রিয় পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠল। বহুদূরে বনের ভেতর থেকে ওর সেই চেনা ডাক আবার শোনা

যাচ্ছে—আরো, আরো কাছে তা এগিয়ে আসছে। বাক্-এর প্রতিটি রক্তকণার মধ্যে আবার সেই পুরনো স্মৃতি জেগে উঠল। তার প্রিয়তম প্রভু, তার মনিব থর্নটন তাকে ছেড়ে চলে গেছে চিরদিনের মতো—আর কোনও দিন সে বাক্‌কে আদর করতে ফিরে আসবে না। বাক্-এর আর কোনও পিছুটান নেই, মানুষের সঙ্গে সব বাঁধন তার কেটে গেছে চিরদিনের মতো। এবার সে ঘরের ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে যাবে ঘরে, তার জাতভাইদের মধ্যে।

হঠাৎ বাক্-এর সামনের ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হল একপাল নেক্‌ড়ে। রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো তারাও চমরী গাইয়ের পেছন পেছন ধাওয়া করে নিচের উপত্যকায় নেমে এসেছে। চাঁদের আলোর মধ্যে বাক্ চুপ করে এককোণে দাঁড়িয়ে রইল। ওর বিশাল চেহারা দেখে নেকড়েগুলো প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর একটা সাহসী নেক্‌ড়ে সোজা ওর ওপর লাফিয়ে পড়ল। বিদ্যুৎগতিতে সেটার ঘাড় ভেঙে দিয়ে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাক্। পর পর কয়েকটা নেক্‌ড়ের একই অবস্থা হল। এবার সব নেকড়েগুলো একসঙ্গে এগিয়ে এল ওকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাক্ সারাক্ষণ সবাইকে সামনে রেখে লড়াই করে গেল, কাউকেই ওর পেছন দিকে যেতে দিল না। শেষ পর্যন্ত বাক্-এর গতি আর বুদ্ধির কাছে হার মেনে নেকড়ের পালকে পিছু হটে যেতে হল। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ওরা হতাশভাবে বাক্-এর দিকে তাকিয়ে রইল। এবার একটা ছাইরঙা রোগা নেকড়ে আস্তে আস্তে, সাবধানে বাক্-এর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাকে দেখেই বাক্-এর মন আনন্দে নেচে উঠল—এই তো তার সেই চেনা বন্ধু, যার সঙ্গে সে একরাত একদিন বনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। মুখোমুখি হয়ে দুজনেই গলার মধ্যে একটা চাপা আওয়াজ করে উঠল। তারপর দুজন দুজনের নাকে নাক ঘষল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো বুড়ো, অভিজ্ঞ নেকড়ে দলপতি। বাক্ প্রথমে গজ্‌রে উঠতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গেও নাক ঘষাঘষি করল। বুড়ো নেক্‌ড়েটা বসে পড়ে চাঁদের দিকে নাক তুলে আরম্ভ করল সেই একটানা নেকড়ের কান্না। অন্যান্য নেকড়েগুলোও তার সঙ্গে যোগ দিল। এবার বাক্‌ও মাটিতে বসে পড়ে এই ডাকে নিজের গলা মেলাল। তারপর নেকড়েগুলোর দিকে এগিয়ে এল। নেকড়েগুলোও এসে ওর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। বুড়ো নেকড়েটা তার দলবল নিয়ে চীৎকার করতে করতে দৌড়ে এগিয়ে চলল, আর তাদের সঙ্গে, পুরনো বন্ধু সেই রোগা নেকড়েটার পাশাপাশি চীৎকার করতে করতে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেল বাক্।

নয়ঃ অরণ্যের বিভীষিকা

বাক্-এর কাহিনী এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। তবে, এর কিছুদিন পর থেকেই 'ইহাত' রেড ইণ্ডিয়ানরা দেখতে পেল, জঙ্গলের নেকড়েগুলোর চেহারা কিরকম যেন বদ্‌লে যাচ্ছে—অনেক নেকড়েরই চোখেমুখে বাদামি ছোপ আর বুকে ধবধবে সাদা ছাপ ফুটে উঠছে। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ঐসব বুনো নেকড়েদের দলপতি হয়ে নাকি দৌড়ত বিশালকায়, রহস্যময় একটা ভূতুড়ে কুকুর। এই জানোয়ারটা 'ইহাত'দের কাছে ছিল এক জীবন্ত, মূর্তিমান বিভীষিকা—তাদের পাতা ফাঁদ থেকে শিকার চুরি করা আর বাছা বাছা পোষা কুকুরগুলোকে মেরে ফেলাই নাকি ছিল এই ভূতুড়ে জীবটার একমাত্র কাজ। 'ইহাত'দের সবচাইতে সাহসী আর শক্তিশালী পুরুষরাও প্রায়ই বনের মধ্যে এই জীবটার হাতে মারা পড়ত। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের নিচে জঙ্গলে ঘেরা একটা উপত্যকা আছে, যেখানে 'ইহাত'রা কখনো ভুলেও যায় না। ওদের বিশ্বাস, সেখানে নাকি থাকে এক ভয়ানক পিশাচ। এই পিশাচটা কিভাবে একবার অসংখ্য 'ইহাত'কে মেরে ফেলেছিল, তার ভয়াল কাহিনী এখনো ওদের মুখে মুখে ফেরে। ওদের মেয়েরা ঐ পিশাচটার ভয় দেখিয়ে দুষ্টু বাচ্চাদের ভয় দেখায়, ঘুম পাড়ায়।

'ইহাত'রা অবশ্য একটা খবর রাখত না। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বন থেকে ঐ উপত্যকায় বেরিয়ে আসে একটা প্রকাণ্ড, নিঃসঙ্গ নেকড়ে—নেকড়ে হলেও তার চালচলন, চেহারা যেন একটু অন্যরকম। তার চোখেমুখে বাদামি ছোপ, বুকের মধ্যিখানটা ধব্‌ধবে সাদা। একটা পুরনো, ভাঙা ছাউনির সামনে এসে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা জায়গাটা ঝোপঝাড়, আগাছায় ভরে গেছে। অনেকগুলো ফাটা চামড়ার থলি থেকে হলুদ রং-এর গুঁড়ো বেরিয়ে মাটিতে, আর কাছেই একটা পুকুরে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। নেকড়েটা পুকুরের পাড়ে গিয়েও বসে থাকে অনেকক্ষণ। একবার, মাত্র একটিবার তার বুক থেকে বেরিয়ে আসে একটানা, অতি করুণ কান্নার মতো একটা আওয়াজ। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে আবার ঢুকে যায় গভীর বনের ভেতর।

LOVE OF LIFE

বেঁচে থাকার রূপকথা

ওরা দুজনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোরকমে নদীর ধারে নেমে এল। দুজনেরই একেবারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা—দীর্ঘদিনের কঠোর জীবনযাত্রা ওদের মুখে গভীর দাগ এঁকে দিয়েছে। দুজনের কাঁধেই কপালের সঙ্গে চামড়ার ফিতে দিয়ে আটকানো ভারী কম্বল, হাতে বন্দুক।

পেছনের লোকটা—জো ওর নাম—বলে উঠল—'ঈস্। দু একটা গুলি-ও যদি সঙ্গে থাকত।' ওর সামনের সঙ্গী বিল এতক্ষণে ঘোলাটে দুধের মতো সাদা নদীর জলে নেমে গেছিল। সে কোনো উত্তর দিল না। নদীটার মধ্যে বড় বড় পাথর। জো ওর পেছন পেছন জলে নামল। নদীর জল একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডার হঠাৎ কামড়ে দুজনেরই পায়ের পাতা অসাড় হয়ে গেল। নদীর মাঝামাঝি এসে জো একটা বড় পাথরে খুব জোরে হোঁচট খেল। পড়ে যেতে যেতে ও কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিল বটে, কিন্তু টের পেল যে ওর পায়ের পাতা ভীষণভাবে মচ্‌কে গেছে। ও জোরে হাঁক দিল—'বুঝলে, বিল, পায়ের গোড়ালিটা খুব জোর মচ্‌কে গেছে।' বিল কিন্তু ফিরেও তাকাল না। নদীর জল ভেঙে পারে উঠে সোজা চলতে লাগল। জো-এর চোখে মুখে একটা আহত বন্যপশুর মতো বেদনার ছাপ ফুটে উঠ্‌ল। ও আর্তস্বরে আবার ডেকে উঠ্‌ল—'বিল, এই বিল।' ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছিল ওর। বিলের কাছ থেকে কিন্তু এবারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না—সে যেমন চলছিল, তেমন খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওপারের একটা ছোট পাথুরে টিলা টপ্‌কে অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যতক্ষণ ওকে দেখা গেল, জো ততক্ষণ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর অতিকষ্টে নদীটা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে বসে পড়ল। এবার নিজের আসল অবস্থাটা ও বুঝতে চেষ্টা করল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল চারটে বাজে। জুলাই মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই সূর্য মোটামুটি উত্তর পশ্চিম দিক ঘেঁসেই আছে। দক্ষিণ দিকে ন্যাড়া পাহাড়গুলোর পেছনে কোথাও লুকিয়ে আছে বিশাল 'ভালুক হ্রদ'। কানাডার যে ধু ধু করা জনশূন্য প্রান্ত উত্তর মেরুবৃত্তের অঙ্গ, তা-ও আছে ঐ দক্ষিণ দিকেই। যে ছোট নদীটা এইমাত্র ওরা পেরিয়ে এল, সেটা 'কপার মাইন' নদীর-ই কোনো শাখা।

'কপার মাইন' নদীটা গিয়ে মিশেছে 'আর্কটিক' মহাসাগরে। ও সেখানে কখনো যায়নি, কিন্তু ম্যাপে জায়গাটা দেখেছে।

চারদিকের বিষণ্ণ, রুক্ষ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জো-এর সারা মন ভরে গেল আতঙ্ক আর হতাশায়। নিজের মনেই ফিস-ফিসিয়ে ও বলে উঠ্‌ল—'বিল। ও বিল।' ওর মনে হল যেন এই নিঃসঙ্গতার ভারে ও নুয়ে পড়েছে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে একসময় উঠে দাঁড়াল জো, আর সঙ্গে সঙ্গেই মচ্‌কানো গোড়ালিটা যন্ত্রণায় টন্‌টন্‌ করে উঠল। যন্ত্রণা সহ্য করেই ও এগিয়ে চলল। যে টিলাটার ওপর দিয়ে ওর সঙ্গী এইমাত্র অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার ওপর গিয়ে দাঁড়াল জো। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, যতদূর চোখ যায়, একটা স্যাঁতসেঁতে শ্যাওলা ধরা, নিস্তব্ধ উপত্যকা পড়ে আছে। সারা জায়গাটা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে লাশ আকারের পাথরের চাঁই আর টিলা। বিল-এর পায়ের ছাপ ধরে চলতে চলতে জো খালি ভাবতে লাগল, ও একলা পড়ে গেছে ঠিকই, তবে হারিয়ে যায়নি। এই পথ ধরে হেঁটে গেলেই সে একটা ছোট হ্রদের কাছে গিয়ে পেঁছবে। সেই হ্রদে আর একটা ছোট নদী এসে পড়েছে। নদীটার তীর ধরে পশ্চিম দিকে একটু এগোলেই ও পেঁছে যাবে 'দিয়েজ' নদীর উৎসের কাছে। সেখানে একটা বড় টিলার নিচে একটা গুহার মধ্যে ওদের ছোট্ট নৌকাটা উল্টে রাখা আছে। আরও আছে গুলি, মাছ ধরার আর ফাঁদ পাতার সাজসরঞ্জাম, অল্প পরিমাণে ময়দা, জমানো মাংস আর সব্জী। বিল নিশ্চয়ই সেখানে পেঁছে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে। জো গিয়ে সেখানে পেঁছলেই দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়া সেরে 'দিয়েজ' নদীতে নৌকা ভাসিয়ে উত্তরের শীতকে পেছনে ফেলে রেখে সুদূর দক্ষিণের কোনোও গরম জায়গায় গিয়ে পেঁছবে। সেখানে আছে জ্বালানি কাঠ আর ভাল ভাল খাবারের অফুরন্ত ভাণ্ডার। হাঁটতে হাঁটতে সারাক্ষণ ও নিজেকে এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বিল ওকে ছেড়ে চলে যায়নি। নিশ্চয়ই 'দিয়েজ' নদীর উৎসের কাছে ঐ টিলাটার নিচে বসে আছে। এই আশাটুকুর ওপর ভর করেই জো কোনোরকমে চলতে লাগল। দক্ষিণে পেঁছে যে ওরা কি রকম একখানা ভোজ লাগাবে, সেটাও বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কল্পনার চোখে দেখতে লাগল জো—গত দু'দিন ধরে ও বলতে গেলে কিছুই খায়নি, আর তার আগেও বহুদিন ধরে ওকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়েছে। আপাততঃ রাস্তার ধারের ঝোপঝাড় থেকে একরকমের বিস্বাদ, জলভরা 'বেরী' জাতীয় মূল চিবিয়েই ওকে খাওয়া-দাওয়া সারতে হচ্ছিল।

বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁটবার পর আবার একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল জো। তখনই উঠে আবার হাঁটবার ক্ষমতা আর ওর ছিল না। ও কাঁধের বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালাল। আগুনের ধারে বসে প্রথমেই ও বারুদের কাঠিগুলো বারবার করে গুণে দেখল, তারপর সেগুলোকে আলাদাভাবে কয়েকটা অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশ তেলা কাগজে মুড়ে নিজের শরীরের নানা জায়গায় মহামূল্যবান সম্পদের মতো লুকিয়ে রেখে দিল। এবার আগুনের আলোয় পায়ের দিকে তাকিয়ে জো দেখল যে ওর পায়ের পাতা আর গোড়ালি ফুলে প্রায় ওর হাঁটুর আকার নিয়েছে। ওর কাছে যে দুখানা কম্বল ছিল, তার একটা থেকে কয়েকটা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে ও ফোলা জায়গাটাকে বেশ ভাল করে বাঁধল। তারপর একপাত্র গরম জল খেয়ে, ঘড়িতে দম দিয়ে কম্বলের মধ্যে ঢুকে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে যখন ও জেগে উঠল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। জেগে উঠেই ও বুঝতে পারল যে, ওর দারুণ খিদে পেয়েছে। মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে ও দেখল যে একটা নধর গোলগাল মদ্দা 'বল্‌গা' হরিণ ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ঝলসানো হরিণের মাংসের কথা ভেবে ও যেন পাগল হয়ে গেল। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে খালি বন্দুকটাই তাক্ করে তুলে ধরে ও আওয়াজ করে বসল। হরিণটা দৌড়ে পালিয়ে গেল। নিষ্ফল রাগে, দুঃখে জো বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সারা গায়ে—বিশেষতঃ পায়ে—অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল ওর। কিন্তু ওকে সবচাইতে বেশি কষ্ট দিচ্ছিল প্রচণ্ড খিদে। একটা পাথরের উঁচু ঢিবির ওপর উঠে ও চারদিকে তাকিয়ে দেখল—কোথাও কোনো গাছপালা বা উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্র নেই। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়, পুকুর, খালবিল। ঘোলাটে, ফ্যাকাসে আকাশে রোদের চিহ্নমাত্র ছিল না। কোন্‌দিক থেকে গতকাল ও হেঁটে এসেছে তাও জো বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এখন পর্যন্ত ও নিশ্চিত ছিল যে, ও হারিয়ে দিকভ্রষ্ট হয়ে যায়নি, পাঁদিক ধরে এগিয়ে গেলেই ও ঠিক ওর লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে। বোঝাটা আর বন্দুকটা আবার কাঁধে তুলে নিল ও। তার আগে একটা ছোট চামড়ার থলি বার করে হাতে নিয়ে ও অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল। তারপর বেপরোয়া ভাবে একবার চারদিকে তাকাল—যেন এই নির্জনতা নিঃসঙ্গতা জোর করে থলিটাকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত চট্ করে থলিটাকে বোঝার মধ্যে বেঁধে ও আবার পায়ে চলা শুরু করল। আস্তে আস্তে ওর খিদের যন্ত্রণা এত তীব্র হয়ে উঠল যে

ঠিক ভাবে হাঁটাই ওর কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। রাস্তার ধারের বিস্বাদ, ছোট ছোট ফলমূল খেয়ে ওর জিভ, গলা ফুলে উঠল। খানিকক্ষণ পরে ও এমন একটা জায়গায় এসে পেঁছিল যেখানে পাহাড়ের গায়ে, ঝোপঝাড়ে অজস্র 'টারমিংগান' পাখির বাসা। তারা 'কর্-কর্'আওয়াজ করে সমানে ওর সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে খিদেতে ওকে পাগল করে তুলল। জো পাথর ছুঁড়ে, লুকিয়ে পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে ঘুরে প্রাণপণে একটা পাখি ধরতে চেষ্টা করতে লাগল—তীক্ষ্ন সূঁচলো পাথরে হাত পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু একটা পাখিও ওর হাতে ধরা পড়ল না। একবার তো জো ঝোপের মধ্যে ঘুমন্ত একটা পাখির প্রায় গায়ের ওপরেই গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাখিটার মতোই ও নিজেও এত চমকে গেল যে, পাখিটা ওর হাত ফস্‌কে পালিয়ে গেল, আর ওর হাতে ছিঁড়ে এল পাখিটার লেজের কয়েকটা পালক। পাখিটা যখন উড়ে গেল তখন ওর মনে হল যেন পাখিটা ওকে খুব অন্যায় ভাবে ঠকিয়েছে। বেলা যত বাড়তে লাগল, ওর চারপাশে ততই জীবজন্তুর দেখা বেশি করে মিলতে লাগল। ওর একেবারে নাগালের মধ্যে দিয়ে বল্‌গা হরিণের বাচ্চারা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। একবার তো একটা শেয়াল ঠিক পাশ দিয়েই একটা পাখি মুখে নিয়ে দৌড়ে পালাল। জো একটা বীভৎস চীৎকার করে শেয়ালটাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। কিন্তু জানোয়ারটা ওর মুখের গ্রাস ফেলে গেল না।

বিকেলের দিকে ও এসে পেঁছিল আর একটা চুণের মতো ঘোলাটে সাদা নদীর ধারে। এখানে ও একরকম দানাওয়ালা ঘাস দেখতে পেল। পাগলের মতো ঘাসগুলো ছিঁড়ে দানাগুলো খেতে লাগল জো। দানাগুলোর মধ্যে অবশ্য স্বাদ বা পুষ্টি—এসব কিছুই ছিল না। অবসাদে, ক্লান্তিতে ওর কোথাও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু অসহ্য, অবিরাম, তীব্র খিদের জ্বালা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। ছোট ছোট পুকুরের পাড়ের মাটি নখ দিয়ে খুঁড়ে ও ব্যাঙ, পোকামাকড় খুঁজে বেড়াতে লাগল—এগুলোও যেন তার কাছে এখন মহাভোজ। অবশেষে একটা ছোট্ট পুকুরে ও একটা আঙুলের সমান মাছ দেখতে পেল। ঝাঁপিয়ে পড়ে খালি হাতে সেটাকে ধরার চেষ্টা করতে লাগল জো। উত্তেজনার চোটে একবার জলে পড়ে গিয়ে সারা পুকুরটাকেই ঘোলাটে করে তুলল সে। শেষ পর্যন্ত ওর টিনের পাত্রটা দিয়ে পুকুরটার সব জল ছেঁচে বার করে ফেলল। কিন্তু এর মধ্যে মাছটা পুকুরের একপাশের ছোট্ট একটা ফাটল দিয়ে পাশের একটা বড় পুকুরে পালিয়ে গেছে। সে পুকুরের জল ছেঁচে বার করা সম্ভব নয়। ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর পরিহাসে, এতক্ষণ পরে জো-র ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, মাটিতে শুয়ে পড়ে হতাশায়, দুঃখে ছেলেমানুষের মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল

সে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চাপা কান্নায় ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এক সময় উঠে আগুন জ্বালিয়ে টিনের পাত্রে জল গরম করে খেয়ে একটা পাথরের নিচে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। খিদের জ্বালায় ওর ঘুম ঠিকমতো হল না। যেন একটা তন্দ্রার ঘোরে, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইল জো। যত ভাল ভাল খাবারের স্বপ্ন দেখে ওর এই তন্দ্রার ঘোরও প্রায়ই ছুটে যেতে লাগল। পরের দিন সকালে আবহাওয়া আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল। ঘোলাটে আকাশ থেকে এবার তুষারপাতও শুরু হল। জো যতবার আগুন জ্বালাতে গেল, ততবারই গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে আগুন নিভে যেতে লাগল। অগত্যা জো আবার চলতে আরম্ভ করল। কোন্‌দিক থেকে ও এল, আর কোন্‌দিকে যাচ্ছে—তার কোনোরকম ঠিকানাই আর জো রাখবার চেষ্টা করল না। 'দিয়েজ' নদীর ধারের আশ্রয়, বিল—সবই তখনকার মতো ওর মন থেকে মুছে গেল। একটা চিন্তাই ওকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলল—'কিছু খেতে হবে।' লতাপাতা, শ্যাওলা, যা হাতের কাছে পেল, তাই ও খেতে চেষ্টা করল। সেদিন রাতে আর ওর জন্যে আগুন বা গরম জল কিছুই জুটল না। স্যাঁতসেঁতে কম্বলের নিচে শুয়ে ছটফট করে ও সারারাত কাটাল। রাতে আবার কন্‌কনে ঠাণ্ডা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। সকালে উঠে কিন্তু ও দেখল যে, ওর খিদের তীব্রতা কমে গিয়েছে—ওর পেটের ভেতরটা প্রায় অসাড় হয়ে গিয়ে সেখানে ভোঁতা, ভারী, একটানা ব্যথার এক রকম অনুভূতি জেগে উঠেছে। খিদের প্রচণ্ডতা চলে গিয়ে ওর অস্থিরতাও কমে গেল। চারদিকে তাকিয়ে ও এবার বুঝতে পারল যে, ও পথ হারিয়ে ফেলেছে। ওর মনে হল যে ও অনেকটা বাঁদিকে সরে এসেছে। কাজে কাজেই পথ ঠিক করার জন্যে এবার জো ডানদিক ধরে চলতে লাগল। কিন্তু ওর শরীর খুব দুর্বল লাগছিল—খানিকক্ষণ হাঁটার পরেই ও বেদম কাহিল হয়ে পড়ছিল, আর মনে হচ্ছিল যেন ওর বুকের মধ্যে কেউ হাতুড়ি পিটছে। তবে অস্থিরতা কমে যাওয়ার জন্যে এদিন জো দুটো পুকুর থেকে পাঁচটা ছোট ছোট মাছ ধরে আনল। যদিও ওর খিদের অনুভূতি এখন সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়েছিল তবুও জো কাঁচা মাছগুলোকে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল, কারণ বেঁচে থাকতে গেলে খেতেই হবে। এদিন খানিকক্ষণের জন্য রোদ ওঠাতে ও আগুন জ্বালাতে, আর একটু গরম জলও খেতে পারল। কিন্তু সারাদিনে দশ মাইলের বেশি হাঁটতে পারল না। পরের দিন ওর হাঁটার গতি আরো কমে গেল, কারণ খানিকক্ষণ হাঁটলেই ওর বুক এমন ধড়ফড় করতে লাগল যে ওর মনে হচ্ছিল যেন ওর হৃদ্‌পিণ্ডটা লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এদিনও জো সেই চামড়ার থলিটা আবার বার

করে আনল। তারপর সেটা থেকে এতদিনের পরিশ্রম আর কষ্টের ফলে পাওয়া সোনার গুঁড়ো আর ছোট ছোট সোনার ঢ্যালার অর্ধেকটা বার করে একটা কম্বলের টুকরোর মধ্যে ভাল করে জড়িয়ে সেটাকে একটা বড় পাথরের ঢিবির নিচে সাবধানে লুকিয়ে রাখল। বাকি অর্ধেকটা আবার নিজের বোঝার মধ্যে রেখে দিল। বন্দুকটা কিন্তু এখনো জো ছাড়েনি—'দিয়েজ' নদীর ধারে ওদের আস্তানায় পেঁছিনোর আশা এখনো ওর মন থেকে মুছে যায়নি। যে একমাত্র কম্বলটা ওর কাছে এখন ছিল এবার সেটা থেকে ফালি ছিঁড়ে ও নিজের পায়ে জড়াল, কারণ ওর রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত পা দুখানা ওকে এখন ভয়ানক কষ্ট দিচ্ছিল।

পরের দিন জো টের পেল যে ওর মধ্যে খিদে পাওয়ার অনুভূতি আবার জেগে উঠেছে। নিদারুণ দুর্বলতার জন্যে ওর মাথা সারাক্ষণ ভোঁ ভোঁ করছিল, আর প্রায়ই ও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। একবার ভাগ্যক্রমে ও একটা ঝোপের মধ্যে পাখির বাসার ওপরেই পড়ে গেল। বাসাটার মধ্যে একদিন আগে ডিম ফুটে বেরোনো চারটে পাখির ছানা ছিল। জো সেগুলোকে রাক্ষসের মতো কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। মা পাখিটা প্রাণপণে চীৎকার করতে করতে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। জো একবার ঢিল ছুঁড়ে সেটার একটা ডানা ভেঙে দিল বটে, কিন্তু সারাদিন পেছনে পেছনে ঘুরেও সেটাকে ধরতে পারল না। জীবন্ত মাংসের ঐ চারটে অতি ছোটো টুকরো খেয়ে জোর খিদে বরং আরো বেড়ে গেল। পরের দিনও কাঁধের বোঝা থেকে চামড়ার থলিটা বার করে বাকি সোনাটুকু খোলা মাটির ওপর ঢেলে ফেলে দিল। এদিন থেকে আবার ওর মধ্যে মতিচ্ছন্নতা আর চোখে ভুল দেখার লক্ষণ জেগে উঠল। মাঝে মাঝে ওর মনে হতে লাগল ওর বন্দুকের মধ্যে একটা গুলি এখনো বাকি আছে। আর একবার ও দেখতে পেল ওর সামনে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভাল ভাবে চোখ মেলে তাকিয়ে যা শেষ পর্যন্ত ও দেখল তাতে আতঙ্কে ওর গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠল। একটা বিরাট ভালুক হিংস্র-ভাবে ওর রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমর থেকে লম্বা ছুরিটা খুলে এনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল জো। তারপর একটা বিকট বন্য শব্দ চীৎকার করে উঠল—বেপরোয়া, নিরুপায় সাহস আর আতঙ্কে মেশানো সে চীৎকার। ওর ভাবভঙ্গিতে ঘাবড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ভালুকটাই চাপা গর্জন করতে করতে ওর রাস্তা থেকে সরে গেল। আসন্ন বিপদের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে জো কাঁপতে কাঁপতে অবশ শরীরে সেখানেই বসে পড়ল। অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আবার ও এগিয়ে চলল ওর অনির্দিষ্ট পথ ধরে। বিকেল বেলায় একটা জায়গায় ও অনেকগুলো

হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে দেখতে পেল। হাড়গুলো কোনো এক হতভাগ্য হরিণ শিশুর —খানিকক্ষণ আগেই নেকড়েরা সেটাকে খেয়েছে। হাড়গুলো একদম টাটকা—এখনো সেগুলোর ফুটোর মধ্যে কোণায় কোণায় লাল আর গোলাপ রং-এর মজ্জা আর কোষগুলো দপদপ করছে। জো বসে প্রাণপণে হাড়গুলো চুষতে থাকল। টাটকা মজ্জার স্বাদ যেন ওকে পাগল করে তুলল। দাঁত দিয়ে হাড়গুলো ভেঙে ফেলতে লাগল জো, তাতে মাঝে মাঝে ওর নিজের দাঁতও ভেঙে যেতে লাগল। পাথরের ঘা মেরে হাড়গুলোকে থেঁতলে গুঁড়ো করে জো সেগুলোকে গিলে খেয়ে সাবাড় করে দিল। পাথরের আঘাতে কয়েকবার ওর আঙুলগুলোও থেঁতলে গেল; কিন্তু জো-র এখন আর যন্ত্রণা বোধ করবার অনুভূতিও বিশেষ ছিল না।

পরদিন থেকে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুষারপাত। জো এবার সম্পূর্ণ দিক্‌ভ্রান্তের মতো চলতে লাগল—দিনরাতের তফাৎ আর ওর খেয়ালে রইল না। কখন দিন গিয়ে রাত আসছে, কোন্‌দিকে ও চলেছে, কখন বরফ পড়ছে, বৃষ্টি হচ্ছে—এ সমস্ত কোনো বোধই আর ওর মধ্যে ছিল না। খিদে তেষ্টা বা ঘুমের অনুভূতিও আর যেন ওর মধ্যে কাজ করছিল না। খালি বেঁচে থাকার এক অদম্য ইচ্ছাশক্তি ওকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। যতক্ষণ পারত, একটা ঘোরের মধ্যে ও চলত, যখন পারত না তখন আচ্ছন্ন ভাবে শুয়ে পড়ত। যে হরিণ-ছানার হাড়গোড়গুলোর মজ্জা ও চুষে খেয়েছিল, তার অবশিষ্ট টুকরোগুলো ও সঙ্গে করে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। সেগুলোকেই সমানে চুষে, চিবিয়ে ও এগিয়ে যেতে লাগল। জো বলে ওর যেন আর কোনো আলাদা অস্তিত্ব রইল না। একটা ক্ষীণ জীবনীশক্তি খালি ওর দেহকে সচল করে রাখল।

ক'দিন এভাবে কাটল তা ওর খেয়াল নেই। কিন্তু হঠাৎ একদিন ও একেবারে পুরোপুরি সজাগ মনে, পূর্ণ চেতনার মধ্যে জেগে উঠল। বৃষ্টি ও তুষারপাত কেটে গিয়ে চড়া রোদ উঠেছে। জীবনদায়ী সূর্যের আলো ওর দেহের লোমকূপ যেন শুষে নিতে লাগল। ওর মধ্যে জীবনের স্পন্দনও যেন অনেকখানি ফিরে এল। উষ্ণ, গরম দিনের ছোঁয়া পেয়ে ওর মনেও যেন নতুন করে জোর এল আবার। ও আশা করতে লাগল, হয়তো এবার ও ঠিক পথ চিনে এগোতে পারবে। উঠে বসে চারদিকে তাকিয়ে দেখল জো। ওর কাছ দিয়েই একটা চওড়া নদী ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। নদীটার গতিপথ লক্ষ্য করতে গিয়ে ওর চোখে পড়ল অদূরে এক বিশাল সমুদ্রের অসীম জলরাশি রোদে ঝকমক করছে। নদীটা সেখানেই গিয়ে পড়েছে। একটা জাহাজও পাল খাটিয়ে সমুদ্রের বুকে—দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটায় জো-র স্থির

বিশ্বাস হল যে ও সবটাই ভুল দেখছে—এটা একটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু বার বার চোখ রগড়ে বহু ঘণ্টা ধরেও যখন ও একই দৃশ্য দেখতে পেল, তখন ও গভীরভাবে এর মানে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল। আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটাই ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। দিক হারিয়ে ও 'দিয়েজ' নদীর সম্পূর্ণ উল্টোদিকে উত্তর পূর্বে 'কপার মাইন' উপত্যকায় চলে এসেছে। এই নদীটা হচ্ছে 'কপার মাইন' নদী, আর অদূরের সমুদ্রটা হল 'আর্কটিক' মহাসাগর। জাহাজটা তিমি মাছ ধরতে ধরতে এতদূরে চলে এসেছে। যে জায়গায় জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে 'করোনেশন' উপসাগর। বহুদিন আগে দেখা এই অঞ্চলের একটা ম্যাপের কথা ওর চট্ করে মনে পড়ে গেল।

এক মনে এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কাছেই একটা অদ্ভুত ধরনের কাশির আওয়াজ শুনে ও চম্‌কে ফিরে তাকাল। কাছেই একটা বুড়ো দুর্বল নেকড়ে দাঁড়িয়ে লোভাতুর, করুণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। জো উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল—শেষ চেষ্টা একবার সে করে দেখবে। ঐ জাহাজটায় তাকে পৌঁছতেই হবে। ওর পা দুটো এতক্ষণে রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। ওর একমাত্র কম্বল দুটোর এতদিন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অগত্যা ও প্যাণ্টের তলার দিক আর শার্টের খানিকটা ছিঁড়ে হাঁটুতে, পায়ে জড়ালো। কিন্তু ও কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। তাই ও হামাগুড়ি দিতে দিতেই এগোতে থাকল। ওর ভেতরের জামার ভেতরে, তেলা কাগজে মোড়া বারুদের কাঠিগুলো অবশ্য ঠিক ছিল। অনেক কষ্টে ও আগুন জ্বালাল। তারপর একটু জল গরম করে খাওয়ার পর ও দেখল যে, আবার ও উঠে দাঁড়াতে পারছে। কিন্তু কয়েক মিনিট হাঁটবার পরেই আবার ওকে বসে পড়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছিল। সারাদিনে ও কোনো-রকমে মাইল চারেক মাত্র এগোতে পারল। নেকড়েটাও ঠিক ওর পেছন পেছন চলল। রাতে ওর ঘুম এলো না—একদিকে জাহাজটার চিন্তা, অন্যদিকে নেকড়েটার কাশি ঘুমের মধ্যে ওকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। সারারাত ধরে বল্‌গা হরিণদের চলাফেরার আওয়াজ ও শুনতে পাচ্ছিল। ওর চারদিকেই সুস্থ, সবল জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—ব্যতিক্রম খালি ও নিজে আর ওই বুড়ো নেকড়েটা। নেকড়েটা যে ছায়ার মতন ওর পেছনে লেগে থাকবে—এটাও জো ভালভাবেই বুঝতে পারছিল। ওর মৃতদেহই নেকড়েটার সম্ভাব্য খাবারের একমাত্র আশা, কারণ জো-র মতোই কোনো সুস্থ জীবকে শিকার করা নেকড়েটারও ক্ষমতার বাইরে চলে গেছিল। জো-র ভাগ্যক্রমে আবহাওয়া চমৎকার হয়েই রইল—উজ্জ্বল, গরম সূর্যালোকের মধ্যে ও কখনো হেঁটে,

কখনো গড়িয়ে জাহাজ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। বিকেল বেলার দিকে একটা মানুষের চলার চিহ্ন ওর নজরে পড়ল। মানুষটা হামাগুড়ি দিয়েই এগিয়ে গিয়েছে। শিগগিরই এক ধবধবে সাদা হাড়ের স্তূপের সামনে এসে দাঁড়াল জো। চারপাশে অনেক নেকড়ের পায়ের দাগ। একপাশে ঠিক তার থলিটার মতো একটা চামড়ার সোনাভর্তি থলি পড়ে ছিল। এ থলিটা তার খুব ভালোভাবেই চেনা। বিল তাহলে শেষ পর্যন্ত থলিটা ছাড়েনি। প্রথমে ও গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল—নিজের বিকট, কর্কশ গলার আওয়াজে নিজেই চমকে উঠল ও। নেকড়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত বিকৃত আওয়াজ করে যেন তার উত্তর দিল। বিল বাঁচেনি, কিন্তু জো বাঁচবেই—বিল-এর সোনার থলিটা সঙ্গে নিয়েই ও জাহাজে উঠবে। প্রথমে এই কথা ভেবে হেসে উঠেই কিন্তু জো চুপ করে গেল ওর দুর্গম যাত্রার সঙ্গী বিল-এর এই পরিণতি ওর মগজে গিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঘা মারল। আস্তে আস্তে থলিটা রেখে দিয়ে সরে এল জো। বিল ওকে ছেড়ে চলে এসেছিল, কিন্তু ও বিল-এর ফেলে যাওয়া সোনা ছোঁবে না, বা বিল-এর টাটকা হাড়গুলোও চুষবে না। তবে এগিয়ে যেতে যেতে ও ভাবল, ও নিজে মারা গেলে কিন্তু বিল ওকে ছেড়ে দিত না।

বেশ খানিকক্ষণ চলার পর একটা বড় পুকুরে ও অনেকগুলো মাছ দেখতে পেল। কিন্তু ও এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, হাত পা অবশ হয়ে ডুবে যাওয়ার ভয়ে ও জলে নামল না। জলের মধ্যে নিজের মুখের বীভৎস, বিকট প্রতিচ্ছবি দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠল জো। সেদিন ও মাইল তিনেক পথ এগোল, পরের দিন দু মাইল। বিল-এর মতোই এখন ও হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল। পাঁচদিন এইভাবে চলার পরেও জাহাজটা সাতমাইল দূরে থেকে গেল। এখন আর ও দিনে এক মাইলও এগোতে পারছিল না। কঠিন বরফের ওপর রক্তের ছোপ ফেলতে ফেলতে ও প্রায় গড়িয়ে গড়িয়েই চলতে লাগল। একবার কোনো রকমে পেছনে ফিরে ও দেখল যে নেকড়েটা লোভীর মতো সেই রক্তের ছোপ চাট্‌তে চাট্‌তে এগোচ্ছে। এবার ও নিশ্চিত বুঝতে পারল যে, ওর যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে নেকড়েটাকে ওর খতম করতেই হবে। তাছাড়া এখন ওর কাছেও নেকড়েটার রক্তমাংসই একমাত্র সম্ভাব্য খাবারের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুরু হল এক অদ্ভুত লড়াই। একদিকে একটা হামাগুড়ি দেওয়া মৃতপ্রায় মানুষ, অন্যদিকে সেই রকম নিঃসঙ্গ, অসুস্থ, ধুঁকতে থাকা একটা জানোয়ার। যতক্ষণ হুঁশ থাকত, ততক্ষণ ও গড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেত। অন্য সময়ে ও বেহুঁশের মতো পড়ে থাকত। এখন আর জো কোনো সময়েই পুরোপুরি সজাগ থাকত না। সুগভীর ক্লান্তি আর অবসাদের সমুদ্রের মধ্যে যেন আচ্ছন্নের মতো তলিয়ে থাকত

সে! একবার এরকম বেহুঁশ, অচৈতন্য অবস্থা থেকে চমকে জেগে ও বুঝতে পারল, নেকড়েটা দুর্বলভাবে ওর গলায় দাঁত বসাবার চেষ্টা করছে। জো হাত বাড়াতেই সেটা লাফিয়ে সরে গেল। শেষবারের মতো, মনের সব জোর দিয়ে জো নিজেকে পুরোপুরি সজাগ করে তুলল। জাহাজটা এখন আর ওর কাছ থেকে মাত্র চার মাইল দূরে ছিল। জাহাজটার সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল জো। সামনেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জীবনের হাতছানি। কিন্তু চার মাইল কেন, আর আধ মাইলও জো-এর এগোনোর ক্ষমতা ছিল না। তা সত্ত্বেও বেঁচে থাকবার এক অদম্য ইচ্ছা ওর মনে জেগে রইল। চুপ করে একভাবে শুয়ে থেকে ও নেকড়েটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। দুজনের মধ্যে চলল এক অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা, বেঁচে থাকার শেষ লড়াই। এক সময় জো টের পেল যে নেকড়েটা আস্তে আস্তে আবার এগিয়ে এসে ওর গলাটা কামড়ে ধরতে চাইছে। চরম সাবধানতার সঙ্গে জো একহাত দিয়ে নেকড়েটার চোয়াল, আর অন্যহাতে সেটার গলা চেপে ধরল। দুজনের মধ্যে চলল এক মরণপণ ধস্তাধস্তি। শেষ পর্যন্ত জো দুর্বল শরীরের সমস্ত জোরটুকু দিয়ে নেকড়েটাকে মাটিতে ফেলে সেটার ওপর শুয়ে পড়ল, আর ওর দাঁত দিয়ে কোনোরকমে নেকড়েটার কণ্ঠনালী কামড়ে ধরল। খানিকক্ষণ পরে ও টের পেল ওর গলার মধ্যে গলানো সিসার মতো বিস্বাদ, গরম রক্তের স্রোত এসে পড়ছে। ওর সমস্ত দেহমন গুলিয়ে উঠল। কিন্তু মনকে শক্ত রেখে ও নেকড়েটার রক্ত খেয়েই চলল—ওকে বাঁচতেই হবে। অবশেষে এক সময় মরা নেকড়েটাকে ছেড়ে দিয়ে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল জো।

সমুদ্রতীরে 'রেডফোর্ড' নামে যে তিমিধরা জাহাজটা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়েছিল, এক বৈজ্ঞানিক অভিযানের কয়েকজন অনুসন্ধানকারী-ও তাতে ছিলেন। একদিন জাহাজের ডেক থেকে হঠাৎ সমুদ্র সৈকতের ওপর একটা অদ্ভুত জিনিসের দিকে ওদের চোখ পড়ল। জিনিসটা গড়াতে গড়াতে, মোচড়াতে মোচড়াতে জলের দিকে এগিয়ে আসছে। অনুসন্ধানকারীরা সঙ্গে সঙ্গে নৌকায় চড়ে তীরে গিয়ে উঠলেন, ব্যাপারটা কি তার খোঁজ নিতে। ওঁরা দেখলেন যে জিনিসটা মানুষই, কিন্তু মানুষ বলে তাকে চেনা প্রায় অসম্ভব। প্রায় হতচেতন অন্ধ সেই জীবন্ত, রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডটা বিরাট একটা পোকার মতো মাটির ওপর কিলবিল করছে। সেটা এগোতে প্রায় পারছেই না, কিন্তু চেষ্টা করতে-ও ছাড়ছে না। মোচড় খেতে খেতে এক একবার হয়ত ফুট দুয়েক নড়াচড়া করে ঘণ্টায় বড় জোর কুড়ি ফুটের মতো সেটা সামনে এগোচ্ছে।

সপ্তাহ তিনেক পরে 'রেডফোর্ড' জাহাজের একটা কেবিনে শুয়ে জো হাউমাউ

করে কাঁদতে কাঁদতে ওর মায়ের কথা, ক্যালিফোর্নিয়ায় ওর সুন্দর, রৌদ্রালোকিত বাড়ির কথা, ওর বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলছিল। ওর বেঁচে থাকার রূপকথা কাহিনী সবাই হতবাক্ হয়ে শুনে গেল। আরো কয়েকদিন বাদে ওকে দেখা গেল জাহাজের খাওয়ার টেবিলে সবার সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করছে। এত খাবারের রাশি দেখে জো-র মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠছিল বটে, কিন্তু লোকেদের মুখের ভেতরে প্রতিটি খাবারের গ্রাস অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চোখেমুখে কেমন যেন একটা দুঃখের ছাপ ফুটে উঠছিল। ওর খালি ভয় হত, জাহাজের খাবার হয়ত শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যাবে। চুপি চুপি ও জাহাজের স্টোর রুমের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, আর প্রায়ই রাঁধুনীকে জিজ্ঞেস করে জাহাজের খাবারের ভাঁড়ার ঠিক আছে কিনা—সেটা জেনে নিত। এরপর দেখা গেল যে ও ক্রমশঃ মোটা হয়ে যাচ্ছে। ওর খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেও কোনো ফল হল না। শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, প্রতিবার খাওয়া দাওয়ার পরেই জো চুপি চুপি সারা জাহাজময় ঘুরে বেড়ায় আর সব নাবিকদের কাছ থেকে বিস্কুট চেয়ে নিয়ে সেগুলোকে খুব যত্নের সঙ্গে মহামূল্যবান সম্পত্তির মতো নিজের জামার নিচে ঢুকিয়ে রাখে। নাবিকরাও সবাই মুচকি হেসে ওর এই অদ্ভুত খেয়াল মেনে নেয়। এরপর ওর কেবিন খুঁজেও দেখা গেল যে লুকোনো শক্ত খাবার আর বিস্কুটে ওর বিছানার তলা আর অন্যান্য সব গোপন জায়গা বোঝাই। তাই বলে জো কিন্তু পাগল হয়ে যায়নি মোটেই—খালি খিদের ব্যাপারে যন্ত্রণা আর আতঙ্কের কথা ওর সব সময় মনে পড়ত। যাতে ঐ রকম নরক যন্ত্রণা আর তাকে কিছুতেই ভোগ করতে না হয়, তার জন্য এই খাবার লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটাকে খুবই স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করত। তবে, শিগগিরই ও এই অবস্থা কাটিয়ে উঠল। 'রেডফোর্ড' যখন সান ফ্রানসিসকোয় গিয়ে নোঙর ফেলল জো তখন পুরোপুরি তার মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে। সে তখন বেঁচে থাকার সত্যিকারের রূপকথার এক জীবন্ত নায়ক।

THE APOSTATE

দল ছুট

'জনি, উঠে পড়্ শিগগির। কথা না শুনলে খেতে দেব না কিন্তু।'

আধ ঘুমন্ত ছেলের কানে মা-র কথাগুলো ঢুকল-ই না। প্রাণপণে সে আবার গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে চেষ্টা করল। রোগা রোগা হাতের মুঠি পাকিয়ে মা-র দিকে ঘুসি ছুঁড়তে লাগল সে। একটা ঘুসি-ও অবশ্য মায়ের গায়ে লাগল না। মা এবার ওর কাঁধদুটো ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন।

'আরে ধ্যুৎ তেরি ছাই। ছেড়ে দাও না আমাকে।' ছেলেটা প্রায় ককিয়ে কেঁদে উঠল। একটানা স্বরে সমানে সে ঘ্যানঘ্যান করে যেতে লাগল। ওর মা অবশ্য তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না, কারণ প্রতিদিনই সকালে এই একই ব্যাপার ঘটে। উনি এবার চাদর ধরে টেনে ছেলেকে বিছানা থেকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছেলেটা-ও প্রাণপণে বিছানায় চাদর আঁক্‌ড়ে ধরে শুয়ে রইল। তবে শেষ পর্যন্ত মায়ের গায়ের জোরের কাছে হার মানতেই হল তাকে। বিছানা থেকে উল্টে পড়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুমের ঝোঁক কেটে গিয়ে পুরোপুরি জেগে উঠ্‌ল জনি। তারপর উঠে বসে সহজভাবে মাকে বলল 'ঠিক আছে। উঠে পড়েছি।' মা তাড়াতাড়ি বাতিদানটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শাসিয়ে গেলেন—'আজ তোর হাজিরা খাতায় লাল ঢ্যাঁরা পড়বেই, দেখে নিস্ তুই।'

ছেলেটা অন্ধকার ঘরেই জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর পা ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে রান্নাঘরে ঢুকে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল। মা ওকে এক ধমক লাগালেন 'কি রে জনি, হাতমুখ ধুলি না যে বড়। ওঠ শিগ্‌গির।' অগত্যা ছেলেটা খুব অনিচ্ছাভাবে নোংরা বেসিনটার কাছে গিয়ে কোনোরকমে চোখে মুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে নিল। আলাদা করে দাঁত মাজবার প্রশ্নই ওঠে না। মা গজ্‌গজ করতে লাগলেন—'বকাবকি না করলে সারাদিনে অন্ততঃ একবার-ও নিজে থেকে হাতমুখ ধুতে পারিস না, না?' জনি চুপ করে রইল বেশি কথাবার্তা বলতে ওর ভাল লাগে না। তাছাড়া প্রত্যেকদিন মায়ের কাছে একই বকুনি খেতে খেতে এটা ওর একদম গা-সওয়া হয়ে গেছে। একটা নোংরা, ভিজে রোঁয়া ওঠা তোয়ালেতে হাত-মুখ মুছে নিল সে—ওর চোখেমুখে তোয়ালের সুতোর একগাদা আঁশ লেগে রইল।

তারপর আবার সে টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল। মা একটা ঢাকনা ভাঙা কেট্‌লি থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বলে উঠলেন—'কি করব বল্‌। যা করি, তা সবার ভালোর জন্যেই করি। এতদূর থেকে কারখানায় যাওয়া আসা করতে সত্যিই খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এখানে ঘর ভাড়াটা-ও কম পড়ে, জায়গাটা-ও বড়। তুই তো বুঝিস-ই সব।' এ কথাগুলোও জনি প্রায় প্রত্যেকদিন-ই শোনে, কারণ ওর মায়ের কথাবার্তা বলার বিষয়বস্তু খুবই সীমাবদ্ধ। জনি-ও একই রকম উত্তর দিল—'ঘর ভাড়ার পয়সাটা বাঁচলে তা দিয়ে বেশি খাবার দাবার কেনা যায়—একটু বেশি না হয় হাঁটলাম-ই তাতে আর কি হয়েছে। কথাগুলো বলতে বলতে জনি গোগ্রাসে ওর খাবারটুকু খেয়ে নিচ্ছিল। সত্যিকারের ভাল কফির স্বাদ ও জীবনে কখনো পায়নি। তাই গরম, ঘোলাটে, তরল যে জিনিসটাতে ও প্রত্যেকদিন সকালে চুমুক দেয়, সেটাই ওর কাছে অতি চমৎকার কফির শেষ কথা। রুটির সঙ্গে একটুক্‌রো ঠাণ্ডা শুয়োরের মাংসও ওর মিলে গেল। রুটির শেষ টুক্‌রোটা কামড়াতে কামড়াতে ও বুঝতে চেষ্টা করল, আর এক আধ টুক্‌রো রুটি মা ওকে দেবে কিনা। ওর পেটের খিদে তখনো পুরোপুরি মেটেনি! ওর মা কিন্তু ওর মনের ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে এক ধমক লাগালেন—'জনি, বেশি লোভ করিস না। তোর ভাগের সবটুকু খাবারই দিয়ে দিয়েছি। তোর ছোট ছোট ভাই বোনগুলো কি খাবে?' জনি কোনো উত্তর দিল না, টেবিলের রুটির দিকে-ও আর তাকালো না। কোনো ব্যাপারেই কোনোরকম নালিশ বা অভিযোগ করা ওর ধাতে নেই। তাছাড়া জন্ম থেকে একটি শিক্ষাই ও জীবন থেকে পেয়েছে—চুপচাপ সব কিছু মেনে নেওয়া। তাই নিঃশব্দে বাকি কফিটুকু শেষ করে হাতের উল্টোদিক দিয়ে মুখ মুছে ও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তে গেল। মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—'এই, একটু বসে যা তো। মনে হচ্ছে আর একটা টুক্‌রো পাতলা রুটি তোকে দেওয়া যেতে পারে।' এই বলে উনি রুটি থেকে একটা টুক্‌রো কেটে নেওয়ার ভান করে চুপি চুপি নিজের জন্য রাখা দু'টুক্‌রো রুটির একটা টুক্‌রো ছেলের হাতে তুলে দিলেন। জনির কাছে অবশ্য এই কারচুপিটুকু ধরা পড়ে গেল। ও শুকনো রুটি চিবোচ্ছে দেখে মা নিজের কাপ থেকে বাকি কফিটুকু ওর কাপে ঢেলে দিয়ে বলে উঠলেন—'না, আমার পেটটা তেমন ভাল ঠেকছে না। কফিটা খাওয়া ঠিক হবে না।'

ঠিক এই সময় বহুদূর থেকে ভেসে আসা তীক্ষ্ণ, দীর্ঘস্থায়ী কারখানার বাঁশির আওয়াজে দু'জনেই চম্‌কে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল! তাকে রাখা টিনের অ্যালার্ম ঘড়িতে ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজে। জনির মা নিজের মনেই বলে উঠলেন—'আজ নির্ঘাৎ দৌড়তে হবে, বুঝলি খোকা?' তারপর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে মাথায়

একটা পুরোনো টুপী পরে ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন তিনি। জনি-ও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এল। বাইরে তখনো অন্ধকার চারদিক খাঁ খাঁ করছে। দুজনে মিলে প্রায় মিনিট পনেরো জোরে জোরে হাঁটবার পর মা ডানদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লেন। অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওঁর গলা শোনা গেল—'খোকা সময়মতো বাড়ি ফিরে আসবি কিন্তু।'

জনি কোনো উত্তর না দিয়ে একমনে পথ চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বহু লোকই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কারখানার দরজায় পৌঁছে জনি একবার পূবের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল—বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে ফ্যাকাসে দিনের আলো সবে উঁকি মারতে শুরু করেছে। কারখানায় ঢুকে ওর কাজের জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াল জনি। তারপরেই সে কাজের মধ্যে ডুবে গেল। কাজটা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু হাত খুব তাড়াতাড়ি চলা চাই। সামনের একটা খোলা বাক্সে অসংখ্য ছোট ছোট 'ববিন' রাখা আছে। মাথার ওপরে বড় বড় 'ববিন' খুব দ্রুতবেগে অনবরত ঘুরছে। ছোট ববিন থেকে পাটের 'টোয়াইন' সুতো বড় ববিনের সুতোর সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে। বড় ববিনগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘোরে যে ছোট ববিনগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খালি হয়ে যায়। তাই এক মুহূর্তও হাত ফাঁকা থাকে না। জনি কাজ করে যেতে লাগল ঠিক একটা নিখুঁত, তেল দেওয়া নিঃশব্দ যন্ত্রের মতো। ওর দুটো হাত-ই চলতে লাগল একেবারে নির্ভুলভাবে। জনি একবার অহংকার করে বলেছিল যে সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ববিনে সুতো লাগাতে পারে। তা, কথাটা খুব মিথ্যে-ও নয়। ও মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখত যেন সে শত শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ অসংখ্য ববিনে সুতো পরিয়ে যাচ্ছে। ওর আশেপাশের ছেলেগুলো প্রায়ই ফাঁকি মারত। ধরা পড়ে গেলে ওভারসিয়ার বাবু এসে তাদের কান মলে দিয়ে বলতেন—'ঐ তো, পাশেই জনি আছে। ওর মতো হতে পারিস না?' জনির কানে কথাগুলো যেত বটে, কিন্তু তাতে ওর মনে কোনো সাড়া জাগত না। চোখেমুখেও কোনো আনন্দের ছাপ ফুটে উঠ্‌ত না। প্রায়ই ওর সম্বন্ধে বলা হত যে, জনি একজন নিখুঁত কর্মী। এটা শুনেও ওর মনে তখন আর কোনো প্রতিক্রিয়া হত না। নিখুঁত কর্মী থেকে এতদিনে ও একটা নিখুঁত যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছিল। ওর কাজেও কখনো যদি কোনো গণ্ডগোল হত, তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা যেত যে আদতে ওর হাতের মেশিনটাতে-ই গলদ ছিল। জনির পক্ষে ভুল করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না, কারণ জন্ম থেকেই মেশিন ওর একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ঠিক করে বলতে গেলে, মেশিনের মধ্যেই ওর জন্ম হয়েছিল, মেশিনের মধ্যেই ও বেড়ে উঠেছে।

বারো বছর আগে এই কারখানারই তাঁতঘরে কাজ করতে করতে ওর মা প্রসবযন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘরের মেঝেতেই চারদিকের চালু মেশিনের প্রচণ্ড আওয়াজের মধ্যে জনির জন্ম হয়। পাটের ফেঁসোর ধুলো মেশানো সেই ঘরের গরম বাতাসেই সে এই পৃথিবীতে প্রথম নিঃশ্বাস নিয়েছিল। জন্মের প্রথম দিনটিতেই ওর কচি ফুসফুসে সেই ধুলো ঢুকে গিয়ে যে কাশির রোগ ধরে গিয়েছিল, আর তা কখনো সারেনি।

সকাল এগারোটা নাগাদ হঠাৎ ওদের ঘরে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। জনির ঠিক উল্টোদিকে যে একঠেঙে ছেলেটা কাজ করত, সে চট্‌পট্‌ ক্রাচসুদ্ধ একটা কোণায় লুকিয়ে পড়ল। জনি দেখতে পেল যে কারখানার সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব একজন ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরা ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। জনি বুঝতে পারল যে, ইনি আর কেউ নন, খোদ কারখানা 'ইন্‌স্‌পেক্‌টর'। ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব সব ছেলেগুলোকে কড়া চোখে লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে চললেন। জনির কাছে এসেই হঠাৎ উনি থেমে গিয়ে ওর লিক্‌লিকে হাতখানা ধরে মেশিনের কাছ থেকে সরিয়ে আনলেন। তারপর ধমকে হাতটা ছেড়ে দিলেন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব একটু ফ্যাকাসে হাসি হেসে বললেন—'ইয়ে মানে ছেলেটা বড্‌ড্‌ রোগা।' 'শুধু রোগা?'—ইন্‌স্‌পেক্‌টর মশাই তেড়ে উঠ্‌লেন—'এ তো পুরো অপুষ্টি রোগে ভুগছে—রিকেট হয়েছে এর। ভবিষ্যতে যদি এর মৃগী রোগ না হয়, তবে তার একমাত্র কারণ হল, তার আগেই এর যক্ষ্মা হবে।'

এঁদের এসব কথাবার্তা জনির মাথায় মোটেই ঢুক্‌ছিল না। ভবিষ্যতের কোনো অসুখের কথা ভেবে সে আদৌ চিন্তিত নয়। ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেবের উপস্থিতিই আপাততঃ তাকে খুব অসুস্থ করে তুলেছিল। উনি খুব চেঁচিয়ে—কারণ তা নইলে মেশিনের আওয়াজ কিছুই শোনা যাবে না—জনিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলেটা, সত্যি কথা বলবি। তোর ঠিক বয়স কত?'

'চোদ্দ বছর'—জনি-ও যতটা পারে চেঁচিয়ে মিথ্যে উত্তর দিল। জোরে চেঁচানোর ফলে আবার কাশতে শুরু করল সে। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব বলে উঠ্‌লেন—'দেখলে কিন্তু মনে হয় এর অন্ততঃ ষোল বছর বয়স।'

'হ্যাঁ, ষাট বছর বয়স-ও মনে হতে পারে'—ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব ঠাট্টা করে উত্তর দিলেন। 'তা ছেলেটা এখানে অনেক দিন ধরে কাজ করছে বুঝি?'

'না, না, মানে এই কখনো সখনো, তা-ও এই নতুন আইন চালু হওয়ার আগে।' সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব চট্‌পট্‌ জবাব দিলেন। এরপর ওরা সবাই মিলে এগিয়ে

চললেন, জনি-ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর বয়স যে আসলে চোদ্দ বছরের কম, এটা ইন্‌সপেক্‌টরের মাথায় ঢুকে গেলেই এখুনি ও ছাঁটাই হয়ে যেত। সেই একঠেঙে ছেলেটা কিন্তু ধরা পড়ে গেল। ইন্‌সপেক্‌টর সাহেব বেচারিকে তাকে লুকোনো জায়গা থেকে ঠিক বের করে আনলেন। অসহায় ভয়ে ছেলেটার চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল তার। ওভারসিয়ার মশাই তো এমন আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার ভান করলেন যেন উনি ছেলেটাকে জীবনে এই প্রথম দেখছেন। কিন্তু সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেব যে সত্যি সত্যি খুব চটে গেছেন, তা ওর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। 'ছেলেটাকে আমি ভাল করেই চিনি'—ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব জানালেন। ওর আসল বয়স বারো বছর। আমি এই এক বছরের মধ্যেই ওকে তিন তিনটে কারখানা থেকে বের করে দিয়েছি—এটা নিয়ে চার নম্বর হবে।' ছেলেটাকে এক ধমক লাগালেন তিনি—'কি রে হতভাগা, শেষবার না তুই দিব্যি করে বলেছিলি যে এবার তুই নিশ্চয়ই স্কুলে ভর্তি হবি? আর এরকম বিচ্ছিরি কাশি-ই বা কি করে হল তোর?' একঠেঙে ছেলেটা এবার ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। 'দোহাই, ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব, আমাকে ছেড়ে দিন। আমরা বড় গরিব, দু'বেলা খাওয়া জোটে না। আমার দু'দুটো বাচ্চা ভাই মারা গেছে। আর আমার এই কাশিটার কথা বলছেন? ওটা কিছু না। গত সপ্তাহে হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছিল, তাই কাশি হয়েছে।' ছেলেটা আরো অনেক কিছু এক নাগাড়ে বলে গেল মরিয়া হয়ে।

ইন্‌স্‌পেক্‌টর সাহেব কিন্তু ছাড়লেন না, ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উদ্বিগ্ন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব প্রাণপণে তাঁকে কি সব যেন বোঝাতে বোঝাতে সঙ্গে গেলেন। এরপরে আবার আগেকার মতো একঘেয়ে কাজ চলতে লাগল পুরোদমে। ছুটির বাঁশি বাজবার পর জনি যখন কারখানার গেট দিয়ে বেরিয়ে এল, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। ভোর বেলায় যে ফ্যাকাসে আলো সে পূর্বদিকে একঝলক দেখেছিল, তা' কখন পশ্চিম দিকে বিদায় নিয়েছে।

রাতের খাওয়াটা জনিরা সবাই একসঙ্গে বসেই করত। এই সময়টাতেই জনির সঙ্গে তার ভাইবোনদের দেখা হত। জনির কাছে অবশ্য এই দেখাশোনা হওয়াটা মোটেই কোনো সুখবর ঘটনা বলে মনে হত না। নিজের শৈশব কবে পেছনে ফেলে এসেছে, তা ওর মনেই পড়ে না,—তাই ভাইবোনদের ছেলেমানুষি আর হৈ-হট্টগোল একেবারেই পছন্দ হত না। এই বয়সেই জনির স্বভাব হয়ে উঠেছিল বুড়োদের মতো খিট্‌খিটে আর অসহিষ্ণু। কট্‌মট্‌ করে ভাইবোনদের কাণ্ডকারখানা দেখত সে, আর

মনে মনে এই ভেবে সান্ত্বনা পেত যে শিগ্‌গিরই ওদের-ও কাজ করতে বেরোতে হবে। তখনই এই সব বাঁদরামো করা বন্ধ হয়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে জনি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির চাতালটার ওপর গিয়ে চুপ করে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। কোনোরকম চিন্তা অবশ্য ও করছিল না, কারণ ওর মন সব সময়েই ঘুমিয়ে থাকত। কিন্তু ওর ভাইবোনগুলো বেরিয়ে এসে ওর কাছেই খেলাধুলো, হৈ চৈ লাগিয়ে দিল। জনি খিট্‌খিটে, বদরাগী বলে সবাই ওকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতে চাইল, ওর সামনে এসে হাতধরাধরি করে তালে তালে নানারকম ছড়া কাটতে লাগল। ওদের ধমক ধামক দিয়ে কোনো ফল হল না দেখে চুপ করে গেল জনি। জনির পিঠোপিঠি ছোট ভাই বিল-ই ছিল এই দলটার সর্দার। তার বয়স সবে দশ ছাড়িয়েছে। ছেলেবেলায় এই বিল্‌-এর জন্য জনিকে অনেক কিছু ছাড়তে হয়েছে। বিল যখন একেবারে কচি বাচ্চা, তখন-ই ওর মাকে কারখানায় কাজ করতে যেতে হত। তাই ছোট্ট দু বছরের জনিকে-ই নিজের খেলাধুলো ছেড়ে ভাই-এর দেখা শোনা করতে হত! সেই ছিল একবারে বিল্‌-এর বাবা আর মা দুই-ই। বিলের জন্য ওর খাবারের ভাগে-ও অনেক সময় টান পড়েছে। অথচ এখন অকৃতজ্ঞ বিল সেটা যেন মানতেই চায় না, দাদাকে গ্রাহ্যই করে না। সেই জন্য জনি বিল-কে দু'চোখে দেখতে পারত না। বিল-এর স্বাস্থ্য আর স্বভাব—দুটোই ছিল দাদার একেবারে বিপরীত। ওর স্বাস্থ্য ছিল বেশ ভাল, গাঁট্টাগোট্টা ওজন-ও ছিল দাদার চাইতে বেশি। জনি সবসময়েই যেন কিরকম ক্লান্ত, নিরুৎসাহ ভাবে ঝিম মেরে থাকত। কিন্তু বিল্‌ ছিল দারুণ ছট্‌ফটে আর টগবগে, উৎসাহে আর প্রাণচাঞ্চল্যে সে যেন সব সময়েই ফেটে পড়ছে। ও ক্রমশঃই জনিকে বেশি করে জ্বালাতন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একদম কাছে এসে দাদাকে মুখ ভেংচে দিল। জনি আর চুপ করে থাকতে পারল না। বাঁহাত দিয়ে বিল্‌-এর গলাটা ধরে কাছে টেনে এনে ডান হাতে ওর নাকে একটা ঘুঁষি মারল। তারপর ওকে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওর মুখখানাকে মাটির মধ্যে বেশ ভাল ভাবে রগ্‌ড়ে দিয়ে ছেড়ে দিল। অন্যান্য ভাইবোনগুলো ওদের এই মারপিট দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। ওর বোন জেনি ঘরে ঢুকে মাকে ডেকে নিয়ে এল। মা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়ে এসে বিল্‌কে কাছে টেনে নিয়ে জনিকে বকাবকি শুরু করে দিলেন। জনি-ও মুখে মুখে জবাব দিল—'তা, ও বিনা কারণে অনবরত আমাকে বিরক্ত করছে কেন? ও দেখতে পাচ্ছে না যে আমি ক্লান্ত হয়ে বসে আছি? বিল কাঁদতে কাঁদতে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলে উঠ্‌ল—'আমি এখনই তোর মতো বড় হয়ে গেছি। এরপর তোকে আমি মাথায় আর-ও ছাড়িয়ে যাব। তারপর দেখব তুই

যাস কোথায়।' জনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'তা, তুই যখন এতই বড় হয়ে গেছিস, তখন কোথাও কাজে ঢুকে পড়িস্ না কেন? কাজ করতে যাওয়াটাই এখন তোর আসল দরকার, আর মায়েরই এটা করে দেওয়া উচিত। ওদের মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্লেন 'আহা রে, এটা কি বল্ছিস? বিল্টা তো এখনো নেহাৎই বাচ্চা।' জনি এবার গম্ভীরভাবে জবাব দিল 'মা, তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ যে আমি যখন কাজ করতে আরম্ভ করি তখন আমি বিল্-এর চাইতেও অনেক ছোট ছিলাম।' আরো অনেক কিছুই সে বলতে চাইছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপ করে গিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে ও শুনতে পেল, মা এক প্রতিবেশিনীর কাছে কাঁদতে কাঁদতে দুঃখ করছেন—'জনিটার আজকাল কি হয়েছে কে জানে—আগে তো ও এত অধৈর্য ছিল না। ছেলেটা অবশ্য আমার খুবই ভাল। সেই ছোট্ট বয়স থেকে একনাগাড়ে সংসারের পেছনে খেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা তো আর আমার দোষ নয়। আমি যা করি, তা সবার ভালোর জন্যই করি।'—মার বিলাপ শুনতে শুনতে একসময় জনির চোখ বুজে এল। পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতে আবার মার টানা-হেঁচ্ড়ায় ঘুম থেকে ওঠা, সামান্য খাবারটুকু খেয়ে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে পথ চলা। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে কারখানায় ঢুকে যাওয়া। কাজে ছুটি হলে অন্ধকারে বাড়ি ফিরে আসা। প্রত্যেকটা দিনই ঠিক একই ছাঁচে ঢালা—সেই একই রকমের ক্লান্তিকর, একঘেঁয়ে জীবনযাত্রা। অবশ্য ওর জীবনে যে কখনোই কোন বৈচিত্র্য আসেনি তা না,—যেমন একটা কাজ ছেড়ে অন্য কাজ নেওয়া, অসুখে পড়া, বাড়িতে ভাল খাবার-দাবার হওয়া।—এ ধরনের ঘটনাগুলো। ওর যখন ছ' বছর বয়স, তখনই ওর ওপর সব কটা ছোট ছোট ভাই বোনের দেখাশোনা করার সব ভার এসে পড়েছিল। মাত্র সাত বছর বয়সের সময় ও কারখানায় কাজে ঢোকে। তখন থেকেই সে যেন সাবালক, উপার্জনক্ষম, স্বাধীন এক পুরুষ। মা-ও তখন থেকেই তাকে খানিকটা অন্য চোখে দেখতেন। শুধুই একটা ছোট ছেলের মতন নয়, কিছুটা নিজের সমকক্ষ বলেই ভাবতেন। কারণ সেও তার মায়ের মতোই খেটে সংসারের জন্য পয়সা আনছে। ও যখন এগারো বছরে পা দিল তখন ও পুরোপুরি একজন সাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক, অভিজ্ঞ মানুষ হয়ে গেল। কারণ এই সময় ও ছ'মাস ধরে কারখানায় রাত্তিরের শিফ্টে কাজ করেছিল। আর রাত্তিরের শিফ্টে কাজ করবার অভিজ্ঞতা হয়ে যাওয়ার পর কোনো শিশুকর্মীই আর শিশু থাকে না। আট বছর বয়সের সময় ও একটা কাপড়ের কলে খুব ভাল একটা কাজ পেয়েছিল। ওকে এক জায়গায় বসে বসে মেশিন থেকে অনবরত বেরিয়ে আসা কাপড়ের থানগুলোকে একটা ছোট লাঠি

দিয়ে ঠিক মতো চালিয়ে দিতে হত।—সেগুলো একটা গরম রোলারের ওপর দিয়ে কোথায় যেন চলে যেত। এই অফুরন্ত কাপড়ের স্রোত দেখতে দেখতে ওর মন কল্পনার পাখায় ভর করে যেন কোন্ সুদূরে চলে যেত। নানা রকম নতুন নতুন চিন্তার মধ্যে ও ডুবে যেত। এই সময়েই একবার ও প্রেমেও পড়েছিল। ওর যে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মনিব ছিলেন, তাঁরই মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটা অবশ্য ওর চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিল, আর জনি বোধহয় মোট বার ছয়েক প্রেমিকাকে দূর থেকে দেখেছিল। তাতে অবশ্য জনির প্রেমে পড়তে কোন অসুবিধে হয়নি। চলন্ত কাপড়ের স্রোত দেখতে দেখতে সে একটা রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়ে তুলতো। ও কল্পনা করত, যেন সে একটা অদ্ভুত, অসাধারণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। নতুন কারখানার মালিক হয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত ওর প্রেমিকাকে জয় করে বুকে টেনে নিচ্ছে। আস্তে আস্তে অবশ্য এইসব কল্পনা। রঙিন স্বপ্ন—সবই ওর মন থেকে মুছে গেছিল। ওর প্রেমিকার অন্যখানে বিয়ে হয়ে গেছিল। তাছাড়া, দিনের পর দিন একই ধরনের কাজ ওকে করে যেতে হচ্ছিল—সে কাজে মন বা শরীর—কোনো কিছুই খাটানোর দরকার ছিল না। খালি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো নিজের কাজটুকু করে গেলেই হল। ফলে ধীরে ধীরে ওর মনও হয়ে উঠল ভোঁতা আর চিন্তাশূন্য একটা যন্ত্রের মতো ওর সমস্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি যেন ঝিমিয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল। তবে মনের অবস্থা যাই হোক্, কাজটা করে ও সপ্তাহে দু'ডলার রোজগার করে বাড়ির লোকেদের উপোসের হাত থেকে বাঁচাত। ন'বছর বয়সের সময় দারুণ হাম হয়ে ওর এই কাপড়ের কলের চাক্‌রিটা চলে যায়। সুস্থ হয়ে ওঠার পর ও একটা কাঁচের কলে চাক্‌রি পেয়েছিল। এখানকার সুপারিন্‌টেনডেণ্ট সাহেবও ওর কাজে দারুণ খুশি ছিলেন। দশ ঘণ্টায় জনি তিনশো ডজন বোতলে কাঁচের 'স্টপার' বাঁধতে পারত। কিন্তু অনবরত কুঁজো হয়ে বসে কাজ করতে করতে ওর শরীর খারাপ হয়ে গেল, আর শেষ পর্যন্ত ওকে 'নিউমোনিয়া' রোগে ধরল। ফলে কাঁচের কারখানার কাজটাও ওর চলে গেল। এবার সে আবার ফিরে সেই চটকলে যেমন জীবনে প্রথম ও কাজে ঢুকেছিল। এই সময়টাতেও ওর জীবনে মাঝে মাঝে মনে রাখার মতো ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। একবার ওর মা বাড়িতে চমৎকার করে, অনেক মশলাপাতি দিয়ে মুরগির মাংসের পোলাও আর পায়েস রেঁধেছিলেন। এছাড়া দুবার কাস্টার্ডও তৈরি করে খাইয়েছিলেন। এই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে ও খুব আনন্দ পেত। সেই সময় মা একবার এ কথাও বলেছিলেন। আরো একটা চমৎকার খাবার একদিন উনি তৈরি করবেন—পনির আর ডিম দিয়ে তৈরি পুডিং। জনি বেশ কয়েক বছর ধরে সেই

শুভ দিনটির আশায় ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে এই আশাটাকে একটা অবাস্তব কল্পনা বলেই ধরে নিয়েছিল। আর একবার রাস্তার ধারে একটা রুপোর টাকা কুড়িয়ে পেয়েছিল জনি। সেটাও ওর জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা। টাকাটা পাওয়ামাত্র বাড়িতে ক্ষুধার্ত ভাইবোনদের কথা ওর মনে পড়ে গেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও লোভ সামলাতে পারেনি। টাকাটার অর্ধেক খরচ করে প্রাণভরে পছন্দমতো মিষ্টি খেয়েছিল। মনে মনে অবশ্য ও বার বার ভেবেছিল যে কাজটা খুবই অন্যায় হচ্ছে। ও ঠিক করেছিল যে বাকি পয়সাটা দিয়ে আর একদিন ঐভাবে মিষ্টি খাবে। কিন্তু পকেটে পয়সাকড়ি নিয়ে চলাফেরা করবার অভ্যাস না থাকাতে শিগ্‌গিরই ও পয়সা-গুলো হারিয়ে ফেলেছিল। সে দুঃখ জনি কখনো ভুলতে পারেনি। তবে এটাও জনির মনে হয়েছিল যে ভগবান নিশ্চয়ই তাকে অন্যায় লোভের জন্য শাস্তি দিয়েছেন।

আরো একটা স্মৃতি আবছাভাবে জনির মনে মাঝে মাঝে ভেসে উঠত—সেটা হল ওর বাবার। এই স্মৃতিটা অবশ্য ওর কাছে ছিল একটা বিভীষিকার মতো। বাবাকে দেখতে কিরকম ছিল তা অবশ্য জনির মনে নেই ; বাবার দুখানা বন্য, বর্বর পায়ের কথাই তার স্মৃতিতে গেঁথে আছে। বিছানায় শুয়ে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বার সময় ওর হঠাৎ মনে হত সে যেন মা আর বাবার বিছানার নিচের দিকে শুয়ে আছে, আর বাবার পায়ে প্রচণ্ড লাথি খেয়ে বিছানা থেকে ছিট্‌কে পড়ে যাচ্ছে। চম্‌কে ঘুম থেকে জেগে গিয়ে বিছানায় উঠে বসত জনি।

বহুদিন আগেকার এই সব স্মৃতি জনির মনে মাঝে মাঝে খেলা করে যেত। ওর পরবর্তী বা বর্তমান জীবনে অবশ্য কোনোরকম কম মনে রাখার মতো ঘটনাই নেই। কিছুই এখন আর ওর জীবনে ঘটেনা। ওর মনে হয় গতকাল, গত বছর, গত হাজার বছর আর সদ্য শেষ হওয়া এই মুহূর্ত—এগুলো সবই যেন একরকম, এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মেশিন ছাড়া কিছুই এখন আর ওর জীবনে নড়ে না, সময় যেন ওর জীবনে স্তব্ধ হয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

চোদ্দ বছর বয়সের সময় জনির জীবনে আবার একটা দারুণ ঘটনা ঘটল—ওকে 'স্টার্টার মেশিনে কাজ করতে দেওয়া হল। এই অতি স্মরণীয় ঘটনাটা ঘটবার পরে জনির মুখে 'যেদিন আমি স্টার্টারে কাজ করতে গেলাম'—কিংবা স্টার্টারে কাজ করতে আরম্ভ করার পরে'—এই ধরনের উক্তি প্রায়ই শোনা যেত। যেদিন ও ষোল বছরে পা দিল, সেদিন থেকে জনি তাঁত ঘরে তাঁত চালানোর ভার পেল। এখানেও নিখুঁত যন্ত্রের মতো কাজ করার জন্য তিনমাসের মধ্যেই জনি একসঙ্গে দুটো, কয়েকদিন বাদেই তিনটে, আরো কয়েকদিন বাদে

চারটে তাঁত চালানোর ভার পেল। দু বছরের মধ্যেই জনি অন্যান্য তাঁতীদের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ মাল তৈরি করতে লাগল; ওর আয়-ও বেড়ে গেল অনেক। ওর উপার্জন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা-ও সচ্ছল হয়ে উঠতে লাগল—আগেকার সেই 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থাটা আর রইল না। খাওয়া পরার ব্যাপারে আর ওদের কোনো চিন্তা রইল না। অবশ্য আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারেয় খরচ-ও হুহু করে বেড়ে যাচ্ছিল। ভাইবোন গুলো বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাওয়া পরার খরচ-ও অনেক বেশি লাগছিল। তাছাড়া তারা সবাই এখন স্কুলে পড়াশোনা করতে যাচ্ছিল—তার খরচতো ছিলই। বাড়িভাড়া আর জিনিসপত্রের দামও সমানে বেড়েই চলেছিল। জনি এখন মাথায় অনেক খানি লম্বা হয়ে গেছিল; কিন্তু গায়ে মাংস না লাগায় ওকে আরো রোগা আর ফ্যাকাসে দেখাত। ওর মেজাজও এখন হয়ে উঠেছিল আরো বেশি তিরিক্ষে আর খিট্‌খিটে। ভাই-বোনেরা এখন আর ওর কাছেই ঘেঁসত না। ওর উপার্জনের জন্য মা অবশ্য ওকে এখন বেশ খাতির যত্ন করতেন বটে, কিন্তু তার মধ্যেও যেন খানিকটা ভয় মিশে থাকত। জনির দৈনন্দিন জীবনেও কোনোরকম আনন্দ ফুর্তির অবকাশ ছিল না। দিনের আলোর সঙ্গে ওর তো মুখ দেখাদেখি ছিল না বললেই চলে। অন্ধকার ভোর থেকে সারাটা দিন ও কাজের মধ্যে ডুবে থাকত, আর রাতে বাড়ি ফিরে কোনোরকম দুটি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমের মধ্যেও জনি প্রায়ই অস্থির ভাবে ছট্‌ফট্‌ করত, নড়াচড়া করতে যেন কোনো মেশিন নিয়ে ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! যন্ত্র জগতের বাইরেও নিজস্ব কোনো মানসিক চেতনা ছিল না, ফাঁকা মনে কোনোরকম অনুভূতিও জাগত না।

কিন্তু হঠাৎ যেন একটা বিরাট ভূমিকম্পে ওর সমস্ত পারিপার্শ্বিক জগতটাই একদিনের মধ্যে ওলট-পালট হয়ে গেল। সেদিন রাতে কাজ থেকে ফিরে ওর নিজেকে খুব বেশি ক্লান্ত লাগছিল। একসঙ্গে সবাই যখন রাতের খাওয়া সারতে বসল, তখন আর সবাইকে কেমন যেন একটু বেশিমাত্রায় উৎসুক দেখাচ্ছিল। জনি অবশ্য এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি। একমনে যন্ত্রের মতো খেয়ে যাচ্ছিল। ওর ভাই-বোনেরা অবশ্য খুব আনন্দ আর আগ্রহের সঙ্গে খাচ্ছিল, নানা রকম আওয়াজও করেছিল। কিন্তু 'কি রে কিছু বলছিস না যে? কি খাচ্ছিস বল্‌তো?' জনি শূন্য দৃষ্টিতে খাবারের প্লেটের দিকে একবার তাকিয়ে মায়ের দিকে চোখ ফেরাল—কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। এবার মা খুব উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—'আরে পনির আর ডিম দিয়ে তৈরি পুডিং। অন্যান্য ছেলেমেয়ে গুলোও একসঙ্গে কলকল করে বলে উঠল…'হ্যাঁ, পুডিং, পুডিং। কি মজা!' জনি খালি উত্তর দিল—

'ও তাই নাকি ?' তারপর দুতিন চামচ খেয়েই ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আমার একদম ক্ষিধে নেই আজ। শুতে চললাম।' ক্লান্ত দেহে নিজের ঘরে ঢুকে কোনোরকমে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল জনি। তারপর নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ যেন ওর মাথার মধ্যে কি একটা ফেটে গেছে—ওর মনের মধ্যে কি যেন একটা ফুলে উঠ্‌ছে, ফেঁপে উঠ্‌ছে! সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। তারপর ওর মনে হতে লাগল, ওর মগজের মধ্যে যেন একসঙ্গে হাজার হাজার তাঁত প্রচণ্ড শব্দ করে ঘুরে চলেছে—সারা মহাশূন্য জুড়ি যেন তাঁতের মাকুগুলো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাঁতগুলো যতই বেশি জোরে ঘুরছে, ওর মস্তিষ্কের কোষগুলো যেন ততই খুলে গিয়ে হাজার হাজার সুতোর মতো সেই তাঁতগুলোর চলন্ত, ছুটন্ত মাকুর সঙ্গে জুড়ে জুড়ে যাচ্ছে।

পরের দিন সকালে জনি কাজে যাবার চেষ্টাই করতে পারল না। ওর মাথার মধ্যে সমানে হাজারটা তাঁত ঘুরেই চলেছে। ডাক্তার বাবু এসে ওকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন যে, ওর খুব সাংঘাতিক ধরনের 'ব্রেন ফিভার' বা 'মস্তিষ্কের জ্বর' হয়েছে। পুরো এক সপ্তাহের আগে জনি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তেই পারল না। তারপর ডাক্তারবাবু বলে গেলেন যে আরো সাতদিন পরে জনি আবার কাজে যেতে পারবে। বরিবারে ওর তাঁতঘরের ফোরম্যান সাহেব এলেন জনিকে দেখতে। মায়ের কাছে তো তিনি জনির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন—বললেন, তাঁর তাঁতঘরে এরকম কাজের লোক আর দুটি নেই। উনি আরো আশ্বাস দিলেন যে জনির কোনো চিন্তা নেই, তার চাকরি ঠিকই আছে। জনি যেন আরো এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়ে পরের সোমবার থেকে কাজে যোগ দেয়। মা তো ফোরম্যান সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। জনি কিন্তু ফোরম্যান সাহেব চলে যাওয়ার পরেও মেঝের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বাইরে বেরিয়ে সিঁড়ির চাতালটার ওপর বসে আপনমনে বিড়বিড় করে কিসের যেন হিসাব করতে লাগল। পরের দিন কাগজ পেন্সিল হাতে করে আবার সেই চাতালটার গিয়ে বসল জনি। তারপর সারাদিন ধরে একমনে কি সব অঙ্ক করে গেল ঃ দুপুরে বিল স্কুল থেকে ফিরলে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল—'হ্যাঁরে বিল, নিযুতের পরে কোটি, তাই না ? সেটা কি ভাবে হিসাব করতে হয় ?'

সেদিন বিকেলে ওর হিসেব কষা শেষ হয়ে গেল। পরের দিন থেকে জনি প্রায় সারাটা দিন খালি হাতে চুপ্‌চাপ চাতালটার ওপর বসে রাস্তার ওপারে একটা নিঃসঙ্গ গাছের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকত। বিশেষ করে

গাছটার শাখাপ্রশাখগুলো যখন বাতাসে নড়ত, পাতাগুলোর মধ্যে কাঁপন জাগত। তখন ওর আগ্রহটা যেন আরো বেড়ে যেত। সারাটা সপ্তাহ একমনে বসে থেকে নিজের সঙ্গেই কি যেন একটা বোঝাপড়ায় ব্যস্ত রইল জনি। রবিবার অর্থাৎ ছুটির শেষ দিন চাতালে বসে বসে নিজের মনেই ও বেশ কয়েকবার ও জোরে জোরে হেসে উঠল। ওর মা তো দারুণ চমকে গেলেন কারণ গত কয়েক বছরের মধ্যে জনিকে উনি কখনো হাসতে দেখেননি।

পরের দিন অর্থাৎ সোমবার মা যথারীতি অন্ধকার থাকতেই ওর ঘরে এলেন ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার জন্য—সেদিন থেকে জনির আবার কাজে যাওয়ার কথা। সারা সপ্তাহ ধরে জনি অনেক ঘুমিয়েছে। তাই সে খুব সহজেই জেগে উঠল। মা যখন ওর গা থেকে চাদরটা সরিয়ে দিতে গেলেন, তখনও জনি কোনোরকম বাধাই দিল না। চুপচাপ শুয়ে থেকে শান্ত স্বরে বলে উঠল—'মা, এসব করে আর কোন লাভ নেই।'

ওর মা প্রথমটায় ভেবেছিলেন যে জনির ঘুমের ঘোর বোধহয় তখনো কাটেনি। তাই তিনি আবার তাড়া লাগালেন—এই, জনি এবার উঠে পড়। তা নইলে কাজে যেতে দেরি হয়ে যাবে যে।'

জনি উত্তর দিল—'আমি জেগেই আছি, মা। বলছি তো তোমাকে, আর এসব করে কোনো লাভ নেই। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এখন বিছানা ছেড়ে উঠব না।' মা দিশাহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কিন্তু জনি, তোর চাকরি চলে যাবে যে।' জনি আগের মতোই শান্তভাবে উত্তর দিল—'কি হবে না হবে জানিনা, তবে আমি মোটেই বিছানা ছেড়ে উঠছি না এখন।' জনির ব্যাপার স্যাপার দেখে ভয়ে আতংকে মায়ের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল—উনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না ব্যাপারটা কি! জনি কি আবার কোনো কঠিন রোগ বাধিয়ে বসল? জ্বর হওয়া, ভুল বকা—এসব বোঝা যায়। কিন্তু এখন জনি যা করছে তাতো নিছক পাগ্‌লামি। তাড়াতাড়ি আবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলেন মা। ডাক্তার এসে জনিকে ঘুম থেকে তুলে ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন—'কই ওর তো কিছুই হয়নি। খালি বড্ড বেশি রোগা, গায়ে একদমই মাংস নেই।' জনি এবার বলল—'এবার খুশি হয়েছ তো মা? এবার যাও আমাকে ঘুমটা শেষ করতে দাও।' তারপরেই ও পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এবার যখন জনি ঘুম থেকে উঠল, তখন প্রায় দশটা বাজে। জেগে উঠেই সে জামাকাপড় পরে রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, মা শঙ্কিত মুখে বসে আছেন। মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে জনি বল্‌ল—'মা, আমি চলে যাচ্ছি। তাই তোমাকে বিদায় জানাতে এলাম।'

হতবাক্ মা মাথায় 'অ্যাপ্রন'টা ঢাকা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'আগেই এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তা, যাবিটা কোথায় ?'

জনি উত্তর দিল—'জানিনা। যেদিকে দু'চোখ যায়।' কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখের সামনে রাস্তার ওপারের সেই পাতা ঢাকা সবুজ, প্রাণবন্ত গাছটার ছবি ভেসে উঠল হঠাৎ।

মা এবার কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন—'আর তোর চাকরি ? চাকরিটার কি হবে ?'

'আমি আর কখনো চাকরি করতে যাব না'···জনি শান্তভাবে জানাল।

জনির কথা শুনে মা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'চুপ কর, জনি, চুপ কর। ভগবানের দোহাই, ও সব কথা বলিস না।' জনির মুখ দিয়ে যে এ ধরনের কথা বেরোতে পারে, তা ওর মা কখনো ধারণাই করতে পারেননি। তাঁর কাছে এ কথাটা 'ভগবান মানি না' বলার মতোই পাপ। 'তা, হঠাৎ হল কি তোর ?'—মা এবার একটু কড়া-সুরেই কথাটা বললেন—ভাবলেন, যদি জনি তাতে একটু ভয় পায়। জনির ওপর কিন্তু তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না। একইরকম ঠাণ্ডা মেজাজে, একটু অল্প হেসে সে উত্তর দিল—'অঙ্ক মা, স্রেফ অঙ্ক। সারাটা সপ্তাহ ধরে আমি অনেক হিসাব নিকাশ করেছি ?' ওর শান্ত, ঠাণ্ডা মেজাজ আর কথাবার্তা শুনে মা খুবই অবাক হয়ে গেলেন। জনি বলে চলল—'তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলছি, মা। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি ভয়ানক ক্লান্ত। ক্লান্তির শেষ সীমায় আমি পৌঁছে গেছি। কেন জান ? কাজ করতে করতে। জন্মানোর পর থেকেই এখন পর্যন্ত আমি কিছু না কিছু করেই চলেছি, করেই চলেছি। কাঁচের কারখানাটার কথা মনে আছে তোমার ? সারাদিনে আমি তিনশো ডজন বোতলে 'স্টপার' বাঁধতাম। এক একটা বোতলের জন্য অন্ততঃ বার দশেক নড়াচড়া করতে হত। তার মানে একদিনে ছত্রিশ হাজার বার, দশদিনে তিনশো ষাট হাজার বার, মাসে দশ লক্ষ আশি হাজার বার। আশি হাজারটা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাহলেও মাসে দশ লক্ষ বার, আর বছরে এক কোটি কুড়ি লক্ষ বার আমাকে নড়াচড়া করতে হয়েছে। চটকলের তাঁতঘরে আমাকে শরীর চালাতে হয়েছে এর দ্বিগুণেরও বেশি, তার মানে বছরে দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বার। এক এক সময় আমার মনে হয় আমি যেন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অবিরাম ঘুরেই চলেছি, নড়েই চলেছি।

'তা, এই সপ্তাহে আমি একদম শরীরটাকে চালাইনি, নড়িনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খালি চুপ করে বসে থেকেছি তাতে আমি যা আনন্দ পেয়েছি, তা জীবনে আর

কখনো পাইনি। এতদিন আমি জানতাম না সুখ কাকে বলে। কারণ সেটা জানবার মতো, বুঝবার মতো কোনো সময়ই আমার ছিল না। সারাক্ষণই আমাকে খেটে যেতে, চলাফেরা করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে যে কোনো রকম সুখ নেই, সেটা আমি এবার বুঝতে পেরেছি। আর আমি কখনো ঐভাবে যন্ত্রের মতো খাটব না। এখন থেকে আমি বসে থাকব, বিশ্রাম করব, আরো—আরো বিশ্রাম করব।'

ওর মা হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করল—'কিন্তু বিল? অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলো? তাদের কি হবে?'

'হ্যাঁ, তোমার চিন্তাটা বুঝতে পারছি। বিল আর অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলোর কি হবে, তাই না? আমি ভাল করেই জানি যে বিল-এর ওপর তোমার টানটা বরাবরই বেশি, ওর জন্য তুমি অন্যরকম ভবিষ্যৎ ভেবে রেখেছ। তুমি চাও যে বিল স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে অফিসবাবু হোক, তাই না? কিন্তু আমি আর খাটতে পারব না। বিলকে এবার কাজ করতে যেতে হবে।'—জনির কথার মধ্যে কোনোরকম রাগের চিহ্ন ছিল না।

ওর মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'তোকে কত কষ্ট করে এতটা বড় করে তুললাম। আর আজ তুই কিনা এই কথা বলছিস?' জনি খুব নরমভাবে, একটু দুঃখের সঙ্গেই উত্তর দিল—'না মা, তুমি আমাকে মোটেই বড় করে তোলনি। আমি নিজে নিজেই বড় হয়ে উঠেছি। শুধু নিজেকেই না, বিলকেও আমিই বড় করে তুলেছি। বিল যখন জন্মায় তখন আমার বয়স ছিল দু'বছর—তখন থেকেই আমি বিলকে দেখাশোনা করেছি। নিজে ছোটবেলায় ভাল করে খেতে পাইনি, কিন্তু খেটে, কাজ করে ছোট্ট বিল-এর মুখে খাবার জুগিয়েছি। আজ বিল আমার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান, লম্বা। কিন্তু আমি আর কিছু করতে পারব না। বিল আমার মতো কাজ করতে যাক্ কি গোল্লায় যাক্—সেটা আমার দেখবার দরকার নেই। আমি ক্লান্ত, আর খাট্‌ব না। যাক্ এবার আমি যাচ্ছি। তুমি আমাকে বিদায় দেবে না, মা?'

মা কোনো উত্তর দিলেন না, অ্যাপ্রনটা আবার মাথায় তুলে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। জনি যখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন উনি বলে উঠলেন—'আমি যা করেছি, সাধ্যমতো সবার ভালর জন্যেই করেছি।'

জনি রাস্তায় নেমে এল। সেই নিঃসঙ্গ গাছটাকে সামনেই দেখে ওর মনটা খুব খুশি হয়ে উঠল। নিজের মনেই ও বলে চলল—'আঃ, কি আরাম! আর কিছুতেই কাজ করতে যাব না, দিনরাত্তির খাটব না।' ঝলমলে দিনের আলোয় আস্তে আস্তে

হেঁটে চলল জনি। চট্‌কলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁতঘরের অতি পরিচিত আওয়াজ কানে এল তার। আওয়াজটা শুনে ওর সারা মুখে একটা মৃদু প্রশান্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কোনো কিছুরই ওপর এখন আর তার কোনো রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, এমনকি ঐ সব রাক্ষুসে যন্ত্রগুলোর ওপরেও নয়। ওর সারা মনপ্রাণ অফুরন্ত বিশ্রাম নেওয়ার আরামদায়ক চিন্তাতেই ভরে রইল।

বহুক্ষণ ধরে হাঁটতে হাঁটতে শহরের বাইরে চলে এল জনি। রেললাইনের পাশ ধরে একটা ছায়াঢাকা, গাছগাছালি ভরা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল সে। একটা ছোট্ট স্টেশন ছাড়িয়ে গিয়ে একটা গাছের তলায় সারাটা দুপুর আর বিকেল শুয়ে রইল। কোনোরকম ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথাই ওর মনে এল না। কখনো ঘুমিয়ে, কখনো জেগে ও আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, কান পেতে পাখির গান শুনল। মাঝে মাঝে নিজের মনে সে জোরে জোরে হেসে উঠতে লাগল—নিছক আনন্দের শান্তির সে হাসি।

সন্ধ্যে হয়ে এল। একটা মালগাড়ি এসে স্টেশনের বাইরে দাঁড়াল। জনি এবার আস্তে আস্তে গিয়ে একটা খালি ওয়াগনের দরজাটা খুলে ফেলে কোনোরকমে সেটাতে চড়ে বসল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। খানিকক্ষণ পরে সিটি বাজিয়ে মালগাড়িটা আবার চলতে শুরু করল। চলন্ত মালগাড়ির খালি ওয়াগনের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে জনি নিজের মনেই নিঃশব্দে হেসে উঠল, হাসতে লাগল।

TO BUILD A FIRE

একটু আগুনের জন্য

জমে-যাওয়া 'য়ুকন' নদীর বুক থেকে লোকটা খাড়া মাটির পাড় বেয়ে ওপরে উঠে এল।

পূবদিকে সরু একটা রাস্তা দূরে পাইন গাছ আর ঘন ঝোপঝাড়ে ঢাকা বনভূমির দিকে চলে গিয়েছে। সকাল ন'টা বাজলেও আকাশে সূর্যের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। ধূসর কন্‌কনে ঠাণ্ডা একটা দিন। আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু চারদিকের পরিবেশ কিরকম যেন থম্‌থমে, বিষণ্ণ। লোকটা অবশ্য এসব লক্ষ্যই করল না। সূর্যের মুখ দেখতে না পাওয়া এতদিনে ওর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। পাড়ে দাঁড়িয়ে একবার ও চারিদিকে তাকাল। যেদিকে চোখ যায়, যতদূর চোখ যায়—অন্তহীন ধব্‌ধবে সাদা তুষার প্রান্তর। তার মধ্যে দিয়ে খালি একটা কালো চুলের মতো রেখা এঁকে-বেঁকে দক্ষিণ থেকে এসে উত্তরের পাইন গাছের বনভূমির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এই রেখাটাই হল এই তুষার প্রান্তরের বুক চিরে চলার প্রধান পথ। পাঁচশো মাইল দক্ষিণে 'ডাইয়া'র চিলকূট গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা এখান দিয়ে সুদূর উত্তরে দেড় হাজার মাইল দূরে বেরিং সাগরের তীরে 'সেণ্ট মাইকেল'-এ গিয়ে পৌঁছেছে। এই রহস্যময় নির্জন সুদীর্ঘ রাস্তা, কন্‌কনে ঠাণ্ডা—এসব কিছুই লোকটার মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারছিল না। ও যে এই ধরনের পরিবেশে বহু দিন ধরে অভ্যস্ত, তা কিন্তু নয়—বরং ওকে একেবারেই নবাগত বলা যেতে পারে। এই উত্তর দেশের শীতকালে এই ওর প্রথম পথ চলা। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে খুব চট্‌পটে আর সতর্ক স্বভাবের হলেও কোনো ব্যাপার তলিয়ে দেখার বা তার আসল তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামানোর অভ্যেস ওর একেবারেই ছিল না। শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠাণ্ডা মানে খুব অস্বস্তিকর ঠাণ্ডা,—এটাই সে জানে, আর তার জন্য ঠিকমতো গরম পোশাক, টুপি, জুতো পরতে হবে—এটাও সে মেনে চলে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিরাটত্ব, এই প্রচণ্ডতার কাছে একটা মানুষ হিসেবে সে কতটা দুর্বল, অসহায়—এসব চিন্তা-ভাবনা কখনো তার মনে খেলা করে না।

বড় রাস্তার দিকে চলতে আরম্ভ করার আগে লোকটা একবার থুথু ফেলল।

থুথুটা মাটিতে পড়বার আগেই জমে চড়্‌চড়্‌ করে ফেটে গেল। এটা দেখে লোকটা একটু চমকে গেল। শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি ঠাণ্ডায় থুথু জমে মাটিতে পড়ার পর ফাটে—এটা সে জানে। কিন্তু এখন তার থুথুটা মাটিতে পড়বার আগেই ফেটে গিয়েছে। তার মানে এখন ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রিরও বেশি, কতটা বেশি, তা অবশ্য সে জানে না, জানার দরকারও নেই। হেন্‌ডারসন খাঁড়ি থেকে বাঁদিকে যে শাখাটা বেরিয়েছে, সেখানকার পুরনো খনিটাতেই যাচ্ছে ও। সেখানে ওর সঙ্গীসাথীরা সবাই অপেক্ষা করে আছে ওর জন্য। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ সেই আড্ডায় পৌঁছে যাবে ও—সেখানে ওর জন্য তৈরি থাকবে আরামদায়ক আগুনের কুণ্ড আর গরম গরম খাবার। দুপুরের খাবারটা ওর শার্টের নিচে একেবারে গায়ের চামড়ার সঙ্গে লাগিয়ে রাখা আছে। তা নইলে খাবারগুলো জমে গিয়ে কঠিন বরফের মতো হয়ে যাবে। চলতে চলতে ও পাইন গাছের বনভূমিটার মধ্যে ঢুকে গেল। এক ফুট পুরু হয়ে বরফ পড়ে রাস্তাটাকে প্রায় ঢেকেই দিয়েছে। পথ চলতে চলতে লোকটা মাঝে মাঝেই ওর নাকের অসাড় ডগাটুকু আর গাল দুটো ঘষছিল। একবার ও ভাবল—'নাঃ, ঠাণ্ডাটা সত্যিই খুব বেশি পড়েছে দেখছি।' ওর গালে অবশ্য ঘন চাপদাড়ি ছিল, কিন্তু তাতে ওর উঁচু চোয়াল, খাড়া নাক—এগুলোর কোনোটাই ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছিল না।

লোকটার ঠিক পেছন পেছন নিঃশব্দে হাঁটছিল ওর পোষা কুকুরটা। বিরাট প্রকাণ্ড ধূসর রংয়ের একটা জানোয়ার—বুনো নেকড়ের সঙ্গে জন্তুটার কোনো তফাৎ-ই বোঝা যায় না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কুকুরটা খুব মুষড়ে পড়েছিল। ও তো আর থার্মোমিটার দেখতে জানত না। তাই তখন যে আসলে শূন্যের নিচে পঞ্চাশ নয়, পঁচাত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রা নেমে গেছে, তা জানবার কোনো উপায় ওর ছিল না। কিন্তু ওর আদিম অনুভূতি দিয়ে ও ঠিকই বুঝতে পারছিল যে, এরকম ঠাণ্ডায় পথ চলা একেবারেই উচিত নয়। ও আশা করছিল, এবার নিশ্চয় ওর প্রভু থেমে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিয়ে আগুন জ্বালাবে। আগুনের সঙ্গে ওর পরিচয় বহু দিনের, ওর পূর্ব পুরুষরা বহুদিন আগেই বন থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের জ্বালানো আগুনের কুণ্ডের পাশে বসে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে শিখেছে। আর যদি আগুনের তাপ না-ই পাওয়া যায় তাহলেও শক্ত বরফের মধ্যে গর্ত করে তার মধ্যে ঢুকে শুয়ে নিজেকে গরম করে তুলতে পারবে। কুকুরটার চোখ মুখ আর সমস্ত শরীরের লোম, জমে-যাওয়া নিঃশ্বাস আর আকাশ থেকে ঝরে পড়া মিহি বরফের গুঁড়োতে ঢেকে গেছিল। ওর প্রভুর লালরং-এর গোঁফদাড়িও জমে একেবারে শক্ত

হয়ে গেছিল, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল চিবানো তামাকের জমে যাওয়া রস। এখন যদি লোকটা মাটিতে পড়ে যায় ; তবে ওর থুতনির দাড়িতে জমে থাকা বরফগুলো ঠিক কাচ ভাঙার মতোই আওয়াজ করে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। বেশ কয়েক মাইল হাঁটবার পর লোকটা ছোট্ট নদীর জমে-যাওয়া বুকে এসে নামল। এখান থেকেই শুরু হয়েছে হেনডারসন খাঁড়ি। তার মানে খাঁড়িটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখান থেকে এখন ও ঠিক দশ মাইল দূরে আছে। ঘড়িতে ঠিক সকাল দশটা —অর্থাৎ ঘণ্টায় চার মাইল করে ও চলেছে। তাহলে সাড়ে বারোটার মধ্যেই ও সেখানটায় পৌঁছে যাবে। ও ঠিক করল সেখানে পৌঁছেই দুপুরের খাবারটা সারবে। এতক্ষণে ওর নাকের ডগা আর গালদুটো একেবারে পুরোপুরি অসাড় হয়ে গেছিল। অনবরত ঘষাঘষি করেও সে জায়গাগুলিতে বিশেষ করে গালদুটোতে সাড় ফিরিয়ে আনা যাচ্ছিল না। ওর আবার মনে হল—এরকম ঠাণ্ডা সত্যিই ও আর কখনো দেখেনি। গালে যে তুষারক্ষত হবেই, সেটা এতক্ষণে লোকটা ভালভাবেই বুঝে গেছিল। ওর বন্ধু বাড্‌ নাক আর গলা বাঁচানোর জন্য 'কেমন একটা চমৎকার ঢাক্‌না তৈরি করেছে সেটা মনে পড়ায় ওর মনে একটু দুঃখ হল। আহা, সে-ও যদি ঐরকম একটা ঢাক্‌না বানাত, এখন বড় কাজে লাগত সেটা। যাক্‌গে, গালে তুষারক্ষত হওয়াটা এমন কিছু একটা মারাত্মক ব্যাপার নয়।

মনে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা না থাকলেও ও কিন্তু খুব সাবধানে চারদিকে নজর রেখেই এগোচ্ছিল, পা ফেলছিল। খাঁড়িটা যে তলা পর্যন্ত জমে আছে সেটা ও খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু তার সঙ্গে সে এটা-ও জানে যে আশপাশের পাহাড় থেকে সরু সরু ঝর্ণা বা জলের ধারা বেরিয়ে এসে খাঁড়ির জমাট বাঁধা বরফের ওপর পড়ে ছোট ছোট জলকুণ্ড তৈরি করে। যত ঠাণ্ডাই পড়ুক, এই জলের ধারাগুলো কখনো জমে যায় না। জলের ঐ কুণ্ডের ওপর নতুন করে নরম তুষার পড়ে জলের কুণ্ড-গুলোকে ঢেকে দেয়। তার ওপর আবার জলধারা এসে পড়ে, তার ওপর আবার নরম তুষার পড়ে। সব মিলিয়ে সমস্ত জায়গাটাতে একেবারে চোরাবালির মতো একটা মরণ ফাঁদ তৈরি হয়। ওপর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু অসাবধানে এর ওপর পা ফেললেই ওপরকার নরম তুষার স্তর ভেঙে গিয়ে লুকনো জলের কুণ্ডের মধ্যে পা বসে যায়। কখনো কখনো এই নরম বরফের স্তর ভাঙতে একেবারে কোমর পর্যন্ত জলের মধ্যে ঢুকে যায়। আর এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পা ভিজে গেলেই সাংঘাতিক বিপদ—সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে জুতো মোজা সব খুলে শুকিয়ে ফেলতে হবে, সারা শরীর আগুনের তাপে গরম করে নিতে হবে। বেশ কয়েকবার এই রকম লুকনো

জলের কুণ্ডের মধ্যে পা দিতে দিতে বেঁচে গেল ও। আর একবার বিপদের আঁচ পেয়ে কুকুরটাকে ঠেলে আগে পাঠিয়ে দিল। কুকুরটা যেতে যেতে হঠাৎ বরফ ভেঙে জলের মধ্যে পা দিয়েই কোনোরকমে পাশের শক্ত জায়গাটাতে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ওর চারটে পায়ে যে জলটুকু লেগেছিল তা জমে বরফ হয়ে গেল। কুকুরটা বসে পড়ে দাঁত দিয়ে থাবার ফাঁকে জমে-থাকা বরফের টুক্‌রোগুলোকে টেনে বার করে ফেলতে লাগল। কতটুকু বরফ পায়ে কতক্ষণ জমে থাকলে কতটা তুষারক্ষত হবে তার কোনোরকম হিসাব সে জানে না। কিন্তু ওর জান্তব অনুভূতি-ই ওকে শিখিয়েছে যে এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে বরফ বার করে ফেলতে হয়। ওর প্রভুও অবশ্য নিজে হাত লাগিয়ে তাড়াতাড়ি বরফের কুচিগুলো টেনে বার করে দিল। ঠিক সাড়ে বারোটার সময় ওরা খাঁড়ির সেই মুখটায় গিয়ে পেঁছিল। মনে মনে লোকটা বেশ খুশি হয়ে উঠ্‌ল—এভাবে এগোতে পারলে ঠিক ছটার মধ্যেই ও নিজেদের আড্ডায় পেঁছে যাবে। শার্টের ভেতর থেকে খাবারের প্যাকেটটা বার করে এনে হাতের দস্তানা খুলে ও খেতে আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওর খোলা আঙুলগুলো একদম অসাড় হয়ে গেল। প্রাণপণে হাতের তালু ঘষে, আঙুলের ওপর দস্তানা দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি মেরে সেগুলোতে সাড় ফিরিয়ে আনল সে। কিন্তু এবার ও দেখল, ওর ঠোঁট আর গোঁফদাড়িতে বরফ জমে এমনভাবে আট্‌কে গেছে কিছুতেই আর ও মুখ খুলতে পারছে না। ও বুঝতে পারল যে আগুন না জ্বালানোটা ওর খুব ভুল হয়ে গেছে। আগুনের আঁচে মুখের বরফ গলিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর মধ্যেই ও টের পেল, ওর পায়ের আঙুলগুলোও অসাড় হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি হাতে দস্তানা পরে উঠে দাঁড়াল সে। এবার ও একটু ভয় পেয়ে গেছে। এতক্ষণে ওর মনে হল, 'গন্ধকের খাঁড়ি'র সেই বুড়ো লোকটা এখানকার শীতের ব্যাপারে ঠিক কথাই বলেছিল। যাই হোক, জোরে জোরে মাটিতে পা ফেলে চলাফেরা করে হাত-পা ছুঁড়ে আবার শরীরে সাড় ফিরিয়ে আনল সে। তারপর বেশ বড় করে আগুন জ্বালিয়ে মুখের আর গোঁফদাড়ির জমাট বরফগুলো গলিয়ে ফেলে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া দাওয়া সারল। কুকুরটাও খুব আরাম করে একেবারে আগুনের ধার ঘেঁসে বসে রইল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ও পথে বেরিয়ে পড়ল। কুকুরটার কিন্তু এই আগুনের কুণ্ডের পাশ ছেড়ে ওঠ্‌বার কোনো-রকম ইচ্ছেই ছিল না। ওর সমস্ত বন্য অনুভূতি দিয়ে ও বুঝতে পারছিল যে, এত ঠাণ্ডায় কিছুতেই পথ চলা যাবে না, ওর প্রভু ভয়ানক ভুল করছে। যতক্ষণ না আকাশে মেঘ বা কুয়াশা জমে এই ঠাণ্ডা কমিয়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে এক

জায়গায় বসে অপেক্ষা করাই একমাত্র উপায়। কিন্তু প্রভুর কাছে খুব একটা ভালবাসা বা অন্তরঙ্গতা ও কখনো পায় নি। চাবুকের বাড়ি আর ধমকই ছিল ওর একমাত্র পাওনা। তাই প্রভুর ভালমন্দ নিয়েও ওর মনে তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। প্রভুর জন্য নয়, নিজের নিরাপত্তার জন্যই আগুনের ধার ছেড়ে সে নড়তে চাই-ছিল না। কিন্তু প্রভু যখন চাবুক ঘুরিয়ে ওকে এগিয়ে যেতে বলল, তখন বাধ্য হয়েই আবার ও মনিবের পিছু পিছু পথ চলতে শুরু করল।

বেশ কিছুক্ষণ ভালভাবেই এগিয়ে চলল ওরা। তারপরেই, এতক্ষণ ধরে লোকটা যা ভয় করছিল তাই ঘটে গেল—হঠাৎ পায়ের তলাকার নরম বরফ বসে গিয়ে ওর হাঁটু পর্যন্ত লুকনো জলের কুণ্ডের মধ্যে ডুবে গেল। কোনোরকমে শক্ত বরফের ওপর উঠে এল সে। দুঃখে হতাশায় ও কপাল চাপড়াতে লাগল। নিজেকেই গালাগালি দিতে লাগল। যখন ও ভাবছে ছ'টার মধ্যেই সঙ্গীদের কাছে গিয়ে পেঁছিবে ঠিক তখনই কিনা এই দুর্ঘটনা? এখন ওকে আর সব কিছু ভুলে গিয়ে এখুনি আগুন জ্বালিয়ে জুতো মোজা সব শুকিয়ে ফেলতে হবে। তাড়াতাড়ি উঁচু পাড়ের ওপর উঠে একটা ঘন ডালপালাওয়ালা বড় পাইন গাছের নিচে শুক্‌নো কাঠকুটো জড়ো করল সে। তারপর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে একটা আগুনের কুণ্ড তৈরি করতে লাগল। ও ভাল করেই বুঝতে পারছিল যে, ওর সামনে এখন ভয়ানক বিপদ। শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রির-ও বেশি ঠাণ্ডায় পা জলে ভিজে গেলে কোনোরকম দেরি করা চলবে না, প্রথম বারের চেষ্টাতেই ভালভাবে আগুন জ্বালিয়ে ফেলতে হবে। পা শুক্‌নো থাকলে এত ঠাণ্ডাতেও আধমাইল দৌড়লে পায়ে আবার রক্ত চলাচল শুরু হয়ে সাড় ফিরে আসবে। কিন্তু পা ভিজে গেলে শত দৌড়োদৌড়ি করেও কিছু হবে না বরং ভিজে পা আরো তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে জমে যাবে। 'গন্ধকের খাঁড়ি'র কাছের সেই খনির বুড়ো মালিকটা গত বছর শীতকালে ওকে সব কিছুই বুঝিয়ে বলেছিল। বুড়োর কথাগুলো যে কতখানি সত্যি, তা এখন ও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিল। এর মধ্যেই ওর পা দুটো পুরোপুরি অসাড় হয়ে পড়েছিল। আগুন জ্বালাবার জন্য ওকে হাতের চামড়ার দস্তানাগুলো খুলতে হয়েছিল। ফলে আঙুলগুলোতেও এখন আর ওর কোনো অনুভূতি ছিল না। যতক্ষণ ও হাঁটছিল, ততক্ষণ ওর সারা শরীরে রক্ত চলাচল হয়ে ওকে গরম করে রেখেছিল। কিন্তু হাঁটা বন্ধ করে থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রক্ত চলাচল কমে গিয়ে ওর সারা শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল।

লোকটা অবশ্য ঘাব্‌ড়ে যায় নি একেবারেই। ও ভাবতে লাগল, এই তো, আগুনটা বেশ জ্বলে উঠেছে। আর একটু আঁচ উঠ্‌লেই সে জুতো মোজা খুলে

শুকোতে দেবে, নিজের খালি পা আর সারা শরীরও বেশ ভাল করে আগুনে সেঁকে নেবে। আড্ডায় পেঁছিতে না হয় ঘণ্টাখানেক দেরি-ই হবে। আর হাতপায়ের আঙুল, গাল, নাক—এগুলোর ঘা সারতে হয়ত একটু সময় নেবে। বুড়োর উপদেশ-গুলো মনে পড়ায় এখন ওর বরং হাসিই পাচ্ছিল—লোকটা বলে কিনা এই 'ক্লণ্ডাইক' অঞ্চলে শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রির বেশি ঠাণ্ডা পড়লে নাকি কিছুতেই একলা পথ চলা উচিত নয়—সঙ্গে একজন সঙ্গী থাকা অবশ্যই দরকার। এইতো সে দিব্যি আছে। একটু বেকায়দায় হয়ত সে পড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু একলা-ই তো সে সব ঝামেলা সামলে নিয়েছে। এই সব বুড়োরা আসলে আয়েসী, একটু মেয়েলী স্বভাবের —ততটা শক্তপোক্ত নয়। মাথা ঠিক রাখলে, মন শক্ত রাখলে যে-কোনো সত্যিকারের পুরুষমানুষ একলাই পথ চলতে পারে। তবে ওর আঙুলগুলো যে এত তাড়াতাড়ি অবশ হয়ে যাবে সেটা কিন্তু সত্যিই ও আগে বুঝতে পারেনি। এমনকি, আগুন জ্বালাবার জন্যে যে সব শুকনো ডালপালাগুলো ও কুড়োচ্ছিল, সেগুলো আঙুল দিয়ে ঠিকমতো ধরতে পারছে কিনা, সেটাও ওকে চোখে দেখে ঠাহর করে বুঝতে হচ্ছিল। যাই হোক্, আগুনটা এতক্ষণে বেশ ভালভাবেই জ্বলে উঠেছিল। ও এবার চামড়ার জুতোজোড়া খুলতে গেল। কিন্তু জুতো মোজা সব কিছুই এতক্ষণে জমে লোহার মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ও জুতোর ফিতেগুলো কেটে ফেলবার জন্য কোমর থেকে লম্বা ছুরিটা টেনে বার করতে গেল। কিন্তু তার আগেই যা সর্বনাশ হওয়ার তা হয়ে গেল। যে পাইন গাছটার তলায় ও আগুন জেলেছিল সেই গাছটার ঘন ডালপালাগুলো বরফের ভারে একেবারে নুয়ে পড়ছিল—বহুদিন ধরে অনবরত বরফ পড়ছে, আর বাতাস না থাকাতে সেগুলো ডাল থেকে উড়েও যায় নি। যতবারই ও গাছটা থেকে ছোট ছোট ডালপালা টেনে নিচ্ছিল ততবারই গাছটাতে অল্প অল্প ঝাঁকুনি লাগছিল, বরফে ঢাকা ডালগুলো-ও নাড়া খাচ্ছিল। হঠাৎ গাছটার একেবারে ওপরকার একটা ডালে বেশি ঝাঁকুনি লাগাতে সেটার সমস্ত বরফ ঝরে গিয়ে তার নিচের ডালটাতে পড়ল। বেশি ভারী হয়ে যাওয়াতে সেই ডালটার সমস্ত বরফ আবার ঝরে গিয়ে পড়ল তার নিচের ডালে। এইভাবে প্রত্যেকটা ডালের বরফ ঝরতে ঝরতে, খসতে খসতে শেষ পর্যন্ত গাছের সবকটা বড় ডালে আট্‌কে থাকা বরফের রাশি হুড়মুড় করে খসে পড়ল ঠিক আগুনের কুণ্ডের মাঝখানে আর চোখের পলকে সমস্ত আগুনটা বরফের তলায় চাপা পড়ে একদম নিভে গেল।

লোকটা প্রথমে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারপর ওর মনে হল, ও যেন এখুনি নিজের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ

এক দৃষ্টে গাছ থেকে খসে পড়া বরফের স্তূপটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। এখন আবার ও ভাবতে লাগল, সেই বুড়োটা বোধহয় ঠিক কথাই বলেছিল—সঙ্গে কোনো সাথী থাকলেই আর এই দুর্ঘটনাটা ঘটত না, ওর সঙ্গীই আগুন জ্বালাতে পারত। যাই হোক্, সঙ্গে সঙ্গে আবার আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে লেগে গেল ও। এবার আগুন ওকে ঠিকমতো জ্বালাতেই হবে। অবশ্য এতক্ষণে ও বুঝে গেছিল যে, এবার ঠিকমতো আগুন জ্বালাতে পারলেও পায়ের কয়েকটা আঙুল ওকে হারাতেই হবে—কারণ ওর পায়ের পাতা এতক্ষণে একেবারে জমে গেছিল। আঁজলা ভরে শুক্‌নো ঘাস, কাঠকুটো জড়ো করতে লাগল সে। ওর অসাড় আঙুল দিয়ে এখন আর কিছু ধরা যাচ্ছিল না। এরপর ও পকেট থেকে 'বার্চ' গাছের জ্বালানি ছালটা বার করতে চেষ্টা করল। কিছুতেই কিন্তু ও ছালটাকে অসাড় আঙুলগুলো দিয়ে ধরতে পারছিল না। এদিকে প্রত্যেকটি সেকেণ্ডে ওর পায়ের পাতা আরো জমে যাচ্ছিল। প্রাণপণে মনকে শক্ত করে ও দাঁত দিয়ে হাতের দস্তানা আবার পরে নিল। তারপর যথাসম্ভব জোরে হাত দুটোকে সমানে ঝাঁকাতে দোলাতে লাগল, শরীরের দুই পাশে বারবার করে সজোরে চাপড় মারতে লাগল। কুকুরটাকে দেখে এখন ওর খুব হিংসা হচ্ছিল,—জানোয়ারটা ওর ঝাঁক্‌ড়া গরম লেজের তলায় পা দুটোকে ঢেকে বরফের ওপর বেশ আরাম করে বসে উৎসুকভাবে প্রভুর দিকে তাকিয়ে ছিল।

খানিকক্ষণ পরে লোকটা টের পেল যে, ওর আঙুলগুলোতে আবার একটু একটু করে সাড় ফিরে আসছে। তাড়াতাড়ি হাতের দস্তানা খুলে পকেট থেকে 'বার্চ'-এর ছাল আর গন্ধক মাখানো জ্বালানি কাঠিগুলো বার করে আনল ও। কিন্তু অসহ্য ঠাণ্ডায় ওর আঙুলগুলো একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই আবার অবশ হয়ে গেল,—আর জ্বালানি কাঠিগুলোকে আলাদা করতে গিয়ে সবকটা কাঠিই হাত থেকে ফস্‌কে বরফের মধ্যে পড়ল। মনোযোগ দিয়ে দেখে দেখে কাঠিগুলোকে ও মাটি থেকে তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অগত্যা ও আবার হাতে দস্তানা পরে নিয়ে হাঁটুর ওপর ডানহাতখানাকে খুব জোরে জোরে কয়েকবার ঘষে নিল। তারপর দু'হাতে আঁজলা করে কাঠিগুলোকে বরফ থেকে তুলে এনে কোলের ওপর ফেলল। অনেকখানি গুঁড়ো বরফও উঠে এল তার সঙ্গে। তারপর দুই কব্‌জি এক করে কাঠিগুলোকে তুলে এনে একটা কাঠিকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। ওর মুখের চারিপাশে বরফ জমে গিয়ে ঠোঁট দুটোকে জুড়ে দিয়েছিল,—তাই বেশ জোর করেই হাঁ করতে হল ওকে। কাঠিটা পায়ের ওপর অনেক বার ঘষে জ্বালাল ও। তারপর 'বার্চ'-এর ছালে সেটাকে চেপে ধরল। কিন্তু জ্বলন্ত গন্ধকের তীব্র, কটু ধোঁয়া নাকে ঢুকে যাওয়াতে

ও খুব জোরে কেশে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে কাঠিগুলো আবার বরফের মধ্যে পড়ে গেল।

এবার খানিকটা হতাশ ভাবেই কাঠিগুলোর দিকে ও তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। নাঃ, একলা এই ঠাণ্ডায় বেরিয়ে পড়া সত্যিই ওর উচিত হয়নি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বেপরোয়া ভাবে দাঁত দিয়ে এবার ও দুটো হাতের দস্তানাই খুলে ফেলল। প্রাণপণে চেষ্টা করেও এখন আর ওর হাতের আঙুলেও কোনো সাড় ফিরে আসছিল না। আবার দুই কব্‌জি একসঙ্গে জড়ো করে কাঠিগুলোকে তুলে এনে ও সবকটা কাঠিকেই পায়ের সঙ্গে ঘষে জ্বালিয়ে ফেলল তারপর জ্বলন্ত কাঠিগুলোকে 'বার্চ'-এর ছালের ওপর চেপে ধরল। যাতে নাকে আর গন্ধকের ধোঁয়া ঢুক্‌তে না পারে, তার জন্য মাথাটাকে একপাশে হেলিয়ে রাখল। হঠাৎ ও টের পেল যে ওর হাতে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। ও বুঝতে পারল যে জ্বলন্ত কাঠির আগুনে ওর হাত ঝল্‌সে যাচ্ছে। এক সময় অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে ও কব্‌জি আল্‌গা করে জ্বলন্ত কাঠিগুলোকে ফেলে দিল। এতক্ষণে অবশ্য 'বার্চ'-এর ছালটা বেশ ভাল-ভাবেই জ্বলে উঠেছিল। ও তাড়াতাড়ি এই আগুনের শিখার ওপর শুক্‌নো ঘাস, খুব ছোট ছোট ডাল বিছিয়ে দিতে লাগল। কব্‌জি জড়ো করে এগুলো তুলতে হচ্ছিল বলে স্যাঁতসেঁতে কাঠের টুক্‌রো আর ভিজে শ্যাওলাও শুক্‌নো ঘাস আর ডালপালার সঙ্গে উঠে আসছিল। ও দাঁত দিয়ে যতটা পারে সেগুলোকে আলাদা করে ফেলে দিচ্ছিল—বাঁচতে গেলে এখন ওকে ঠিকমতো আগুন জ্বালতেই হবে। কিন্তু হঠাৎ এক টুক্‌রো ভিজে সবুজ শ্যাওলা উঠে এসে আগুনের ছোট্ট শিখাটার ঠিক মাঝখানটায় এসে পড়ল। ও তাড়াতাড়ি আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে শ্যাওলার টুক্‌রোটাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু একেই তো ওর আঙুলগুলো এতক্ষণে পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছিল ; তার ওপর ঠাণ্ডায় সারা শরীরে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে ও এখন এত বেশি কাঁপছিল যে হাত নড়ে গিয়ে জ্বলন্ত কাঠকুটো আর ছোট ডালপালাগুলো চারধারে আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ধিক্‌ধিক করে জ্বলতে জ্বলতে আস্তে আস্তে নিভে গেল। তার সঙ্গেই নিভে গেল ওর আগুন জ্বালাবার শেষ আশাটুকুও।

চরম হতাশায়, অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অদূরে বসে থাকা কুকুরটার দিকে নজর গেল ওর। হঠাৎ ওর মাথায় একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল। ওর মনে পড়ে গেল, বহুদিন আগে তুষার ঝড়ের মধ্যে আটকে পড়া এক অভিযাত্রীর গল্প শুনেছিল ও। একটা মদ্দা হরিণকে মেরে তার মৃতদেহের মধ্যে ঢুকে নিজেকে

গরম রেখে প্রাণে বেঁচে গেছিল সেই অভিযাত্রী। ও এবার ঠিক করল, কুকুরটাকে মেরে সেটার গরম শরীরের মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে আবার সাড় ফিরিয়ে আনবে সে, তাহলে আর একবার সে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করতে পারবে। কুকুরটাকে কাছে আসার জন্য ও বারবার ডাকতে লাগল কিন্তু ওর গলা দিয়ে এমন একটা বিকৃত ভয়ার্ত আওয়াজ বেরোচ্ছিল যে কুকুরটার মনে কেমন একটা অজানা সন্দেহ জেগে উঠল। ওর জান্তব অনুভূতি দিয়ে ও যেন বুঝতে পারল, ঠিক এখনই প্রভুর একেবারে কাছে চলে যাওয়াটা বিশেষ নিরাপদ নয়। তাই ও দূরে বসেই ল্যাজ নাড়তে লাগল কিছুতেই কাছে এল না। অগত্যা লোকটাই হামাগুড়ি দিয়ে কুকুরটার কাছে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল। প্রভুর চলাফেরার এই অস্বাভাবিক অচেনা ভঙ্গি দেখে কুকুরটা আরো বেশি ধাঁধায় পড়ে গেল। আরো দূরে সরে গেল সে। লোকটা আর এভাবে এগোনোর চেষ্টা করল না। মনের সবটুকু জোর এক করে দাঁত দিয়ে আবার দস্তানা দুটো হাতে পরে নিল, তারপর উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওর পা যে মাটিতে ঠেকছে, সেটাই ও বুঝতে পারছিল না। কোনোরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব সহজ গলায় কুকুরটাকে আবার ডাকতে লাগল ও। এবার কুকুরটা ওর কাছে এগিয়ে এল। ও সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে প্রায় ঝাঁপ দিয়েই কুকুরটাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তারপরেই ও বুঝতে পারল যে কুকুরটাকে মেরে ফেলা ওর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। অসাড় হাত দিয়ে ও ছুরিও চালাতে পারবে না, জানোয়ারটাকে গলা টিপেও মারতে পারবে না। অগত্যা কুকুরটাকে একটু পরেই ছেড়ে দিল ও। কুকুরটা ছাড়া পেয়েই ল্যাজ গুটিয়ে গজরাতে গজরাতে অনেকটা দূরে পালিয়ে গেল। তারপর অবাক চোখে প্রভুর দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এতক্ষণ পরে লোকটা আবার নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল,—শরীরের দু'পাশে দুটো গাছের ডালের মতো তারা ঝুলে আছে। ও দুটো যেন তার শরীরের কোনো অংশ নয়, একেবারে আলাদা। বেশ কয়েক মিনিট ধরে ও প্রাণপণে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কনুই নাড়িয়ে সামনে পেছনে হাত চালিয়ে শরীরের দু'পাশে হাত দুটোকে বার করে আছড়ে অনেকরকম ভাবে চেষ্টা করে গেল। তাতে শরীরে রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়ে কাঁপুনিটা কমে গেল বটে, কিন্তু কনুই-এর নিচ থেকে হাতে আর কিছুতেই সাড় ফিরে এল না।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ড মৃত্যুভয় এসে ওর সারা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ও এবার বুঝতে পারল যে, এখন আর কয়েকটা আঙুল বা শরীরের কোনো অংশ হারাবার প্রশ্ন নয়, এবার সে একেবারে মরণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। দারুণ

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সামনের রাস্তা ধরে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল সে। কুকুরটাও পিছু নিল তার। খানিকটা দৌড়বার পর ওর শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ল। কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে আবার একটু আশা জেগে উঠ্‌ল কি জানি, হয়ত এইভাবে দৌড়তে থাকলে ওর দুপায়ের জমানো বরফ গলেও যেতে পারে। আর যদি ও ঠিকমতো দম রেখে দৌড়ে যেতে পারে, তাহলে চাই কি ওদের আড্ডাতেও সে পৌঁছে যেতে পারে শেষ পর্যন্ত। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে ওর সঙ্গী-সাথীরা ওকে বাঁচিয়ে তুলবে ঠিক। হয়ত কয়েকটা আঙুল আর মুখের কিছুটা অংশ বাদ যাবে, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যাবে সে। একটা কথা অবশ্য সে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না,—ও আদৌ দৌড়তে পারছে কি করে? ওর দুটো পা-ই এভাবে জমে গেছিল যে দৌড়বার সময় মাটির ওপর ওর যে পা পড়ছে, বা পায়ের ওপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ছে; সেসব কিছুই ও অনুভব করতে পারছিল না। ওর মনে হচ্ছিল, ও যেন কোনো দেবদূতের মতো মাটি না ছুঁয়ে বরফের ঠিক ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

মনে মনে লোকটা যতই আশা করে থাকুক না কেন, এখান থেকে দৌড়ে ওদের আড্ডায় পৌঁছতে গেলে যতটা সহ্যশক্তি বা দম থাকার দরকার তার কিছুই আর এখন লোকটার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। দৌড়তে দৌড়তে বার বার ও হোঁচট খেতে লাগল প্রথমটায়। তারপর টলতে টলতে পড়ে গেল। এবার ও ঠিক করল, বসে একটু জিরিয়ে নেবে। তারপর জোরে জোরে না দৌড়ে জোরে জোরে হাঁটতে থাকবে। বসে জিরোতে গিয়ে ও দেখল, ওর শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বুকের ভেতরটাতেও বেশ গরম লাগছে। কিন্তু তার পরেই ওর মনে হতে লাগল, ওর সারা শরীরটাই যেন আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে আসছে। ও প্রাণপণে এই অনুভূতিটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল, কিন্তু পারল না। বরং সেটা আরো বেড়েই চলল। দারুণ আতঙ্কে আবার দাঁড়িয়ে উঠে দৌড়তে লাগল সে। তারপর আবার আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। এবার ওর শরীরের কাঁপুনিও বেড়ে গেল খুব। ও বুঝতে পারল যে এই ঠাণ্ডা আর বরফের সঙ্গে লড়াইয়ে সে ক্রমশঃই হেরে যাচ্ছে—আরো একবার উঠে পড়ে দৌড়তে চেষ্টা করল ও। কিন্তু অল্প কিছুদূর গিয়েই টলতে টলতে সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। আর ও দৌড়বার চেষ্টা করল না। শান্ত-ভাবে উঠে বসল। হঠাৎ ওর মন থেকে সব আতঙ্ক কেটে গিয়ে সেখানে নেমে এল একটা গভীর শান্তির অনুভূতি। ওর মনে হল, এতক্ষণ ও বোকার মতো অকারণে একটা মুণ্ডুকাটা মুরগীর মতো অন্ধভাবে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। ওকে যখন ঠাণ্ডায় জমে

গিয়ে মরতে হবেই, তখন সে মিছিমিছি নিজেকে একটা হাসির খোরাক করে তুলছে কেন? তার চাইতে বরং নিজের আত্মসম্মান আর পৌরুষ বজায় রেখে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াই ভাল। মনে শান্তি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ও টের পেল, একটা ঘুমের ঘোর যেন ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ওর মনে হল, এই ভাল। ঘুমের মধ্যে দিয়েই আসুক ওর শেষ মুহূর্তটি। 'ক্লোরোফর্ম' শুঁকে লোকে যেরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় আস্তে আস্তে অসাড় হয়ে যায়, সে-ও তেমনি ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে মরণের কোলে ঢলে পড়বে। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে মারা যাওয়াটা এমন কিছু অগৌরবের ব্যাপার নয়। তার চাইতে অনেক বেশি খারাপ ভাবেও অনেকে মারা যায়। আচ্ছন্নতার ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অনেক রকম চিন্তা ভাবনা ওর মনের ভেতর দিয়ে খেলে গেল। আগামীকালই নিশ্চয় ওর সঙ্গীসাথীরা ওর মৃতদেহটা খুঁজে পাবে। হঠাৎ ওর মনে হল, ও নিজেও যেন ওর সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেকেই খুঁজতে এসেছে, তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বরফের ওপর পড়ে থাকা নিজেরই নিশ্চল দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। ও যেন একটা আলাদা কোনো লোক যে বেঁচে আছে আর ভাবছে—'সত্যি, বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে।' তারপর দেশে ফিরে গিয়ে মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডা যে আসলে কি জিনিস, তা নিয়ে জমাটি গল্প ফেঁদে বসেছে। তার পরেই আবার মনে পড়ে গেল 'গন্ধকের খাঁড়ি'র সেই বুড়ো লোকটার কথা। ও যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, বুড়োটা আগুনের পাশে আরাম করে বসে পাইপ টানছে। ও জড়িয়ে জড়িয়ে, খুব মৃদুস্বরে নিজের মনেই বলে উঠ্‌ল, 'ঠিক বলেছিলে হে বুড়ো কত্তা, তুমি একদম খাঁটি কথা বলেছিলে।' এবার আস্তে আস্তে সে আরো গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগল। ওর মনে হল, এত শান্তিতে আর আরামে সে কখনো ঘুমোতে যায়নি। আরো কিছুক্ষণ বাদে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনও চুপ করে গেল।

কুকুরটা চুপ করে ওর কাছেই বসে রইল। আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে এল। কিন্তু কুকুরটা দেখল যে, ওর প্রভু আগুন জ্বালানোরও চেষ্টা করছে না। কোনোরকম নড়াচড়াও করছে না। ও গলার মধ্যে নানা রকম আওয়াজ করতে লাগল। নড়াচড়া করে বরফের মধ্যে পা ঘষে ওর প্রভুর সাড় পেতে চেষ্টা করল। দিন শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ধারে বসবার জন্য ও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে—কোনো মানুষ এই ঠাণ্ডার মধ্যে আগুন না জ্বালিয়ে বরফের মধ্যে এভাবে চুপচাপ বসে থাকে না। কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে কোনোরকম সাড়াই পাওয়া গেল না। এবার কুকুরটা বেশ গলা ছেড়েই কেঁদে উঠ্‌ল। তারপর আস্তে

আস্তে প্রভুর গায়ের একদম কাছটিতে এসেই ও একটা গন্ধ পেল—মৃত্যুর গন্ধ, প্রাণহীন শরীরের গন্ধ। চম্‌কে পিছিয়ে এল সে। আরো কিছুক্ষণ সে খোলা ঠাণ্ডা আকাশের নিচে বসে রইল, একটানা ঘেউ ঘেউ করে ডাকল। তারপর বড় রাস্তায় উঠে দৌড়তে শুরু করল। ওর প্রভু যে আড্ডায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না, সেদিকেই এগিয়ে চলল সে,—সে ভালভাবেই জানে সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে পেটভরা খাবার, জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডের আর জীবিত মানুষের নিরাপদ উষ্ণ আশ্রয়।

THE STORY OF JEES UCK

জিস্ আক্-এর কাহিনী

'জিস আক' কোনো বিদুষী, খ্যাতনামা মহিলার নাম নয়, তার বংশ পরিচয় বলতেও কিছুই নেই। কিন্তু নিঃস্বার্থ সেবা আর আত্মত্যাগ যদি সত্যিকারের প্রেমের পরিচয় হয় তাহলে 'জিস আক্'-এর চাইতে বেশি খাঁটি আর উজ্জ্বলতর চরিত্র ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া বড় বড় মহীয়সী নারীদের মধ্যেও খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

'বর্ণসংকর' বলতে যা বোঝায় 'জিস আক্' ছিল তার একেবারে নিখুঁত একটি উদাহরণ। ওর দেহে পুরুষানুক্রমে যে কত জাতের রক্ত এসে মিশেছিল, তার হিসেব রাখা সত্যিই কঠিন। ওর ঠাকুরমার ধমনীতে ছিল 'টয়্যাট' গোষ্ঠীর রেড ইণ্ডিয়ান, এস্কিমো আর 'ইনুইট'দের রক্ত। আবার ওর ঠাকুরদা ছিলেন আধা রাশিয়ান আধা ইউরেশিয়ান। তবে 'টয়্যাট' রেড ইণ্ডিয়ানরা যে রাতে ওর ঠাকুরদা ঠাকুরমা সমেত ওদের পুরো গ্রামখানাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় তখন তারা জিস আক্-এর মা 'টুকেসান'কে-ও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল—টুকেসান তখন একেবারেই শিশু। তাদের কাছে টুকেসান 'টয়্যাট-'দেরই একজন হয়ে বেড়ে উঠেছিল। দু'দুবার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও টুকেসানের কোনো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। তার দুই স্বামী-ই বিয়ের কিছুদিন পরেই মারা গেছিল। এমন সময় হঠাৎ 'য়ুকন' নদীপথে নৌকা বেয়ে টুকেসানদের গ্রামে এসে হাজির হল দুঃসাহসী আইরিশ যুবক স্পাইক ওব্রায়েন। কোনো সাদা চামড়ার লোকই এর আগে য়ুকন নদীর আজানা স্রোত বেয়ে এতদূর আসেনি। ওব্রায়েন যখন এসে ওদের গ্রামে নৌকা ভেড়াল, তখন ক্লান্তি আর অনাহারে তার প্রায় মরমর অবস্থা। নৌকা থেকে তীরে নেমেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেরে উঠতে তার বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে গেল আর ইতিমধ্যে টুকেসানের সঙ্গে তার গড়ে উঠ্‌ল গভীর প্রেমের সম্পর্ক। খুব বেশিদিন অবশ্য টুকেসান ওব্রায়েনকে বেঁধে রাখতে পারেনি, অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানিতে ওব্রায়েন একদিন হঠাৎ আবার 'য়ুকন' নদী বেয়েই বেরিং সাগরের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। কিছুদিন বাদে এযাবৎ নিঃসন্তান টুকেসানের কোলে এল ওব্রায়েনের কন্যাসন্তান—এই মেয়েই 'জিস আক্'। শরীরে এত বিভিন্ন জাতের রক্ত ছিল বলে 'জিস আক্'-এর চেহারায় ফুটে উঠেছিল

নতুন এক ধরনের সৌন্দর্য। ওর ধারালো মুখে আর ছিপ্‌ছিপে লাবণ্যময় শরীরে একই সঙ্গে খেলা করে যেত কমনীয়তা আর ঋজুতা। সাদা চামড়ার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ফরসা গায়ের রঙ আর বর্ণসংকরদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বড় বড় উজ্জ্বল, কালো চোখে 'জিস আক্'কে করে তুলেছিল মোহময়ী অপরূপা এক যুবতী। তার স্বভাবেও ফুটে উঠেছিল সাদা চামড়ার লোকদের সহজাত একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আর চালচলনে অবশ্য জিস আক্ ছিল একেবারে খাঁটি একটি 'টয়্যাট' গোষ্ঠীর রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ে।

নীল বোনারের সঙ্গে 'জিস আক্'-এর পরিচয় ঘটেছিল খুবই আকস্মিকভাবে। সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে এই সুদূর উত্তরে আসার কোনোরকম আগ্রহ বা ইচ্ছাই নীল বোনারের ছিল না। ওর বাবা সবসময়েই গোলাপের বাগান নিয়ে মেতে থাকতেন আর ওর মা ব্যস্ত থাকতেন সমাজ সেবা নিয়ে। ফলে বাবা আর মা—কারো সাহায্যই ঠিকমতো না পেয়ে নীল বোনার একপাল বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেপরোয়া ভাবে ফূর্তি করে বেড়াত। শেষ পর্যন্ত ওর উচ্ছৃঙ্খলতা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে ওর গোলাপ প্রেমিক বাবা-ও চমকে উঠলেন। অগত্যা ওঁর কিছু বড়লোক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে উনি ঠিক করলেন, অন্ততঃ বছর পাঁচেকের জন্য নীল বোনারকে সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে বহু দূরে সরিয়ে দেওয়া যাক্। ওঁর এই সব বন্ধুরা ছিলেন বিখ্যাত পি. সি. কোম্পানির বড় বড় অংশীদার। পি. সি. কোম্পানির একগাদা স্টিমার আর সমুদ্রগামী জাহাজ ছাড়াও সুদূর উত্তরদেশে আলাস্কায় বহু জমিজমা, ব্যবসাকেন্দ্রও ছিল। এই সব জায়গাগুলো ছিল যেমন দুর্গম তেমনই নির্জন, একেবারে লোকবসতিশূন্য। পি. সি. কোম্পানির দোতলা কাঠের বাড়ি, বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া গুদামঘর, এছাড়া চারিদিকেই ধু ধু বরফ ঢাকা মাঠ। খালি শীতকালে মাঝে মাঝে রেড ইণ্ডিয়ানরা এসে কাছাকাছি তাঁবু ফেলত, আর কখনো সখনো কোনো ভ্রাম্যমান সোনা সন্ধানী ভাগ্যান্বেষীর দল এসে এসব জায়গায় অস্থায়ী আস্তানা গাড়ত। 'টোয়েণ্টি মাইল' ছিল 'য়ুকন' নদীর ধারে এরকমই একটি জায়গা, আর এখানকারই এজেণ্ট করে পাঠানো হল নীল বোনারকে—আগের এজেণ্ট নাকি হঠাৎ মারা গিয়েছিল। ওখানে আশেপাশে যে সব 'টয়্যাট' ইণ্ডিয়ানরা থাকত, তারা অবশ্য অন্য কথাই বলত। এজেণ্টকে তার কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন কর্মচারী-ও ছিল। এই কর্মচারীর নাম ছিল অ্যামোস পেণ্টলি। এক অদ্ভুত বিকৃত স্বভাবের লোক ছিল সে। তার চেহারা আর চালচলন দেখে নীল বোনারের মনে স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, লোকটা পাগল। অ্যামোসের চেহারাটাও

ছিল ঠিক একটা যক্ষ্মারোগীর মতো। এরকম জনমানবহীন জায়গায় দুজন সহকর্মীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই খুব তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে; কিন্তু এখানে ঘটল ঠিক তার উল্টো ব্যাপার। প্রথম থেকেই এদের দুজনের সম্পর্ক হয়ে উঠল নিদারুণভাবে তিক্ত। তার জন্য অবশ্য অ্যামোস-ই পুরোপুরি দায়ী। প্রাণবন্ত, সুস্থ-সবল নীল বোনারের জীবনীশক্তিতে ভরপুর পৌরুষ সে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। কারণ সে নিজে ছিল শীর্ণকায়, কোলকুঁজো, বিকৃতমনা এক অসুস্থ লোক। ওর গর্তে বসে যাওয়া কুতকুতে দুই চোখের দৃষ্টি থেকে সবসময়েই যেন ঈর্ষা আর বিদ্বেষ ঝরে পড়ত। নীল বোনারের অবশ্য তার এই সহকর্মীর ওপর কোনো বিদ্বেষ ছিল না, বরং রুগ্ন অসুস্থ অ্যামোসের জন্য অবজ্ঞা মেশানো একটা করুণাই সে অনুভব করত। আগের এজেন্টের অকস্মাৎ মৃত্যুর পেছনে অ্যামোসের হাত ছিল—স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের এই গুজবে সে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। অফিসের যাবতীয় কাজকর্ম নীল বোনার-ই করত, অ্যামোসের কাজ ছিল খালি দুজনের জন্যে রান্না করা।

'টোয়েন্টি মাইল্‌স্‌' জায়গাটা ছিল যেমন নির্জন, তেমনই বৈচিত্র্যহীন—যেদিকে যতদূর চোখ যায় ধু ধু করছে বরফের প্রান্তর। কোথাও কোনো গাছপালা বা অন্য কোনোরকম প্রাণের চিহ্ন মাত্র নেই—চরম একঘেয়েমির মধ্যে দিয়ে দিনগুলো একই ভাবে কেটে যেত। নীল বোনার ছিল খুবই মিশুকে, সামাজিক এক যুবক, সত্যি কথা বলতে কি অতিমাত্রায় সামাজিকতা করতে গিয়েই এখন তাকে এই নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হচ্ছিল। দিনের বেলায় নীল নানারকম কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে কোনোরকমে সময়টা কাটিয়ে দিত; কিন্তু লম্বা রাতগুলো যেন তার আর কাটতে চাইত না কিছুতেই। বিছানায় শুয়ে ছোট ছেলের মতো চীৎকার করে কান্নাকাটি করত নীল, আর প্রাণভরে নিজের বাবাকে আর ভগবানকে শাপশাপান্ত করত।

ঠিক এই সময়েই নীল-এর জীবনে এল 'জিস আক্‌'। কাছেই 'টয়্যাট' গোষ্ঠীর যে রেড ইণ্ডিয়ানদের বসতি ছিল, সেখানেই থাকত 'জিস আক্‌'। নীল বোনারের কাছ থেকে সে ময়দা, শুকনো মাংস, টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে আসত। অবশ্য পয়সা দিয়ে নয়। তার নিজের হাতে তৈরি নানারকম সৌখিন জিনিসের বিনিময়ে। প্রথম যেদিন জিস্‌ আক্‌ এলো, সেদিন নীল বোনার আত্মহারা হয়ে বহুক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে রইল যেন কোনো তৃষ্ণার্ত লোক টলটলে জলের খোঁজ পেয়েছে। জিস্‌ আক্‌-ও ছিল সপ্রতিভ সহজ স্বভাবের তরুণী, তার ধমনীতে যে আইরিশ পূর্ব-পুরুষের রক্ত বইছিল, তা তাকে করে তুলেছিল নির্ভীক, নিঃসংকোচ। তাই সে-ও

খুব স্বচ্ছন্দভাবেই নীল বোনারের সঙ্গে আলাপ করল, গল্পগুজবে মেতে উঠল। কোনো তরুণী তার সমকক্ষ পুরুষের সঙ্গে যেভাবে মেশে, তাকায়—ঠিক সেরকম ব্যবহারই করল সে। এর ফল যা হবার তাই হল, তার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল নীল বোনার। নীল অবশ্য নিজেকে শক্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগল; কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। জিস আক্ প্রায়ই তার কাছে জিনিসপত্র কিনতে আসত, আর কাঠের চুল্লীর পাশে বসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে নীল-এর সঙ্গে গল্পগুজব করত। ওর আসার দিনগুলোতে ওর প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে অপেক্ষা করত নীল—যে দিন জিস আক্ আসত না, সেদিনটা নীল সারাক্ষণ ছট্‌ফট্ করত। জিস আক্ এলেই গল্পগুজব হাসিঠাট্টায় দুজনে মেতে উঠত। আর ওদের এই মেলামেশা বিষাক্ত, সর্পিল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে যেত অ্যামোস। জিস্ আক্-কে দেখলেই অ্যামোসের রোগজীর্ণ অক্ষম দেহের রক্ত উত্তেজনায় যেন টগবগ করে ফুটে উঠত—কিন্তু হাঁ করে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু তার করার ক্ষমতা ছিল না। জিস্ আক্ অবশ্য তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে অ্যামোসের মনোভাব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরে গিয়েছিল। নীল বোনারকে সে অ্যামোসের সম্বন্ধে প্রায়ই হুঁশিয়ার করে দিত, সতর্ক থাকতে বলত। নীল অবশ্য ওর সাবধানবাণীতে কান না দিয়ে হেসেই ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করে দিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘটল এক সাংঘাতিক অঘটন। সেদিন সকালেও জিস্ আক্ এসেছিল একবস্তা ময়দা কিনতে। গুদামঘর থেকে ময়দার বস্তা বার করে নীল বোনার সেটাকে জিস্ আক্-এর স্লেজগাড়িতে বাঁধছে, এমন সময় হঠাৎ সে অনুভব করল, তার ঘাড়ের পেশী যেন শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আচম্‌কা একটা দারুণ বিপদের অনুভূতি জেগে উঠল তার মনে। বস্তাটা বাঁধা শেষ হতে না হতেই ওর সারা শরীরে খিঁচুনি আরম্ভ হয়ে গেল, সারা শরীর বেঁকে গিয়ে মাটিতে পড়ে দাপাতে শুরু করল নীল বোনার। জিস্ আক্ ইতিমধ্যে ওর পাশে এসে বসে পড়েছিল। তার হাতদুটি শক্ত করে ধরে খিঁচুনির বেগ না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল নীল। খিঁচুনি যখন থামল, তখন ওর সারা কপাল ঘামে ভিজে জব্‌জব্ করছে, ঠোঁটের কষে ফেনা জমে উঠেছে। ঘড়ঘড়ে গলায় জিস্ আক্‌কে বলে উঠল বোনার—'তাড়াতাড়ি কর। এক্ষুনি আমাকে ভেতরে নিয়ে এস।' জিস্ আক্ ওকে তুলে ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরেই আবার শুরু হল প্রচণ্ড খিঁচুনি। ইতিমধ্যে অ্যামোস এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। জিস্ আক্ অসহায়ভাবে তাকেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হল, অ্যামোস? নীল মরে যাবে না তো?' অ্যামোস কিন্তু কোনো উত্তরই দিল না। নির্বিকারভাবে

নীল বোনারের দিকে তাকিয়ে রইল। এবার খিঁচুনি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নীল বলে উঠ্‌ল—'জিস্‌ আক্‌, যে করেই হোক আমাকে এখুনি ওষুধ পত্তর রাখার আলমারিটার কাছে টেনে নিয়ে চল।' আলমারিটার কাছে পেঁাছে কোনোরকমে 'ক্লোরাল হাইড্রেটা'-এর একটা শিশি খুলে ওষুধটা খেয়ে নিল সে। নীল ঠিক এইভাবে অনেক কুকুরকে মরতে দেখেছে—কাজেই এই অবস্থায় কি করতে হয় সেটা ওর জানা ছিল। ওষুধটা খেয়ে দুর্বলভাবে আস্তে আস্তে জিস্‌ আক্‌কে বলে গেল নীল, 'জিস্‌ আক্‌ যা বলছি মন দিয়ে শোন। আমার পাশেই থাকো, কিন্তু খবরদার আমাকে যেন ছুঁও না। আমাকে একদম চুপ করে থাকতে দাও। কিন্তু কিছুতেই চলে যেও না যেন। আর দেখ, অ্যামোসকে কোথাও যেতে দিও না,—সে যেন এখানেই থাকে।' কথাগুলো বলতে বলতেই আবার ওর খিঁচুনি শুরু হয়ে গেল, তবে এবার তার তীব্রতা অনেক কম। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল নীল। আর পাশে সজাগ প্রহরীর মতো বসে রইল জিস্‌ আক্‌। অ্যামোস দু একবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু জিস্‌ আক্‌-এর তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে শেষ পর্যন্ত আর তার অত সাহস হয়নি।

নীল বোনার যখন জেগে উঠল, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দুর্বল শরীরে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল নীল—সারা শরীরে তার অসহ্য ব্যথা। একটু ধাতস্থ হয়েই সে বলে উঠল, 'জিস্‌ আক্‌, এখনি রান্না ঘরে গিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা সব খাবারগুলো নিয়ে এসো, হুইস্কি আর জলের পাত্রগুলো-ও আনো।'

খুব কড়া এক ডোজ হুইস্কি খেয়ে নীল বোনার ওষুধের আলমারিটা খুলে অনেকগুলো শিশি বোতল বার করে আনল। তার একটা কাচের টিউবে নানারকম ওষুধপত্র ঢেলে খাবারগুলো নিয়ে নানারকম পরীক্ষা শুরু করল সে। কলেজ জীবনে ল্যাবরেটরিতে সে এককালে এরকম অনেক পরীক্ষা করেছে, ব্যাপারটা তার কাছে নতুন নয়। তাছাড়া এইমাত্র ওর যে খিঁচুনিগুলো হচ্ছিল, তাতে ধনুষ্টংকারের লক্ষণ খুব পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছিল—তাই কি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সেটা-ও ওর জানা ছিল। শেষ পর্যন্ত বিস্কুটগুলো নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে যা খুঁজছিল তাই পেয়ে গেল সে। মুখে অবশ্য নীল কিছুই বলল না। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এক নিমেষে সব কিছু বুঝে ফেলল জিস্‌ আক্‌, আর পরের মুহূর্তেই বাঘিনীর মতো অ্যামোসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শুইয়ে ফেলে কোমরে গোঁজা ছোরাখানা খুলে ফেলল সে। কিন্তু নীল বোনার বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, জিস্‌ আক্‌। মেরো না ওকে, আমি যা করার করছি।' জিস্‌ আক্‌ খুব

অনিচ্ছুক ভাবে এক ধাক্কায় অ্যামোসকে মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার নীল এগিয়ে গিয়ে অ্যামোস-এর গায়ে জুতোর ঠোক্কর মেরে বলে উঠ্‌ল—'এই যে অ্যামোস, উঠে পড়। তোমাকে এখুনি এই রাতেই এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখন বুঝতে পারছি, আমার আগের এজেন্ট 'বার্ডসল'-কেও তুমি-ই খুন করেছিলে। আমাকে তো খাবারে 'স্ট্রিকনিন' মিশিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিলে; বার্ডসল-এর বেলায় কি করেছিলে তা তুমি-ই জান। যাই হোক, তোমাকে কিছু খাবার, একটা স্লেজগাড়ি আর তিনটে কুকুর দিচ্ছি। দুশো মাইল দূরে হোলি ক্রশ বলে যে জায়গাটা আছে, সেদিকেই যাও,—ভাগ্য ভাল থাকলে সেখানে পৌঁছেও যাবে হয়তো। শীতকালটা কেটে গিয়ে বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত আমি আমার কোম্পানিকে তোমার কীর্তির কথা জানাব না, তাই আপাততঃ তুমি নিরাপদ। তার আগে যত শিগ্‌গির পার মরে যাওয়াই অবশ্য তোমার পক্ষে সবচাইতে ভাল। যাও, দূর হও এখন!'

অ্যামোসকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর নীল একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই জিস্‌ আক্‌কেও তার দলবলের সঙ্গে বহুদিনের জন্য বেরিয়ে পড়তে হল। বল্‌গা হরিণের একটা বিরাট দলের পেছনে ধাওয়া করে চলল টয়্যাটরা। জিস্‌ আক্‌-এর অনুপস্থিতিই যেন নীল বোনারকে বুঝিয়ে দিল সে এখন ওর কতখানি আপনজন হয়ে পড়েছে—নীল বোনার-এর প্রায় সমস্তটা দিনই এখন কাটত জিস্‌ আক্‌-এর কথা ভেবে। ক্রমশঃ এই অন্তহীন নিঃসঙ্গতা যেন নীল বোনারকে পাগল করে তুলল—ওর আচার ব্যবহারে অস্বাভাবিকতার লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। অকারণেই সে নিজের মনে বিড়্‌বিড় করে বকত, রাত্রিবেলায় তুষারপাতের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে চেঁচামেচি করে ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে জাগিয়ে তুলত। একবার তো একটা কুকুরকেই ঘরে এনে নিজের কাছে রাখবার চেষ্টা করেছিল নীল, কিন্তু কুকুরটাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারেনি। সে বেচারা তো চেঁচামেচি করে ঘাবড়ে গিয়ে নীল-এর পায়ে কামড় বসিয়ে এমন এক কাণ্ড বাধিয়ে দিল যে নীল বাধ্য হয়ে তাকে আবার ঘরের বাইরে বার করে দিল। নীল-এর তখন এমন মরিয়া অবস্থা যে, যে কোনো একটা জীবিত প্রাণীর সাহচর্য পেলেই সে বর্তে যাবে। যাইহোক, নীল-এর মাথা যখন সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে যেতে বসেছে, তখনই হাজির হল জিস্‌ আক্‌—ওর গোষ্ঠীর লোকেরা শিকারের পালা শেষ করে আবার তাদের পুরনো বস্তিতে ফিরে এসেছে। জিস আক্‌ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নীল বোনারের কাছে জীবনের মানেটাই পাল্‌টে গেল—হাসি ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে দিন-গুলো যেন একটা সুখস্বপ্নের মতো কেটে যেতে লাগল। একদিন রাত্রে জিস্‌ আক্‌

যখন শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে, তখন নীল বোনার হঠাৎ খুব আন্তরিকতার সঙ্গে, গভীরভাবে তার ঠোঁটে চুমু খেল। 'টয়্যাট'দের মধ্যে ঠোঁটে চুমু খাওয়ার রীতি নেই। জিস আক্-ও আগে কখনো চুম্বনের স্বাদ পায়নি। কিন্তু নীল বোনারের এই ব্যবহারের মানে বুঝতে তার একটুও দেরি হল না। কি এক অজানা আনন্দে ভরে উঠল জিস আক্-এর দেহমন। ওদের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান এখনো ছিল, তা আর রইল না। জিস আক্-এর আদিম সরলতার ছোঁয়া পেয়ে নীল বোনারের ক্লান্ত বিধ্বস্ত মন আবার তার সরসতা ফিরে পেল—ক্লান্ত পথিক যেন দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ যাত্রার পর খুঁজে পেল নিশ্চিন্ত আশ্রয়। ঠিক এই সময়েই আবার ওদের আনন্দের পাত্র কানায় কানায় ভরে তুলতে 'টোয়েন্টি মাইল্স্'এ এসে হাজির হল তৃতীয় আর একজন। 'স্যাণ্ডি ম্যাক্ফারসন' নামে এক পর্যটক তার সঙ্গীকে হারিয়ে বহুদূর থেকে ঘুরতে ঘুরতে নীল বোনারের কাছে এসে পৌঁছল। স্যাণ্ডি ম্যাকফারসনও ছিল যেমন আমুদে, তেমনই করিৎকর্মা আর মিশুকে। জিস্ আক্ এখন নীল বোনারের সঙ্গেই থাকত। ফলে নীল বোনার, জিস্ আক্ আর স্যাণ্ডি ম্যাকফারসন—এই তিনজনে মিলে গড়ে তুলল অতি সুখী, আনন্দময় এক পরিবার। দিনের বেলায় হয়ত স্যাণ্ডি নীলকে নিয়ে শিকার করতে ফাঁদ পেতে নেক্ড়ে ধরতে বেরোত, আর নয়তো নীল সেক্সপিয়ারের একটা কাব্যগ্রন্থ খুঁজে বার করে স্যাণ্ডিকে কবিতা শেখাত। সন্ধ্যাবেলায় দুজনে মিলে বসে তাস খেলত। প্রাণভরে আড্ডা দিত, তর্ক জুড়ত। জিস্ আক্ কাছেই একটা আরামকেদারায় বসে দুলতে দুলতে ওদের গল্পগুজব শুনত আর সেলাই করত।

শীতকাল শেষ হয়ে বসন্তকাল এসে গেল। পলাতক সূর্যের মুখখানা আবার দেখতে পাওয়া গেল। ধূসর, বিবর্ণ প্রকৃতি যেন নতুন সাজ পরে হেসে উঠল। জমাট 'য়ুকন' নদীর বরফ গলে বইতে লাগল এক তীব্রস্রোতা জলধারা। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শুরু হয়ে গেল বড় বড় সব স্টিমারের আনাগোনা। নতুন নতুন লোক, নিত্যনতুন ঘটনায় চারদিকে যেন একটা প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। 'টোয়েন্টি মাইলস্' এ নীল বোনারকে সাহায্য করবার জন্য অ্যামোসের বদলী এক সহকর্মী এসে হাজির হল। স্যাণ্ডি ম্যাকফারসন একদল ভাগ্যান্বেষী পর্যটকের সঙ্গে 'কয়ুকাক' অঞ্চলে সোনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। নীল বোনারের নামে দেশ থেকে এক গাদা চিঠি-পত্র, খবরের কাগজ এসে পৌঁছল। চিঠি পড়ে নীল বোনার জানতে পারল যে তার বাবা মারা গেছেন—মারা যাওয়ার আগে তাকে ক্ষমা করে নিজের অগাধ সম্পত্তির মালিকানা দিয়ে গেছেন। নীল বোনারের কোম্পানি ওকে এখানকার কাজের দায়িত্ব

থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকেও একটা চিঠি পেল নীল—তাতে শোকগ্রস্ত মা তাঁর প্রিয় ছেলেকে তখুনি তাঁর কাছে ফিরে যেতে কাতরভাবে অনুরোধ করেছেন।

মনস্থির করতে নীল বোনারের বেশি সময় লাগল না। কয়েকদিন বাদে 'য়ুকন বেল' নামে স্টিমারখানা যখন বেরিং সাগর যাওয়ার পথে 'টোয়েন্টি মাইল্‌স'-এ এসে পেঁছিল তখন সেটাতেই চেপে দেশের দিকে পাড়ি জমাল নীল বোনার। জিস্‌ আক্‌-এর কাছে বিদায় নেওয়ার আগে নীল তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিল—ফিরে আসবার এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আবহমানকাল থেকেই পুরুষ জাত তার সঙ্গিনীকে দিয়ে আসছে। অবশ্য বিদায় নেবার সময় নীল সত্যি সত্যিই ভেবেছিল, সে তার প্রিয়তমার কাছে ফিরে আসবে। এই চার বছরের অভিজ্ঞতা আর তার নবলব্ধ ঐশ্বর্য—এই দুইয়ের ওপর ভিত্তি করে সে ফিরে এসে গড়ে তুলবে এক নতুন আলাস্‌কা। জাহাজ ছাড়ার আগে সে দেখেও গেল যে, ডজনখানেক শ্রমিক দামী দামী কাঠ দিয়ে জিস্‌ আক্‌-এর জন্য খুব সুন্দর আর বড় একটা বাড়ি তৈরি করতে শুরু করেছে—আবার শীত পড়ার আগেই যাতে বাড়িটা তৈরি হয়ে যায়, নীল বোনার তার সবরকম ব্যবস্থাই করে এসেছে। ধীরে ধীরে জিস্‌ আক্‌-এর দুটি ব্যাকুল চোখের সামনে দিয়ে 'য়ুকন বেল' নীল বোনারকে নিয়ে নদীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেশে ফিরে নীল বোনার পেল উষ্ণ, আন্তরিক অভ্যর্থনা—তাকে নিয়ে আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত মহলে যেন একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কিন্তু এই চার বছরে নীল বোনার অনেক কিছু জেনেছে, পৃথিবীটা চিনতে শিখেছে—আর সে আগেকার মতো বেপরোয়া জীবনযাত্রায় গা ভাসিয়ে দিল না। সে এতদিনে খুব ভালভাবেই জেনে গিয়েছিল যে, সমাজে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে গেলে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সৎ জীবনযাত্রাই একমাত্র উপায়। নিজের কর্তব্যের চাইতে বেশি দামী জিনিস আর কিছু নেই, আর ঠিকমতো নিজের কাজটুকু করাই হচ্ছে উন্নতির একমাত্র পথ। তাই নীল বোনার ক্রমেই শহরের কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। আর শহরের এই জীবন তার কাছে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর উত্তরে আলাস্‌কার স্মৃতি তার কাছে ঝাপ্‌সা হতে হতে যেন কোন্‌ সুদূর দিগন্তে মিলিয়ে যেতে থাকল। তারপর একদিন তার সঙ্গে দেখা হল কিটি শ্যারনের,—শিক্ষা দীক্ষায়, সামাজিক স্বীকৃতিতে, রূপে গুণে এক অসামান্যা তরুণীর সঙ্গে। অল্প দিনের মধ্যেই মিস্‌ কিটি শ্যারন হয়ে গেলেন মিসেস কিটি বোনার। আর নীল বোনারের স্মৃতিপট

থেকে 'টোয়েণ্টি মাইল্‌স্‌'-এর সেই দিনগুলো পুরোপুরিই মুছে গেল।

জিস্‌ আক্‌ কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও নীল বোনারকে ভোলেনি—সারা মনপ্রাণ দিয়ে সে বিশ্বাস করত, যে কোনো দিন তার প্রিয়তম ফিরে আসবে। নতুন বাড়িতে বসে তার শুরু হল অন্তহীন প্রতীক্ষা। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে আবার শীত-কাল এলো। নীল বোনার বলে গেছিল, শীত পড়ার আগেই সে ফিরে আসবে। নীল বোনারের জায়গায় 'টোয়েণ্টি মাইল্‌স'-এ জন টম্পসন নামে যে নতুন এজেন্ট এসেছিল, সে বিদ্রূপের হাসি হেসে প্রায়ই বলত যে, নীল বোনার আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। কিন্তু জিস্‌ আক্‌ তার কথার কোনোরকম গুরুত্বই দিত না। আসলে জন টম্পসনের মতলব ছিল অন্য—সে চাইছিল নীল বোনারের শূন্যস্থানটা পূর্ণ করতে। একদিন সে খোলাখুলি ভাবে জিস্‌ আক্‌-কে সেরকম প্রস্তাব করেও বসল। বলা বাহুল্য জিস্‌ আক্‌ চরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। এর পর টম্পসন জোর করে জিস্‌ আক্‌কে নিজের বশে আনার চেষ্টা করতে লাগল। নীল বোনার যাবার সময় পরিষ্কার ভাবে বলে গিয়েছিল যে, জিস্‌ আক্‌-এর গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্ত জিনিসপত্র যেন কোম্পানির গুদাম থেকে তাকে বিনা পয়সায় দেওয়া হয়, দাম মেটানোর ব্যবস্থা নীল বোনার করে দেবে। কিন্তু টম্পসন ধারে জিস্‌ আক্‌কে কোনোরকম জিনিস দেওয়া বন্ধ করে দিল। আর অপেক্ষা করে রইল কখন জিস্‌ আক্‌ তার কাছে এসে আত্ম সমর্পণ করে। কিন্তু আক্‌কে চিনতে তার ভুল হয়েছিল। জিস্‌ আক্‌ তার নিজের সবকটা কুকুরকে বিক্রি করে দিয়ে নগদ পয়সা দিয়ে সবকিছু কিনতে লাগল। এর পরে টম্পসন তাকে পয়সার বিনিময়েও কোনো কিছু বিক্রি করতে অস্বীকার করল। এবার জিস্‌ আক্‌কে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো 'টয়্যাট'রা—তারাই জিস্‌ আক্‌-এর হয়ে সব জিনিস কেনাকাটা করে রাতের বেলায় সব কিছু তাকে পৌঁছে দিয়ে আসত।

ঋতুচক্রের নিজস্ব নিয়মে আবার শীতকাল শেষ হয়ে আসতে লাগল। ফেব্রুয়ারিতে তুষার প্রান্তর পেরিয়ে আসা স্লেজগাড়ির ডাকে বাইরের জগতের চিঠিপত্র, খবরের কাগজ এসে পৌঁছতে লাগল। পাঁচ মাসের পুরনো একটা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে টম্পসনের চোখে পড়ল যে, নীল বোনারের সঙ্গে কিটি শ্যারনের বিয়ে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটল জিস্‌ আক্‌কে খবরটা জানাতে। জিস্‌ আক্‌ তাকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সবকিছু শুনল বটে, কিন্তু টম্পসনের একটা কথাও বিশ্বাস করল না—গর্বিত হাসি হেসে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। এর কয়েকদিন পরে মার্চ মাসে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই নীল বোনারের ছেলের জন্ম দিল সে—এই নতুন

প্রাণের আবির্ভাব তাকে যেন সব দুঃখ ভুলিয়ে দিল। এর কয়েক মাস বাদে আমেরিকার আর এক প্রান্তে নীল বোনারকেও তার স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে এক দৃষ্টিতে তার সদ্যোজাত শিশুকন্যার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল।

দেখতে দেখতে আরো একটা বছর কেটে গেল। কুকুরগুলোকে বিক্রি করে যে পয়সা জিস্ আক্-এর হাতে এসেছিল, তাও ফুরিয়ে এলো। অগত্যা জিস্ আক্ আবার ফিরে গেল 'টয়্যাট'দের বস্তিতে। সেখানে অনেক শক্ত সমর্থ যোগ্য রেড ইণ্ডিয়ান যুবকই ওকে বিয়ে করার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। কিন্তু জিস্ আক্ তাদের কাউকেই কোনোরকম আমল দিল না। ওর হাতের কাজ ছিল অতি চমৎকার— ভারী সুন্দর চামড়ার জুতো, মোজা, দস্তানা তৈরি করতে পারত সে। তখন ঐ অঞ্চলে অভিযাত্রীদের ভিড় ক্রমশঃ বেড়েই চলছিল, আর তাদের কাছে ঐ সব জিনিস-গুলো ছিল খুবই দরকারী। তাই জিস্ আক্ আর তার বাচ্চার খাওয়া পরার অভাব তো রইলই না, বরং বেশ কিছু পয়সাও ওর হাতে জমে গেল। এর মধ্যে অবশ্য অনেকবারই ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, তবে কোনো পরিবর্তন হয়নি জিস্ আক্-এর মনের। তার স্থির বিশ্বাস, নীল বোনারকে আবার সে ফিরে পাবেই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই একদিন ছেলেকে নিয়ে 'য়ুকন বেল' জাহাজে চড়ে বসল সে। সেণ্ট মাইকেল বন্দর থেকে সীলধরা জাহাজ, তারপর মালবাহী নৌকায় দীর্ঘদিন ধরে সে একটু একটু করে এগোতে লাগল দক্ষিণদেশের দিকে। কখনো বাসন ধুয়ে, কখনো, রান্না করে নিজের আর ছেলের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে নিত সে। অবশেষে বহু কষ্টের পর আলাস্কা আর কানাডার তীরভূমি ছাড়িয়ে, 'জুয়ান দ্য ফুকা'র প্রণালী পেরিয়ে একদিন 'সিআট্‌ল'-এ এসে পেঁছিল জিস্ আক্। এখানে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্যাণ্ডি ম্যাক্‌ফারসন-এর। স্যাণ্ডি তার কাহিনী শুনে যতটা আশ্চর্য হল, দুঃখিত হল তার চাইতে বেশি। কিটি শ্যারনের কথা অবশ্য জিস্ আক্ তাকে বলেনি, কারণ সে নীল বোনারের বিয়ের কথাটা বিশ্বাসই করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে মনে স্যাণ্ডি ম্যাক্‌ফারসন বুঝতে পারল যে, নীল বোনার জিস্ আক্-এর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জিস্ আক্‌কে সানফ্রান্সিসকোয় নীল বোনারের খোঁজ করতে যেতে বারবার নিষেধ করল সে। কিন্তু জিস্ আক্ যখন তার গোঁ কিছুতেই ছাড়ল না, তখন অগত্যা সে খুব দুঃখিত মনেই জিস্ আক্‌কে বিদায় দিল। তবে তার আগে জিস্ আক্‌কে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে সানফ্রান্সিসকোর টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে যথাসাধ্য যত্ন করল সে। নীল বোনারের এই ব্যবহারে তার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। জিস্ আক্ আর

তার ছেলেকে নিয়ে ট্রেন ছুটে চলল দক্ষিণে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর দিকে। জিস্‌ আক্‌ আগে কখনো এই 'লোহার ঘোড়া' দেখেনি, তাতে চড়া তো দূরের কথা। কিন্তু ট্রেনে উঠে সে ঘাবড়ে গেল না মোটেই। বরং নীল আধুনিক সভ্যতার এই প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়ে গর্বে আর বিস্ময়ে তার মন ভরে গেল—এই সভ্যতা যারা গড়ে তুলেছে, নীল বোনার তো তাদের জাতেরই একজন। নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। সত্যিই কি ভগবানের মত শক্তিশালী এই সব লোকেদের একজন তাকে ভালবেসেছে, তার এই ছেলের বাবা হয়েছে?

অবশেষে একদিন সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে নীল বোনারের বিশাল অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল জিস্‌ আক্‌। তির্যক্‌চক্ষু এক জাপানী চাকর খানিকক্ষণ ওর কথা বোঝবার বৃথা চেষ্টা করে ওকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে এলো বাড়ির ভেতরকার হলঘরে। তারপর ভেতর থেকে কথা বলে এসে জিস্‌ আক্‌কে সঙ্গে করে সে নিয়ে চলল অন্দরমহলে। হলঘর আর অন্যান্য ঘরগুলোর আসবাবপত্র আর সাজসজ্জা দেখে একেবারে হতবাক্‌ হয়ে গেল জিস্‌ আক্‌,—এই প্রথম কিরকম একটা শ্রদ্ধা মেশানো ভয় তার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। এইরকম একটা রূপকথার মতো, অবাস্তব স্বপ্নের মতো বাড়িতে থাকে তার প্রিয়তম নীল বোনার? 'টোয়েণ্টি মাইল্‌স' এ 'টয়্যাট'দের বস্তির সঙ্গে এই প্রাসাদের যে কি আকাশ পাতাল তফাৎ, তার পুরো ছবিটা যেন এবার জিস্‌ আক্‌-এর মনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

অন্তহীন সময় ধরে অসংখ্য সুসজ্জিত ঘর পেরিয়ে অবশেষে এক বড় ঘরে এসে ঢুকল জিস্‌ আক্‌। এখানে ছবির বইয়ে দেখা রানীর মতো সুন্দরী আর অভিজাত চেহারার স্বর্ণকেশী এক মহিলা ওর দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর মহিমময়ী সৌন্দর্য দেখে জিস্‌ আক্‌ আর একবার হতবাক্‌ হয়ে গেল। জিস্‌ আক্‌ নিজেও এক অতি আকর্ষণীয়া, সুন্দরী তরুণী। নীল বোনার, জন টম্পসন এবং আরো বহু পুরুষ তার রূপের আকর্ষণে হাবুডুবু খেয়েছে, কিন্তু এই ভদ্রমহিলার কাছে জিস্‌ আক্‌-এর নিজেকে অতি তুচ্ছ বলে মনে হল।

'আপনি আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চান?'—অতি মধুর মিহি গলায় ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন। অতি সুখে, আরামে যারা জীবন কাটিয়েছে, কখনো চিৎকার চেঁচামেচি করে স্লেজের কুকুরদের ধমকাতে হয়নি, তাদের গলা থেকেই এরকম সুরেলা আওয়াজ বেরোয়—ভাবল জিস্‌ আক্‌। আস্তে আস্তে যথাসাধ্য শুদ্ধ ইংরেজিতে সে জবাব দিল—'না, আমি নীল বোনারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

মৃদু হেসে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তাইতো বলছি। নীল বোনার-ই আমার স্বামী।'

হঠাৎ যেন দুই ভুরুর মধ্যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অসাড় হয়ে গেল জিস্ আক্—জন টম্পসন তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল। মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, ঝাঁপিয়ে পড়ে ভদ্রমহিলার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলে। এক লহমা মাত্র—সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিল জিস্ আক্। নীল বোনারের স্ত্রী কিট কল্পনাও করতে পারল না, কত বড় ফাঁড়া কেটে গেল তার। সে এবার জিজ্ঞেস করল—'আমার স্বামী যখন আলাস্কায় ছিলেন তখন ওকে আপনি চিনতেন বুঝি?'

'হ্যাঁ গো, তাই বটে। মানে ওর জামাকাপড় কাচতাম আর কি।'—জবাব দিল জিস্ আক্। হঠাৎ যেন ইংরেজি ভাষা ভুলে গিয়ে ভাঙা ভাঙা, রেড ইণ্ডিয়ানদের মতোই দেহাতি ইংরেজি বলতে শুরু করল সে। কিটি বোনার নিজের ছোট মেয়েকে ডেকে আনিয়ে জিস্ আক্-এর ছেলের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিল। দুই শিশুর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে ঘরে এসে ঢুকল নীল বোনার। জিস্ আক্‌কে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'আরে জিস্ আক্ যে! কতক্ষণ এসেছ?' এগিয়ে এসে জিস্ আক্-এর হাতদুটি ধরে বেশ আন্তরিকভাবেই ঝাঁকাল বটে নীল বোনার, কিন্তু জিস্ আক্ ওর দিকে তাকিয়েই বোঝতে পারল যে নীলের চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। নীল বলেই চলল—'সত্যি তোমাকে দেখে দারুণ ভাল লাগছে। কি ব্যাপার, সোনার খোঁজ টোঁজ পেয়ে অনেক পয়সা কড়ি পেয়েছ নাকি? কি করে এলে এতদূর?'—কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নীল বোনার লুকিয়ে লুকিয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল দুজনের মধ্যে এর মধ্যে তেমন কোনো কথাবার্তা হয়েছে কিনা। কিন্তু জিস্ আক্ আর কিটি,—দুজনের কারুরই মুখ দেখে ও কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না।

জিস্ আক্ একেবারে খাঁটি রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো উচ্চারণে কথা বলতে লাগল এবার, 'না গো না। মানে কি ব্যাপারটা হয়েছে জান, ঐ যে মারক্‌হাইম বলে ভদ্রলোকটি ছিলেন না, যাকে আপনি চেনেন? তাঁর বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করেছি অনেকদিন। মাইনে যা পেতাম, তা কিছুই খরচা হত না, তাই হাতে বেশ কিছু টাকাকড়ি জমে গেছিল। সেইজন্য ভাবলাম, যাই, একবার সাদা চামড়ার লোকদের দেশটা দেখেই আসি। বাঃ কি সুন্দর দেশ গো!'

জিস্ আক্-এর ইংরেজি বলার ধরন দেখে নীল খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ সে নিজে আর স্যাণ্ডি—এই দুজনের কাছে জিস্ আক্ খুব ভালভাবেই ভাষাটা রপ্ত

করে নিয়েছিল। 'নাঃ মেয়েটা আবার পুরোপুরি রেড ইণ্ডিয়ান হয়ে গিয়েছে', ভাবল নীল। ঠিক এই সময়েই ওর স্ত্রী আস্তে আস্তে বলে উঠ্‌ল—'সত্যি জিস্‌ আক্‌, তুমি সেই সুদূর আলাস্কাতে আমার স্বামীকে চিনতে ভাবতেই কেমন অবাক লাগছে।'

চেনা! শুধুই চেনা! নিজের অজান্তেই জিস্‌ আক্‌-এর চোখ চলে গেল ঘরের কোণে জানলাটার দিকে, যেখানে তার গর্ভে জন্মানো নীল বোনারের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, খেলা করছে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে নীলের-ও চোখ পড়ল দুই শিশুর ওপর, আর সঙ্গে সঙ্গেই নীলের মনে হল তার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে, হৃদ্‌পিণ্ডটাকে কেউ যেন সজোরে চেপে ধরেছে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তার ছেলে, তার নিজের রক্ত মাংসের সন্তান! স্বপ্নেও তো এরকম কোনো সম্ভাবনা তার এতদিন মনে আসেনি। আবেগে সারা হৃদয় থরথরিয়ে কেঁপে উঠল নীল বোনারের, দু চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে নীল হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করল—'এইটেই বুঝি তোমার ছেলে, জিস্‌ আক্‌? বাঃ দারুণ ছেলে তো!' তার স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল সে—'বুঝলে কিটি, ছেলেটা বড় হয়ে পাঁচজনের একজন হবে, দেখে নিও তুমি।'

'ঠিকই বলেছ, নীল।' কিটি সায় দিয়ে বলল। তারপর হঠাৎ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'তোমার নাম কি, খোকা?'

জিস্‌ আক্‌-এর ছেলে আর বোনারের মেয়ে—এদের এতক্ষণে খুব ভাব হয়ে গেছিল। মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা জিস্‌ আক্‌-এর ছেলের হাবভাব চলাফেরাও হয়ে উঠেছিল স্বাধীন, পোষ না মানা কোনো বনের প্রাণীর মতোই—সতর্ক, নিঃশব্দ ক্ষিপ্র। রোদে পোড়া, তামাটে ছোট্ট শরীরখানা দেখলে টানটান্‌ সোজা অথচ নমনীয় এক টুক্‌রো বেতের কথাই মনে পড়ে। চক্‌চকে উজ্জ্বল দুই চোখ মেলে স্থিরভাবে কিটির দিকে তাকাল সে, তারপর পরিষ্কার উত্তর দিল—'নীল।'

ওর উত্তর দেওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল—প্রশ্ন এবং উত্তর—দুটোরই আসল মানে সে জানে।

জিস্‌ আক্‌ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'দেখছ, কেমন 'ইনজান' রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় কথা বলছে। আসলে 'ইনজান'রা পট্‌কাকে বলে 'নী-ওল।' আমার ছেলেটা একদম ছোটবেলায় পট্‌কা খুব ভালবাসত, সারাক্ষণই 'নী-ওল', 'নী-ওল' বলে বায়না ধরত। তাই শেষ পর্যন্ত ওর নামই হয়ে গেল 'নী-ওল।'

জিস্‌ আক্‌-এর বানানো কাহিনী শুনে নীল বোনারের বুক থেকে দুশ্চিন্তার

বোঝা নেমে গেল—যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার। সে বুঝতে পারল, জিস্ আক্ তার স্ত্রীকে কিছুই বলেনি, কিছু বুঝতেই দেয় নি। নীল বোনারের সুখী জীবনে যাতে কোনো অশান্তির ছায়া নেমে না আসে, তার জন্য জিস্ আক্ চরম মহত্ত্ব দেখিয়েছে।

কিটি বোনার এবার বেশ আন্তরিক ভাবেই জিজ্ঞেস করল—'আর ছেলেটির বাবা? নিশ্চয়ই সে-ও খুব চমৎকার লোক!'

জিস্ আক্ তার নিখুঁত অভিনয় চালিয়েই গেল। লজ্জাজড়ানো গলায় উত্তর দিল সে—'কি যে বল দিদি। তা, সত্যি কথা বলতে কি ওর বাপ খুব চমৎকার লোকই বটে।'

'নীল, তুমি নিশ্চয়ই লোকটিকে চিনতে?'—কিটি এবার স্বামীকে প্রশ্ন করল। নীল বোনার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'চিনতাম মানে? খুব অন্তরঙ্গভাবে, অতি ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম।' হঠাৎই যেন নীল বোনারের মন উড়ে চলে গেল সুদূর আলাস্কার 'টোয়েণ্টি মাইল্স'-এ—সেই ঊষর, ধূসর জনমানবহীন প্রান্তর, সেই নিঃসঙ্গ, একঘেয়ে দিনযাপন—সবই যেন তার স্মৃতিপটে ভিড় করে এলো। সেই চরম ক্লান্তিকর যন্ত্রণাময় দিনগুলো থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিল এই জিস্ আক্, পাশে থেকে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও বাঁচিয়ে ছিল।

ফিরে গেল জিস্ আক্। বহু কষ্ট সহ্য করে মনভরা বিশ্বাস আর বুকভরা আশা নিয়ে নীল বোনারের কাছে এসে সে দেখল, এতদিন সে মরীচিকার পেছনেই ছুটে চলেছিল। সুখী, সংসারী নীল বোনারের জগতে তার আর তার ছেলের কোনো স্থানই নেই। তবে কৃতজ্ঞ নীল বোনার অবশ্য জিস্ আক্-এর নিঃস্বার্থ নীরব আত্মত্যাগের কথা মনে রেখেছিল,—'টোয়েণ্টি মাইলস'-এ নিজের কাঠের বাড়িতে ফিরে এসে জিস্ আক্ জানতে পারল যে জন টম্পসনকে পি. সি. কোম্পানি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন যে এজেণ্টরা এরপর আসত, তাদের সবাইকেই নির্দেশ দেওয়া থাকত যে 'জিস্ আক্' নামের ভদ্রমহিলাটি আজীবন যত ইচ্ছে জিনিসপত্র ও খাবারদাবার বিনামূল্যে কোম্পানির গুদাম থেকে নিতে পারবেন। শুধু তাই নয়। পি. সি. কোম্পানি, জিস্ আক্‌কে এই জন্য বছরে পাঁচ হাজার ডলার করে পেন্‌সন্-ও দিতে লাগল।

জিস্ আক্-এর ছেলে সাবালক হওয়া মাত্রই ঐ তল্লাটের সবচাইতে সম্মানীয় যেসুইট পাদ্রী 'ফাদার স্যাঁপ্রো' তাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। যেসুইটদের কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ইউরোপে বহুদিন থেকে অবশেষে একদিন আলাস্কায়

ফিরে এলো জিস্ আক্-এর ছেলে। তখন সে হয়ে উঠেছে একজন নামকরা, অতি সম্মানীয় ধর্মযাজক—তখন তাকে সবাই চেনে 'ফাদার নীল' বলেই।

জিস্ আক্ যখন নীল বোনারের সঙ্গে দেখা করে দেশে ফিরে এলো, তখন-ও সে ছিল রূপসী তরুণী, এবং অনেক পুরুষই তার ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল। কিন্তু জিস্ আক্ আর কখনো কোনো দ্বিতীয় পুরুষের দিকে ফিরে তাকায়নি, এবং তার চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা ছাড়া আর কখনো কিছু শোনা যায়নি। 'হোলি ক্রশ্'-এর সন্ন্যাসিনীদের কাছে লেখাপড়া শিখে চিকিৎসা করা আর ওষুধপত্র দেওয়া বেশ ভালভাবেই শিখে নিয়েছিল জিস্ আক্। তারপর 'টোয়েণ্টি মাইল্স্'-এ নীল বোনারের তৈরি করে যাওয়া তার সেই কাঠের বাড়িতে একটা স্কুল আর অতিথিশালা খুলেছিল সে। 'টয়্যাট'দের অল্প বয়সী মেয়েরা সেখানে এসে ওর কাছে লেখাপড়া শিখত, আর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অভিযাত্রী ও পথিকরা সেখানে সব সময়েই পেত দু'দণ্ডের নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর বিশ্রাম। সুদূর উত্তরে সান্ফ্রান্সিস্কোতে কিটি বোনার দেখত যে, তার স্বামী আলাস্কায় শিক্ষাপ্রসারের ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহী, এবং তার জন্য দরাজ হাতে সে অর্থব্যয় করে। কিটি এই নিয়ে মাঝে মাঝে হাসিমুখে তার স্বামীকে একটু অনুযোগ করে বটে, কিন্তু মনে মনে সে তার স্বামীর এই বদান্যতা আর উদারতায় খুবই গর্বিত।

GRIT OF WOMEN

পাস্কুকের প্রেম

তাঁবুর ভেতরে লোকগুলো জ্বলন্ত চুল্লীর পাশে বসেও যেন কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছিল। চুল্লীতে গন্‌গনে আঁচ ; কিন্তু তাতেও তাঁবুর ভেতরটা যেন ঠিকমতো গরম হচ্ছিল না। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে একটা দারুণ শৈত্যপ্রবাহ চলেছে। তাপ মাপার থার্মোমিটারটা শূন্যের নিচে ৬৮ ডিগ্রিতে নেমে ফেটে খারাপ হয়ে গেছে। তার পরেও যেন ঠাণ্ডা বেড়েই চলেছে। এইসব দুর্ধর্ষ পোড়-খাওয়া ভাগ্যান্বেষী লোক-গুলোর কাছেও এতটা ঠাণ্ডা বেশ কষ্টের কারণ হয়ে উঠেছিল। এরকম সময়ে জ্বলন্ত চুল্লীর পাশ ছেড়ে বেশি দূরে যাওয়া একেবারেই ঠিক নয়—হঠাৎ বুকে ঠাণ্ডা বসে গিয়ে আরম্ভ হয়ে যাবে শুক্‌নো খসখসে এক ধরনের মারাত্মক কাশি, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। এইভাবে যে হতভাগ্যের শেষ নিঃশ্বাস পড়বে, তার দেহটাও এখানেই বরফের মধ্যে খোঁড়া একটা গর্তে চিরবিশ্রাম পাবে। আলাস্কায় মেরুবৃত্তের এই 'ক্লনডাইক' অঞ্চল বেঁচে থাকবার জন্য নয়, মরণের কোলে ঢলে পড়বার জন্য সত্যিই এক আদর্শ জায়গা !

চুল্লীটা ছাড়া তাঁবুর মধ্যে আসবাবপত্র বলতে আর বিশেষ কিছুই ছিল না। মেঝের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে পাইন গাছের ডালপালা দিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছে। তার ওপরে চাপানো হয়েছে মোটা লোমের বা 'ফার'-এর কম্বল। বাকি মেঝেটা চামড়া দিয়ে ঢাকা, তার ওপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাপ, প্লেট, কেট্‌লি—এই ধরনের কিছু গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। চুল্লীর ঠিক ওপরে একটুখানি গোল জায়গায় তাঁবুটা শুক্‌নো খট্‌খটে হয়ে আছে। ঐ জায়গাটুকু ঘিরে একটা আধভিজে, আধশুক্‌নো বৃত্ত। তার বাইরে তাঁবুর বাকি ছাদটায় আর দেওয়ালে জমে আছে আধ ইঞ্চি পুরু শুক্‌নো সাদা স্ফটিকের গুঁড়োর মতো তুষার-কণা। জ্বলন্ত চুল্লীর ফুট তিনেক মাত্র দূরেই একটা মস্তবড় কঠিন, শক্ত চারকোণা বরফের চাঁই। দিব্যি একটা টেবিলের কাজ করছে সেটা। প্রায় সব কজন লোকই চুল্লীটাকে ঘিরে বসে আছে। একটু দূরে একজন যুবক লোমের কম্বলের বিছানায় শুয়ে ছিল। সে হঠাৎ দারুণ জোরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় তার

সারা শরীর বেঁকে দুমড়ে বিছানা থেকে অর্ধেক উঠে গিয়ে কাঁপতে আরম্ভ করল। বেট্‌ল্‌স্‌ নামে একজন বয়স্ক, অভিজ্ঞ অভিযাত্রী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'শিগ্‌গির ওকে ধরে ঘোরাও, চাপড় মার। ওর হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে।' সঙ্গে সঙ্গে জনা ছয়েক লোক একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণে যুবককে ঘুরিয়ে থাপ্পড় মেরে ঝাঁকাতে শুরু করল। খানিকক্ষণ পরে যুবকটি সুস্থ হয়ে উঠে বসল। তারপর নিজের মনেই বলে উঠ্‌ল—'চুলোয় যাক্‌ এই হতচ্ছাড়া রাস্তা, এই সর্বনেশে আবহাওয়া। শক্ত সমর্থ জোয়ান বলে আমার একটা নামডাক ছিল। মাইলের পর মাইল আমি দৌড়তে পারি। ভূতের মতো খাটতে পারি। কিন্তু এই অভিশপ্ত জায়গায় এসে পড়ে দেখছি আমার পৌরুষ বলতে আর কিছু থাকল না।' বক্‌বক্‌ করতে করতে ছেলেটা এবার আগুনের পাশে এসে বসে একটা সিগারেট তৈরি করল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল—'আমাকে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ভাববেন না যেন। কিন্তু নিজের অপদার্থতার কথা ভেবে আমার সত্যিই লজ্জা হচ্ছে। আমি কি শহুরে ফুলবাবু নাকি, যে পাঁচ মাইল হেঁটেই মূর্চ্ছা যাব?'

বেট্‌ল্‌স্‌ ওকে সিগারেট ধরানোর একটা কাঠি এগিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'শোন হে ছোক্‌রা! শুধু শুধু হৈ চৈ কর না। প্রথম প্রথম এরকমটা হবেই—নইলে ধাতে আসবে কি করে? এরকম অবস্থায় আমার নিজের কি অবস্থা হয়েছিল, তা আমার এখনো বেশ পরিষ্কার মনে আছে। উঠে দাঁড়াতে গেলেই সারা শরীরের হাড়গুলো একেবারে টন্‌টন্‌ করে উঠত। প্রত্যেকটা গাঁটে গাঁটে এমন খিল ধরে যেত যে তা ছাড়াতে ছাড়াতেই আধঘণ্টা কেটে যেত। তোমার তো বরং বেশ মনের জোর আছে দেখছি। শিগ্‌গিরই পথ চলতে চলতে আমাদের মতো বুড়োকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। তাছাড়া তোমার সব চাইতে সুবিধে হল, তোমার শরীরের গড়ন একেবারে ছিপ্‌ছিপে, পাতলা, হঠাৎ যে মুটিয়ে যাবে তার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। আমরা যে জীবন বেছে নিয়েছি, তাতে কষ্টসহিষ্ণুতা আর সহ্যশক্তিই সব চাইতে বড় কথা আর শেষ কথা। বেশি মোটাসোটা, বড়সড় চেহারার লোকেদের মধ্যে বেশির ভাগ সময়েই এসব গুণগুলো থাকে না। তার চাইতে বরং চিম্‌ড়ে শুক্‌নোপানা লোকগুলোর গোঁ একেবারে যেন কচ্ছপের কামড়ের মতো।'

বেট্‌ল্‌স চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের এক ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গী ওর কথার প্রতিবাদ করে উঠ্‌ল। একটু সৌখিন গোছের লোক বলে সবাই ওকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল 'প্রিন্স।' সে বলল—'কি হে বাপু, তুমি কি এর মধ্যেই অ্যাক্সেল গাণ্ডারসন্‌-এর কথা ভুলে গেলে? ঐ স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ানটার বিশাল ওক্‌ গাছের মতো চেহারা আর

দানবের মতো শক্তি আর কারো মধ্যে দেখেছ কি ? সেও তো মোটাসোটা, প্রকাণ্ড দশাসই চেহারার লোকই ছিল।' বেট্‌ল্‌স এবার 'প্রিন্স'-এর কথায় সায় দিল, 'হ্যাঁ, এক থাটা অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ। তবে ব্যাপার কি জান ? গাণ্ডারসন ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। একেবারে আলাদা জাতের এক মানুষ। তবে তার সঙ্গে গাণ্ডারসন-এর স্ত্রী উংগা-র কথাই বা বলছ না কেন ? ছিপ্‌ছিপে তন্বী এক তরুণী, ফুলের মতো নরম। কিন্তু তার সাহস আর সহ্যশক্তি কি কোনো অংশে তার পুরুষ সঙ্গীর চাইতে কম ছিল ? গাণ্ডারসনের জন্য এমন কোনো কষ্টই নেই যা সে করতে পারত না।'

'প্রিন্স' এবার উত্তর দিল, 'আরে, উংগা যে গাণ্ডারসনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসত। ওর ভালবাসার জেদ-ই ওকে শক্তি যোগাত।'

তাঁবুর অভিযাত্রীদের মধ্যে সব চাইতে অভিজ্ঞ আর প্রবীণ যে লোকটি ছিল, সে-ই রেড ইণ্ডিয়ান দলপতি 'সিট্‌কা চার্লি' খেতে খেতে এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে বলে উঠ্‌ল, 'ওহে বন্ধুরা, তোমাদের অনেক কথাই তো এতক্ষণ ধরে শুনলাম। মোটা লোকের সহ্যশক্তি, মেয়েদের ভালবাসার জেদ, অনেক কিছুই তো তোমরা বলে গেলে। এবার আমি আমার নিজের জীবনের একটা সত্যি ঘটনার কথা তোমাদের বলতে পারি। সে আজ বহুদিনের কথা—আমার বয়স তখন নেহাৎই কম। আমাদের এই মেরু অঞ্চলের তুষার দেশ তখন ছিল একেবারেই নবীন,—এখনকার মতো গাদাগাদি লোকের ভিড় তখন মোটেই ছিল না। সেই সময় একজন বিশালদেহী সাদা চামড়ার লোক আর একটি রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ের সংস্পর্শে আসবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। মেয়েটা দেখতে ছিল একেবারেই ছোটখাটো, নরম গড়নের। কিন্তু তার চাইতে বড় হৃদয়, বেশি মনের জোর আর জেদ আমি আর কখনো কারো মধ্যে দেখিনি।'

সিট্‌কা চার্লি অতীতের স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলতে শুরু করল—'দেখ বন্ধুরা, আমি আসলে রেড ইণ্ডিয়ান সত্যিই। কিন্তু সারা জীবন সাদা চামড়ার লোকেদের সঙ্গে ওঠা বসা করে আমি তোমাদেরই একজন হয়ে গেছি। আমার চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বুদ্ধিও তোমাদের মতোই হয়ে গেছে। তাই আমি যদি কোনো 'রেড ইণ্ডিয়ান'-এর প্রশংসা করি, আর সাদা চামড়ার কোনো লোক সম্বন্ধে নিন্দে করে কিছু বলি, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে ভুল বুঝবে না ?'—উদ্‌গ্রীব শ্রোতারা সবাই একসঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল।

'মেয়েটার নাম ছিল পাসুক। ওদের জাতের লোকেদের কাছ থেকে উচিত দামেই আমি ওকে কিনেছিলাম। মেয়েটার ওপর আমার কোনোরকম টানই ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি মেয়েটা দেখতে কি রকম? তাও বোধহয় কখনো লক্ষ্য করে দেখিনি। মেয়েটাও তার এতদিনকার চেনা পরিবেশ, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকে হঠাৎ আমার মতো একজন অপরিচিত লোকের কাছে এসে পড়ে লজ্জায়, ভয়ে সারাক্ষণ একেবারে জড়োসড়ো হয়ে থাকত, মাটি থেকে চোখ তুলেও তাকাত না। যাক্‌গে, তা নিয়ে আমার অবশ্য কোনোরকম মাথাব্যথা ছিল না। আমার আর কুকুরগুলোর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য, আমার সঙ্গে নৌকার দাঁড় বাইবার জন্য, আমার একজন সঙ্গীর দরকার ছিল। একটা বড় লোমের কম্বলের নিচে দুজনের জায়গাও হয়ে যাবে। তাই আমি পাসুক-কে বেছে নিয়েছিলাম।

'আমি তখন সরকারি চাকরি করতাম। তাই একদিন আমাকে একটা যুদ্ধ জাহাজে চড়ে বসতে হল—সঙ্গে চলল আমার স্লেজগাড়ি, কুকুরের দল, একগাদা শুক্‌নো খাবার, আর পাসুক। শীতকালে 'ম্যাকেঞ্জি' নদীর মোহানায় যেখানে বেরিং সাগর জমে যায়—সেখানে গিয়ে আমরা নামলাম একদিন। আমার সঙ্গে ছিল খুব গোপনীয় মুখ আঁটা একগাদা সরকারি চিঠি, দলিলপত্র, টাকাকড়ি। আর্কটিক দরিয়ায় তিমি ধরা জাহাজগুলোতে ঐসব জিনিস পেঁছে দেওয়াই ছিল আমার কাজ। যাই হোক্‌, শীতকালটা তো জমে থাকা ম্যাকেঞ্জি নদীর ধারে কাটালাম। তারপর গরম পড়তেই নদী পথে চলে এলাম 'ইউকন' অঞ্চলে। অনেকদিন পরে সাদা চামড়ার লোক দেখতে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে 'চল্লিশ মাইলের নদী'র ধারে তাঁবু ফেললাম আমরা। কিন্তু সেবার দেখা দিল দারুণ শৈত্যপ্রবাহ,—আর তার সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চরম খাদ্যাভাব। অনবরত বরফ পড়ে যাতায়াতের রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, স্লেজ নিয়ে এগোবার কোনো উপায়-ই রইল না। আমাদের সম্বল ছিল মাথাপিছু চল্লিশ পাউন্ড ময়দা, আর কুড়ি পাউন্ড শুয়োরের মাংস। নতুন করে খাবার না পাওয়া গেলে তাতে আর কতদিন চলবে? কিন্তু কোনোরকম খাবারই পাওয়া যাচ্ছিল না। আধপেটা খেয়ে খেয়ে আমরা হাড়জিরজিরে, কংকালসার হয়ে গেলাম। বেচারি কুকুরগুলো প্রায় সব সময়েই খিদের জ্বালায় চেঁচাত। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারাও যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একদিন সবাই মিলে প্রায় খালি ভাঁড়ার ঘরে বসে একসঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করলাম যে, এভাবে ইঁদুরের কলে আট্‌কে থেকে মরলে চলবে না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন চলে যাবে সুদূর দক্ষিণে। যেখানে নোনা

জলের সমুদ্র কখনো জমে যায় না। সেখানে 'হেইন্‌স্‌ মিশন'-এ পেঁছে আমাদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে অবিলম্বে এখানকার আট্‌কে পড়া লোকগুলোকে বাঁচাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রায় অসম্ভব এই কাজটির ভার পড়ল আমারই ওপর, কারণ তুষার অঞ্চলের দুঃসাহসী অভিযাত্রী বলে আমার নাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি বললাম—'হ্যাঁ, যেতে আমি রাজি আছি। তবে, 'হেইন্‌স্‌ মিশন' এখান থেকে পাক্কা সাতশো মাইলের রাস্তা,—সেটা মনে আছে তো? আর এই সাতশো মাইলের প্রায় প্রতিটি ইঞ্চি রাস্তাই আমাকে বরফের ওপর দিয়ে পথ কেটে তৈরি করে এগোতে হবে। ঠিক আছে, আমাকে তোমাদের সব থেকে ভাল কুকুরগুলো আর খাবার দাবার দাও। আর হ্যাঁ, পাসুক-ও যাবে আমার সঙ্গে।'

'আমার সহযাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেল। তবে 'লম্বা জেফ্‌' নামে একটা সাদা চামড়ার ইয়াংকি ছেলে আমার সঙ্গে যাবে বলে গোঁ ধরল। ছেলেটা দারুণ স্বাস্থ্যবান আর দশাসই চেহারার—গায়ের পেশীগুলো যেন ফেটে পড়ছে তার। সে তো লম্বা চওড়া কথার একেবারে বান ডাকিয়ে দিল। ও নাকি স্লেজ গাড়ির মধ্যেই জন্মেছে, আর মোষের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। যদি আমি রাস্তার মধ্যে মারা যাই, তাহলে সে-ই 'হেইন্‌স্‌ মিশনে' গিয়ে আমাদের খবর পেঁছে দেবে। আগেই বলেছি, তখন আমার বয়স ছিল খুবই অল্প, শহুরে ইয়াংকিদের সম্বন্ধে আমার কোনোরকম ধারণাই ছিল না। আমি কি করে জানব যে সে হতভাগাগুলো একেবারে রাঙামুলো—খালি বাইরের চেহারাটাই চক্‌চকে, মোটাসোটা আর ভেতরে ফোঁপরা, কুঁড়ের জাহাজ সব?

'যাই হোক, ভাল কুকুর আর খাবারদাবার নিয়ে আমি, পাসুক আর 'লম্বা জেফ' তো আমাদের ভয়াবহ পথে পাড়ি দিলাম। দিনের পর দিন নরম, পেছল বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ চালানোর অভিজ্ঞতা তোমাদের সবারই আছে, কাজে কাজেই সে কাহিনী এখানে বলছি না। কোনো কোনো দিন তিরিশ মাইল চললেও, গড়ে আমরা দিনে দশ মাইলের বেশি এগোতে পারছিলাম না। স্লেজটানা কুকুর-গুলো-ও আদতে মোটেই ভাল ছিল না। প্রথম থেকেই আমাদের খুব কষ্ট করে এগোতে হচ্ছিল। ফলে দুশো মাইল পথ পেরিয়ে 'সাদা নদী' পর্যন্ত পেঁছতেই আমাদের একটা স্লেজ গাড়ি কমে গিয়ে দুটোতে দাঁড়াল। অবশ্য তাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি; যে কুকুরগুলো মারা গেল, সেগুলো তাদের জীবিত সঙ্গীদের-ই পেটে গেল।

যাক্‌, কোনোরকমে 'পেলি'তে তো গিয়ে পেঁছলাম। আমি আশা করেছিলাম যে

এখানে নিশ্চয়ই খাবার দাবার পাওয়া যাবে। তাছাড়া, 'লম্বা জেফ্'-কেও এখানেই রেখে যাব ভেবেছিলাম, কারণ এতদিনে ও আমাদের চলার পথে একটা বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হতভাগা আমাদের কোনো কাজে তো লাগতই না, বরং সারাদিন নিজের কষ্টের কথা বলে হা-হুতাশ করত আর এই ভয়াবহ রাস্তাকে শাপমন্তি দিত। তা, 'পেলি'তে আমরা কোনোরকম খাবারদাবারই জোগাড় করতে পারলাম না। যে কজন লোক তখনো সেখানে টিকে ছিল, দেখলাম যে তাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন, অনেকে শীতকালটা শেষ হওয়ার আগেই মারা যাবে। কাজে কাজেই তাদের কাছ থেকে খাবারদাবার-ই বা চাই কি করে, আর 'লম্বা জেফ'-কেই বা তাদের কাছে রেখে আসি কি করে? তাই, 'পেলি'-তে আর দেরি না করে আবার বেরিয়ে পড়লাম—কারণ তখনো প্রায় পাঁচশো মাইল পথ বাকি। আবহাওয়াও তখন খুব খারাপ চলছিল—সারাটা দিন আমাদের প্রায় অন্ধকারেই চলতে হত। এমনকি ভরদুপুর-বেলাতেও মেরুসূর্যের মুখ দেখা যেত না। আর প্রথমেই যা বলেছিলাম, প্রতিটি ইঞ্চি পথই আমাদের তৈরি করে নিয়ে এগোতে হচ্ছিল। তাই সব সময়েই বরফ সমান করে এগোনোর কাঠের জুতো পরে থাকতে হচ্ছিল। কাঠের জুতোর ঘষা লেগে আমাদের সবারই পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল। তারপর সেগুলো ফেটে গলে গেল। প্রত্যেকদিনই আমাদের পায়ের অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছিল। কারণ, কোনো ফোস্কা তো শুকোচ্ছিলই না, বরং প্রতিদিনই নতুন করে আরো ফোস্কা পড়ছিল। তবে, সব চাইতে বেশি মুস্কিলে পড়লাম 'লম্বা জেফ্'কে নিয়ে। ছোক্‌রা একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি জুড়ে দিল। প্রায়ই ও পা থেকে কাঠের জুতো খুলে ফেলত, আমি বারণ করলেও শুনত না। শুধু কি তাই? সুবিধা পেলেই ও চুপি চুপি স্লেজে চড়ে বসত, আর দুর্বল কুকুরগুলোকে ওর বাড়তি বোঝা বইতে হত। শেষে একদিন বেজায় চটে গিয়ে ওকে আচ্ছাসে চাবুকপেটা করলাম। এরপর থেকে আর ওকে কোনো কাজই করতে দিতাম না। সকাল হলেই ওকে ওর ভাগের খাবারটা খাইয়ে দিয়ে রওনা করে দিতাম। তারপর আমি আর পাসুক তাঁবু গুটিয়ে, জিনিসপত্র বেঁধে, কুকুরগুলোকে স্লেজে জুড়ে অনেকক্ষণ পরে যাত্রা শুরু করতাম। দুপুর বেলাতেই আমরা রাস্তায় ওকে ধরে ফেলে এগিয়ে যেতাম—দেখতাম যে অপদার্থটা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে কোনোরকমে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যেবেলা আমরা যাত্রা শেষ করে আবার তাঁবু খাটিয়ে, আগুন জেবলে, খাওয়া দাওয়া সারতাম। জেফ্-এর জন্যও গরম বিছানা তৈরি করে ওর ভাগের খাবার আলাদা করে রেখে দিতাম। বড় করে তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালিয়ে রাখতাম

যাতে ওর পথ চিনে আসতে কোনো অসুবিধে না হয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে জেফ্ এসে পেঁছিত। এসেই তৈরি খাবার খেতে বসে যেত, তারপর কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে পাতা বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ত। একদিকে যখন এই তাগ্‌ড়া জোয়ানটা আগুনের পাশে শুয়ে বসে কান্নাকাটি করে আর খেয়ে দেয়ে ঘুম দিচ্ছিল, অন্যদিকে তখন পাসুক সারাদিন অক্লান্তভাবে খেটে যাচ্ছিল শব্দহীন যন্ত্রের মতো। এতদিনে আমাদের চোখমুখের যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে আমাদের বাবা মায়েরাও আমাদেরকে চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সকালবেলায় পায়ের যন্ত্রণায় আমার চোখেই জল এসে যেত। কিন্তু পাসুকের মুখে একটি টুঁ শব্দও কখনো কোনোদিন শুনিনি। স্লেজের আগে আগে হেঁটে বরফের মধ্যে রাস্তা তৈরি করা, কুকুরগুলোকে খেতে দেওয়া, আমাদের খাবার ব্যবস্থা করা,—সব কাজই পাসুক মুখ বুজে করে যেত। কেন যে পাসুক আমার জন্য এত কষ্ট করছে, তা আমি কখনো বুঝতে চেষ্টা করিনি। পাসুক আমাদের সব কাজ করবে,—এটাই আমি যেন একটা স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরে নিয়েছিলাম।

'অবশেষে আমরা কোনোরকমে 'তিরিশ মাইলের নদী'র ধারে পেঁছিলাম। নদীটায় ভয়ানক চোরা স্রোতের টান, তার জন্য সেটার জমে যাওয়া বুক ভেতরে ভেতরে একদম ক্ষয়ে গেছিল। এখানে এসে নদী পার হতে গিয়ে আমার অবশিষ্ট কুকুর তিনটে স্লেজসুদ্ধ পাতলা বরফ ভেঙে নদীর স্রোতে পড়ে কোথায় তলিয়ে গেল। এবার আমি বুঝতে পারলাম যে, এভাবে এগোলে আর আমাদের চলবে না। তাই আমি পরের দিন সকালবেলা উঠে আমাদের বাকি খাবারটুকু তিনভাগে ভাগ করে ফেললাম। তার একভাগ জেফ্-কে দিয়ে বললাম যে, আমরা এবার যতদূর সম্ভব হাল্‌কা হয়ে যতটা পারি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাব। আর কারো জন্যে বসে অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই জেফ্ যদি পারে তো আমাদের সঙ্গে সেইভাবে পথ চলুক। এই কথা শুনেই তো জেফ্ তারস্বরে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে আমাকে অনেক কড়া কড়া কথাও শোনাল। অগত্যা আমি আর পাসুক সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলাম। জেফ্ বসেই রইল, কারণ তখুনি চলতে গেলে ও নাকি সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। পাসুক তখন আমাকে বলে উঠ্‌ল—'এ রকম একটা অকর্মণ্য, অক্ষম ধেড়ে খোকার জন্যে এতখানি ভাল খাবার নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না। এর মরে যাওয়াই উচিত।' আমি ওকে অনেক বাধা দিলাম, কিন্তু পাসুক কোনো কথাই শুনল না, এক ঝটকায় হঠাৎ আমার কোমরবন্ধনী থেকে

পিস্তলটা বার করে নিয়ে হতভাগা জেফ্‌কে গুলি করে মেরে ফেলল। কাজটা করে ওর মনে কোনো অনুতাপও হতে দেখলাম না। আমিও মনে মনে স্বীকার করলাম যে অবস্থা অনুযায়ী ও ঠিক কাজই করেছে, নইলে আমরা সবাই মারা পড়তাম। মুখে অবশ্য পাসুককে খুব বকাবকি করলাম।'

এতক্ষণ একটানা কথা বলে বুড়ো চার্লি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। সমস্ত তাঁবুটা চুপচাপ, খালি তাঁবুর বাইরে কুকুরগুলো ঠাণ্ডায় অস্থির হয়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু' একটা কুকুর হঠাৎ তাঁবুর ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাড়া খেয়ে আবার বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই চার্লি আবার তার কাহিনী শুরু করল।

'আমরা তো আবার এগিয়ে চললাম। কয়েকদিন চলার পর পথে একটা রেড ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হল। 'পেলি'র দিকে চলেছে সে। খাবার দাবার তার কাছে কিছুই নেই—গরম জলে চামড়া সেদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে আছে সে। এদিককার পথঘাটও তার একদম অচেনা। 'পেলি' কোন্‌দিকে, সেইটাই খালি সে জানে, আর সেদিকে মুখ করে সে এগিয়ে চলেছে। লোকটা অবশ্য আমাদের কাছে খাবারদাবার চায়নি। পাসুক একবার এই লোকটার দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে লাগল—মনে হল, ও যেন কিরকম একটা দোটানার মধ্যে পড়েছে। আমি ওকে বললাম—'দেখ, লোকটা দারুণ বিপদে পড়েছে। 'পেলি'-তে গিয়েও তো ও একটুক্‌রো খাবার পাবে না। ওকে আমাদের খাবার থেকে খানিকটা দিয়ে দিই, কেমন ?' আমার কথা শুনে পাসুকের চোখদুটোতে খুশির ঝলক খেলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওর মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল—ও উত্তর দিল, 'না। তা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের গন্তব্যস্থানে পেঁছিতে এখনো অনেক দেরি। ভুলে যেওনা, 'চল্লিশ মাইলের নদী'র ধারের যে লোকগুলো আমাদের পাঠিয়েছে, তারা আমাদের ভরসাতেই বসে আছে। মৃত্যু আমাদের জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। সে এই অচেনা লোকটিকেই নিয়ে যাক, আমার নিজের মানুষ চার্লি বেঁচে থাক।' লোকটা চুপ করে 'পেলি'র দিকে চলে গেল,—অসহায়ভাবে দেখলাম, একটা নিঃসঙ্গ লোক নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সেদিন রাতে পাসুক খুব কান্নাকাটি করল। ওকে আগে কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই কাঁদতে দেখিনি, তাই খুব অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাদের এই দুর্গম রাস্তা আর শরীরের যন্ত্রণা বোধহয় এতদিন পরে পাসুককে দুর্বল করে ফেলেছে।

'এরপর থেকে দেখলাম পাসুক হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে। দিনের পর দিন আমরা

দুটি জীবন্ত মৃতদেহের মতো এগিয়ে চললাম। চারদিকের সমস্ত প্রকৃতিকেও মনে হচ্ছিল একটা বিরাট মৃতদেহের মতো—সেখানে কোথাও কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই। পাখি, খরগোস,—কোনোরকম জীবন্ত প্রাণীই আমাদের চোখে পড়ছিল না। নদী, গাছপালা, সবই যেন শুকিয়ে জমে গেছিল। আমরাও যেন কোনো কিছুই দেখতে, শুনতে বা বুঝতে পারছিলাম না,—খালি একটা অন্ধ ঝোঁক যেন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল লক্ষ্যস্থল 'হেইন্‌স্‌ মিশন'-এর দিকে।

'এবার আমাদের খাবার একেবারে ফুরিয়ে এলো। পাসুকও এতদিনে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছিল,—প্রায়ই ও চলতে চলতে টলে পড়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত 'ক্যারিবু ক্রশিং'-এ এসে আর ওর একপা-ও এগোবার ক্ষমতা রইল না। সেদিন সকালে আমরা আর না এগিয়ে বিছানায় লোমের কম্বলের তলায় একসঙ্গে শুয়ে রইলাম। এতদিনে আমি-ও দুনিয়ার হালচাল অনেকটাই বুঝতে পেরেছি,—মেয়েদের সত্যিকারের ভালবাসা যে কি তা-ও বুঝতে শিখেছি। তাই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, আমি আর পাসুক—দু'জনে একসঙ্গেই মৃত্যুকে বরণ করে নেব। তাছাড়া 'হেইন্‌স্‌ মিশন' তখনো আশি মাইল দূরে,—মধ্যিখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অভ্রভেদী 'চিলকুট' পাহাড়। কাজে কাজেই, আর এগোব কি করে? কিন্তু পাসুকের ইচ্ছে ছিল অন্যরকম। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ওর সব দ্বিধা, সংকোচ, ভয় কেটে গেছিল। তাই ও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আস্তে আস্তে ওর মনের গোপনতম সব কথা এতদিন পরে আমাকে সব বলে গেল।

'চার্লি',—দুর্বলভাবে, থেমে থেমে পাসুক বলে চলল—'তুমিই আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ। আমি কখনো তোমার অবাধ্য হইনি। চুপ করে থেকে তোমার সব কথা শুনেছি, সব কাজ করেছি। কখনো আমার কোনো সুবিধে অসুবিধের কথা তোমাকে বলিনি, বাবা মায়ের কাছে কত আদরে ছিলাম, তার গল্পও কখনো তোমার কাছে করিনি। ঠিক বলেছি কিনা, চার্লি?'

'ঠিকই বলেছ, পাসুক', কোনোরকমে উত্তর দিলাম আমি, গলার মধ্যে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠ্‌ছিল, খুব কষ্ট হচ্ছিল। পাসুক আবার শুরু করল—'তুমি যখন প্রথম আমাদের গ্রামে গেলে, তখন আমার দিকে একবার মুখ তুলেও চেয়ে দেখনি। মানুষ যেভাবে কুকুর কেনে, সেভাবেই আমাকেও কিনে নিয়ে বাবা মার কাছ থেকে তুমি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলে। তখন প্রথম প্রথম তোমার ওপর রাগে, ভয়ে আর একটা অজানা আতঙ্কে আমার সারা মন ভরে থাকত। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কখনো নির্দয় ব্যবহার করনি। একজন ভাল, ভদ্র স্বভাবের

মানুষের যেমন তার পোষা কুকুরগুলোর ওপর দয়ামায়া থাকে, আমার প্রতি তোমার মনোভাবও ঠিক সেই রকম ছিল। সব সময় তুমি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই করতে। তবে, তোমার মন আর হৃদয় ছিল এই মেরু অঞ্চলের মতই হিমশীতল,—সেখানে আমার জন্য কোনোরকম জায়গা ছিল না। কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে দেখতে পেলাম, তুমি যেমন সাহসী, তেমনি বীর আর বুদ্ধিমান। কোনোরকম কঠিন কাজ, দুঃসাহসিক অভিযান-ই তোমার অসাধ্য নয়। অন্য লোকেদের সঙ্গে তোমার তুলনা করে দেখতাম, তুমি তাদের সবার চাইতে ওপরে। সবাই তোমাকে সম্মান করে, বিশ্বাস করে। তোমার নাম সবারই মুখে মুখে ফেরে। এসব যত দেখতাম, তত আমার মন গর্বে ভরে উঠত। শেষ পর্যন্ত এমন হল, তুমিই আমার সমস্ত হৃদয় মন অধিকার করে বসলে। আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা তোমাকে ঘিরেই ঘুরপাক খেতে লাগল। মধ্যাহ্ন সূর্য যেমন সারা আকাশ জুড়ে থাকে, তেমনি আমার চোখের সামনেও তুমিই সবখানি জায়গা জুড়ে জ্বলতে লাগলে। তবে আমি একতরফা ভাবেই তোমাকে আমার মনের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম। আগেই বলেছি, তোমার মনে আমার জন্য কোনো জায়গাই ছিল না।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলে পাসুক দম নেবার জন্য থামল। আমি ধরা গলায় ওকে বললাম—'পাসুক, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। সত্যিই প্রথম প্রথম আমার হৃদয় বরফের মতোই ঠাণ্ডা ছিল। কোনোরকম উষ্ণ অনুভূতিই সেখানে ছিল না। কিন্তু এখন আমি বদ্‌লে গেছি, পাসুক। শীতকাল চলে গিয়ে যখন বসন্ত আসে, সূর্য আলো ছড়ায়,—প্রকৃতির বুকে তখন দেখা দেয় নতুন জীবনের সমারোহ। গাছে গাছে নতুন করে সবুজ পাতা গজায়,—তারা ফুলে ফলে ভরে ওঠে। পাখিরা গান গেয়ে ওঠে, নদীগুলোতে আসে নতুন স্রোতের জোয়ার। আমার মনেও এখন এসেছে সেইরকম ভরা বসন্ত,—কারণ, পাসুক, মেয়েদের প্রেম কি জিনিস, তা 'এখন আমি বুঝতে পেরেছি।'

আমার কথা শুনে পাসুক ক্ষীণভাবে একটু হাসল। তারপর আমার একেবারে কাছে সরে এসে আমার বুকে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে রইল। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর ও খুব নীচু স্বরে বলে উঠল—'এবার আমি সত্যিই সুখী। কিন্তু চার্লি, আমার পথ এখানেই শেষ হল। তবে, বিদায় নেওয়ার আগে তোমাকে আরো একটা কথা জানিয়ে যাই। খুব ছোটবেলায় একদিন আমি বাড়ির উঠোনে একলা বসে খেলা করছিলাম—বাড়িতে আর কেউ ছিল না তখন। সদ্য ঘুম ভাঙা ক্ষুধার্ত একটা প্রকাণ্ড ভালুক উঠোনে ঢুকে পড়ে আমাকে ধরতে এসেছিল। আমার চীৎকার

শুনে দূর থেকে আমার ভাই দৌড়ে এসে উনুনের জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে নির্ভয়ে ভালুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাড়ির স্লেজটানা কুকুরগুলোও যোগ দিয়েছিল তার সঙ্গে। প্রচণ্ড লড়াই-এর পর ভালুকটা মারা পড়েছিল বটে, কিন্তু আমার ভাইয়ের হাতের দুটো আঙুল-ও সে কামড়ে কেটে নিয়েছিল। ওর সারা মুখ-ও ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছিল। কয়েকদিন আগে রাস্তার মধ্যে একজন রেড ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল,—সেটা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই ? লোকটা 'পেলি'র দিকে যাচ্ছিল। হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে, লোকটার সারা মুখে কাটা-ছেঁড়ার দাগ ছিল, ডানহাতের দুটো আঙুলও ছিল না। হ্যাঁ, ওই লোকটাই আমার সেই ভাই, আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই। কিন্তু তাকেও আমি তোমার জন্য বিদায় করে দিয়েছি। বেচারি ভাইটা আমার একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে নিশ্চিত মরণের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।……'

সিট্‌কা চার্লির মতো কঠোর হৃদয় পোড়খাওয়া রেড ইণ্ডিয়ানের চোখেও দুফোঁটা জল দেখা দিল। একটুখানি চুপ করে থেকে ধরা গলায় বলে উঠ্‌ল সে—'বুঝলে, বন্ধুরা, এই ছিল পাসুকের প্রেম। যে লোকটা তাকে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে কঠিন, দুর্গম তুষার প্রান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল, যার জন্য শেষ পর্যন্ত পাসুককে প্রাণ দিতে হল, তাকে-ই বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মেয়েটা শেষ পর্যন্ত নিজের ভাইকেও অস্বীকার করল। শুধু ভাইকে নয়, নিজেকেও সে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেনি। মারা যাওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে সে কাঁপা কাঁপা, দুর্বল হাতদুটিকে দিয়ে আমার হাতখানাকে অতি কষ্টে তার কোমরের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে ওর গায়ের চাদরের নিচে কোমরের সঙ্গে শুক্‌নো খাবারে ভর্তি একটা থলি ও লুকিয়ে রেখেছিল! এবার আমি বুঝতে পারলাম, কেন পাসুকের শরীরের এই অবস্থা হয়েছে। প্রত্যেকদিন নিজে আধপেটা খেয়ে বাকি খাবারটুকু ও আমার জন্য সরিয়ে রেখেছে। থলিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে পাসুক বলল—'আমি তো চল্‌লাম। কিন্তু, চার্লি, তোমাকে এখনো বহুদূর যেতে হবে। চিলকূট পাহাড় পেরিয়ে তুমি 'হেইন্‌স্‌ মিশন'-এ পৌঁছবে। তারপরেও তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে বহু সম্মান আর খ্যাতি। অনেক সুন্দরী নারীও আসবে তোমার জীবনে। কিন্তু মনে রেখ, পাসুকের চাইতে কেউ তোমাকে বেশি ভালবাসতে পারবে না।'—ওর কথা শুনে আমার মতো লোকেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। খাবারের থলিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লাম—'চাইনা, এ আমি চাইনা, পাসুক। আমার পথও তোমার সঙ্গে এখানেই শেষ হোক।'

'আমার কথা শুনে পাসুকের ক্লান্ত চোখদুটি জলে ভরে উঠল। কোনোরকমে মাথাটা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ও হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'ছিঃ, চার্লি। তুমি সব সময়েই সবার কাছে মাথা উঁচু করে চলেছ, কখনো কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দাওনি। সে সব কি তুমি ভুলে গেলে? তুমি কি ভুলে গেলে যে তোমার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে 'চল্লিশ মাইলের নদী'র ধারে তোমার সহযাত্রীরা পথ চেয়ে বসে মৃত্যুর দিন গুনছে? তারা কি নিজেদের মুখের গ্রাস, ভাল ভাল কুকুর তোমার হাতে সঁপে দেয়নি? তোমার ওপরেই তাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে,—আর তারা জানে যে তুমি তাদেরকে বাঁচাবেই। তোমার এই সম্মান, তোমার ওপর লোকের এই বিশ্বাস, —এটাই আমার গর্ব। শেষ সময়েও আমাকে আমার এই গর্বটুকু নিয়েই মরতে দাও।'

'আস্তে আস্তে আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে পাসুকের দেহটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বরফের মধ্যে ওকে শেষ শয্যায় শুইয়ে দিলাম। তারপর ওর দেওয়া খাবারের থলিটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে পড়লাম। যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম—সব সময়েই আমার মনে হত, পাসুক যেন হাত ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চলতে চলতে যখন রাস্তার মধ্যে পড়ে যেতাম, তখন পাসুক-ই যেন আমাকে টেনে তুলে নিত। যখন ঘুমিয়ে পড়তাম, তখন-ও পাসুক-ই যেন আমাকে জাগিয়ে দিত! প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে যখন রাস্তা হারিয়ে ফেলতাম, তখন পাসুক-ই যেন আমাকে আবার ঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনত। এইভাবে পাগলের মতো চলতে চলতে, মাতালের মতো টলতে টলতে, অবশেষে একদিন 'হেইন্‌স্‌ মিশন'-এ এসে পৌঁছলাম।'

বুড়ো সিট্‌কা চার্লি এবার চুপ করে গেল। তার কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। তাঁবুর দরজাটা তুলে ধরল সে। বাইরে পরিষ্কার দিনের আলো কঠিন বরফের ওপর পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। একটা কুকুর আকাশের দিকে নাক তুলে একটানা চীৎকার শুরু করে দিল।

THE SEA WOLF

সমুদ্র নেকড়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই কাহিনী যে কি ভাবে, কোন্ জায়গা থেকে শুরু করব—সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এক এক সময় অবশ্য আমার মনে হয় যে বন্ধুবর চার্লি ফুরুসেথই সব কিছুর জন্য দায়ী। 'তামালপেই' পাহাড়ের ছায়াতে ওর যে বিশ্রাম কুটিরখানা আছে, ফিরছিলাম সেখান থেকেই। 'মার্টিনেজ' নামে নতুন, ঝক্‌ঝকে স্টিমারটার ওপরের ডেকে আরাম করে বসে 'সানফ্রান্সিস্‌কো' উপসাগরের ঘন কুয়াশার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এরকম গভীর, দুর্ভেদ্য কুয়াশা আমি আগে কখনো দেখিনি—মনে হচ্ছিল যেন ছুরি দিয়ে তা কেটে আনা যায়। মনটা খুব খুশি ছিল, কারণ এইমাত্র দেখে এসেছি যে এক ভদ্রলোক তাঁর কেবিনে বসে এই সংখ্যার 'আটলাণ্টিক' পত্রিকায় আমারই লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ছেন—প্রবন্ধটার বিষয়বস্তু ঃ 'আমেরিকান সাহিত্যে এডগার অ্যালান পো-র অবদান।'

বসে বসে একমনে আমার পরের লেখাটা নিয়ে ভাবছি, এমন সময় লালমুখো এক ভদ্রলোক ডেকে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকের চালচলন, কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে ওঁর জীবনটা কেটেছে সমুদ্রের ওপরেই। এক দৃষ্টিতে ঘন, সূচিভেদ্য কুয়াশার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উনি বলে উঠলেন—'এই ধরনের জঘন্য আবহাওয়া-ই স্টিমারের 'পাইলট'দের চুল অকালে পাকিয়ে দেয়, বুঝলেন মশাই?' আমি উত্তর দিলাম—'কেন? কি এমন কঠিন কাজটা করতে হচ্ছে ওদের? হাতের কাছে 'কম্পাস' তো আছেই! তাছাড়া, স্টিমারের গতি, গন্তব্যস্থলের দূরত্ব, আবহাওয়া—সবই তাদের জানা আছে। গোটা ব্যাপারটা তো অঙ্ক কষার মতোই সহজ!'

আগন্তুক ভদ্রলোক তো আমার কথা শুনে চটে লাল হয়ে গেলেন। প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলেন তিনি—'ও, অঙ্ক কষার মতোই সহজ ব্যাপার, তাই না? ঠিক আছে, বলুন তো এখন স্রোতের গতি কত? ভাঁটার টান-ই বা কতখানি? আর ঐ যে, ঐ যে, শুনুন, সামনেই একটা ঘণ্টা বাঁধা 'বয়া'—ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? এই ঘন কুয়াশায় আমরা প্রায় সেটার ওপর চলে এসেছি। ঐ যে, আমাদের স্টিমার এখন

তাড়াতাড়ি পথ পালটিয়ে সেটার পাশ কাটাচ্ছে। সবটাই অঙ্ক, তাই না?'

সত্যি সত্যি টের পেলাম, আমাদের স্টিমারটা হঠাৎ একবার একটা বাঁক খেয়েই আবার সোজা পথে চলতে লাগল। ঠিক সামনেই কোথায় যেন একটা ঘণ্টা বেজে যাচ্ছিল, সেই আওয়াজটাও একপাশে সরে গেল। লালমুখো ভদ্রলোক কিন্তু বলেই চললেন—'ঐ যে, আবার শুনুন! একেবারে সামনেই একটা 'স্কুনার' এসে পড়েছিল, এবার তাড়াতাড়ি সরে পড়ছে। আরে, আরে, এটা আবার কি? দেখেছেন কাণ্ডটা, একটা খুদে 'লঞ্চ' একেবারে আমাদের স্টিমারটার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। আমাদের স্টিমারটা হঠাৎ থেমে গেল। লঞ্চটা বেঁচে গেল, কোনোরকমে প্রাণপণে এখন হুইস্‌ল দিতে দিতে পালাচ্ছে। এই সব লাঞ্চগুলোকে জলে ডুবিয়ে দেওয়াই উচিত—কোনোরকম নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে বড় বড় স্টিমারগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে, আর বিপদে পড়লে পরিত্রাহি হুইস্‌ল্‌ বাজাবে—যেন ওদের বাঁচিয়ে রাখার সব দায়িত্ব অন্যদের হাতে। যত্তো সব হতভাগা বোম্বেটের দল!'

ভদ্রলোকের বাক্যস্রোতে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। তবে, চোখে কিছু দেখতে না পেলেও ঘন কুয়াশার মধ্যে থেকে ভেসে আসা নানারকম আওয়াজ থেকে ওঁর সব কথাগুলোই যে ঠিক—সেটা বেশ ভালই বুঝতে পারছিলাম। অবশ্য, গভীর কুয়াশার এই রহস্যময় আবরণটাই আমার মনকে অভিভূত করে ফেলেছিল বেশি—তাই ওঁর কথাগুলো শুনতে শুনতেও গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছিলাম। হঠাৎ ওঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল—'আরে কি সর্বনাশ! আমাদের মতোই আর একটা স্টিমার সোজা আমাদের দিকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। আমাদের স্টিমারের ভোঁ শুনতে পাচ্ছে না, কারণ হাওয়া উল্‌টো দিক থেকে বইছে। আমাদের 'পাইলট'-ও খুব চিন্তায় পড়ে গেছে।...'

আমার মাথার ঠিক ওপরেই ছিল 'পাইলট'-এর কেবিন। পাইলট সাহেব দেখি খুব চিন্তান্বিত ভাবে মুখ বাড়িয়ে ঘন কুয়াশার মধ্যেই কি যেন দেখবার চেষ্টা করছেন। এমন সময় খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। ঘন কুয়াশার পর্দাখানা হঠাৎ দু ফাঁক হয়ে গেল,—আর তার মধ্যে থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে আমাদের একেবারে সামনে এসে হাজির হল একখানা স্টিমার। লালমুখো ভদ্রলোক এবার খুব শান্তভাবে বলে উঠলেন—'শিগগির কিছু একটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন, আর মেয়েদের চিল চীৎকার শোনার জন্য তৈরি থাকুন।'—ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই দুই স্টিমারে মুখোমুখি প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা লাগল, আর আমাদের স্টিমার-খানা একদিকে অনেকখানি কাৎ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে যেন একটা

নারকীয় তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল—জিনিসপত্র ছিট্‌কে পড়ে ভাঙার আওয়াজ, যাত্রীদের ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি মেয়েদের কান্না—সব মিলিয়ে একটা চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে গেল। বিশেষতঃ কিছু কিছু মহিলার একটানা, তীক্ষ্ন চীৎকার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। 'লাইফ জ্যাকেট'-টা কেনোরকমে গায়ে গলিয়ে নিয়ে নিচের 'ডেকে' নেমে এলাম। যে দৃশ্য এখানে চোখে পড়ল, তা যেমন মর্মান্তিক, তেমনিকরুণ। মায়েরা তাদের বাচ্চাগুলোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ভগবানের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে কাঁদছে, আর পুরুষরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। কয়েকজন আবার তারই মধ্যে নিজেদের দামী জিনিসপত্র সামলানোর চেষ্টা করছে, যেন সেগুলো বাঁচালেই নিজেদের প্রাণ বাঁচবে। স্টিমারে তখন হু হু করে জল উঠছিল। অনেক যাত্রী-ই দিশাহারা হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। হঠাৎ একটা ভিড়ের ঢেউ এসে আমাকে মারল এক ধাক্কা, আর আমি টাল সামলাতে না পেরে সোজা জলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল যেন আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল—অসহ্য, কনকনে পড়লাম। ঠাণ্ডা জল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম আমি। বহুদূর থেকে যেন একটা অস্পষ্ট সম্মিলিত চিৎকার কানে ভেসে এলো —বুঝতে পারলাম যে 'মার্টিনেজ' তার সমস্ত যাত্রী নিয়ে তলিয়ে গেল। তারপর একসময়ে ধীরে ধীরে আমার চেতনা হারিয়ে গেল।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম জানিনা। হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলাম, চারদিকে উত্তাল জলরাশি, তার মাঝে আমি একা ভেসে চলেছি। চরম আতঙ্কে চেঁচাতে আর হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল জানি না। হঠাৎ দেখি, একটা বড় জাহাজ প্রায় আমার গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে আমার গলা একদম ভেঙে গেছিল, কাজেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। জাহাজটা আস্তে আস্তে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল, আর আমার অসহায় দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল জাহাজের 'হুইলে' দাঁড়িয়ে থাকা পাইলটের মুখটা। তার পাশে আর একজন লোক চুরুট খেতে খেতে অলস দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে গেল জলে ভাসমান আমার দিকে। প্রথমটায় আমি ভেবেছিলাম লোকটা বোধ হয় আমাকে দেখতেই পাবে না। কিন্তু জীবনমরণের এই সন্ধিক্ষণে হঠাৎ-ই ভাগ্যদেবী আমার ওপর একটু করুণা করলেন,—লোকটির সঙ্গে আমার সোজা চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি একলাফে জাহাজের 'হুইল'টা নিজের হাতে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগল, আর চিৎকার করে অন্য সব লোকদের যেন কি সব আদেশ দিতে থাকল। জাহাজখানা যেন লাফ দিয়ে পাশের দিকে সরে

গেল, তারপর আস্তে আস্তে থেমে যেতে লাগল। একটু পরে টের পেলাম, ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় বেয়ে একটা নৌকা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—'কি হে, সাড়া দিচ্ছ না কেন?' চেঁচিয়ে উত্তর দিতে গেলাম, কিন্তু গলায় আওয়াজ ফুটল না। আনন্দের উত্তেজনায় ধীরে ধীরে আমি আবার তলিয়ে গেলাম গভীর সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এবার যখন আমার জ্ঞান ফিরল, তখন প্রথমটায় আমি বুঝেই উঠতে পারছিলাম না যে আমি কোথায় আছি, আমার কি হয়েছে। ঘোরের মধ্যে মনে হচ্ছিল, আমি যেন প্রচণ্ড বেগে দুলতে দুলতে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছি। আর আমার বুক দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে। আস্তে আস্তে বোধশক্তি ফিরে এলো আমার। চোখ খুলে দেখলাম যে আমি একটা জাহাজের যাচ্ছেতাই রকমের নোংরা একটা রান্নাঘরের টেবিলে শুয়ে আছি। দুলুনিটা আর কিছুই নয়, চলন্ত জাহাজের গতির ছন্দ। আমার বুক দিয়ে কেন আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে সেটাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম। একটা গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার নাবিক প্রাণপণে আমার বুক ডলে দিচ্ছে আর সেই রাম দুলুনির ঠেলায় আমার সমস্ত বুক ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়েলি চেহারার লোক। পোশাক দেখে বুঝলাম, লোকটা জাহাজের রাঁধুনি। আমাকে চোখ খুলতে দেখেই সে নাকী সুরে বলে উঠল 'এই জোহানসন, থাম এবার! ভদ্রলোকের তো একেবারে রক্তারক্তি অবস্থা করে ছেড়েছ!' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটা খোসামুদে হাসি হেসে বলল—'স্যার, এখন ভাল লাগছে তো? দাঁড়ান, আপনাকে আমার শুক্‌নো জামাকাপড় এনে দিচ্ছি, আর আপনার পোশাকগুলো শুকোনোর বন্দোবস্ত করছি।' লোকটার হাবভাব কথাবার্তা শুনে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, পুরুষানুক্রমে এরা হোটেলে বা জাহাজে 'জোহুজুর' বেয়ারা বা রাঁধুনির কাজ করে এসেছে, আর সুযোগ পেলে এক্ষুনি বোধহয় আমার কাছেও এই লোকটা 'টিপ্‌স্' চেয়ে বসবে। যে জামাকাপড়-গুলো আমাকে পরতে এনে দিল, সেগুলো গায়ে দিতে গিয়ে তো আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। মোটা খসখসে উলের একটা সোয়েটার, আর যতদূর সম্ভব নোংরা, দাগ লাগা একটা সুতির শার্ট, তার কলারটা আবার ছেঁড়া। ট্রাউজারটার একটা পা অন্যটার চাইতে অন্ততঃ দশ ইঞ্চি ছোট। যাই হোক, নিরুপায় হয়ে সেগুলোকেই

পরে ফেলে রাঁধুনিটিকে বললাম 'অনেক ধন্যবাদ ভাই। তোমার কথা মনে থাকবে। তা, তোমার নামটি কি?' লোকটা আবার একগাল তৈলাক্ত হাসি হেসে বলল—'অধীনের নাম টমাস মাগ্রিজ, স্যার। হেঁ হেঁ, আপাততঃ এই পোশাক পরেই কাজ চালান, কি আর করবেন বলুন।'

নোংরা রান্নাঘরের দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে এবার বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি ভেবেছিলাম যেভাবে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছি, তাতে জাহাজের অন্যান্য লোকেরা আমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই একটু কৌতূহল দেখাবে। কিন্তু বেশ একটু হতাশভাবেই দেখলাম কেউ আমাকে কোনো পাত্তাই দিল না। বরং ডেকের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটা বিশালদেহী নাবিককে ঘিরেই দেখলাম সবার আগ্রহ। লোকটার চোখদুটো বোজা, চওড়া বুকখানা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে লোকটা অনবরত ছট্‌ফট্‌ করছে। আর একজন নাবিক তার গায়ে বালতি বালতি জল ঢেলে চলেছে। যে লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে এ যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম, সে লোকটি খুব উত্তেজিতভাবে ডেকের ওপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, মুখে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত চুরুট। লোকটার হাবভাব, চলাফেরা আর বলিষ্ঠ, পেশীবহুল শরীর থেকে যেন বন্য, আদিম একটা শক্তির আভাস ফুটে বেরোচ্ছিল। ওকে দেখে আরো মনে হচ্ছিল শুধু বাইরের শক্তি-ই নয় ওর ভেতরেও যেন একটা অফুরন্ত অদম্য প্রাণশক্তি লুকিয়ে আছে,—যে কোনো মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝড়ের মতো তা বেরিয়ে আসতে পারে। একটু পরেই জানতে পারলাম, লারসেন নামের এই লোকটিই এই জাহাজের ক্যাপটেন, এবং 'উলফ্‌' বা নেক্‌ড়ে লারসেন নামেই সে পরিচিত। নামটার মধ্যে একবিন্দুও অতিরঞ্জন ছিল না। ওকে দেখলে বুনো নেকড়ের কথাই আগে মনে পড়বে।

ডেকে শোওয়ানো নাবিকটার সারা শরীরে এতক্ষণে খিঁচুনি আর কাপুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বারকয়েক খিঁচুনির পরেই ওর মাথাটা একদিকে হেলে পড়ল, আর হাত-পাগুলো শক্ত হয়ে উঠেই নেতিয়ে পড়ল। শেষবারের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তার পরেই তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, ও যেন সবাইকে প্রাণভরে মুখ ভেঙাচ্ছে।

ক্যাপটেন 'উলফ' লারসেন এতক্ষণ একমনে মুমূর্ষু লোকটার শেষ মুহূর্তগুলো লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। লোকটা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল—ওর মুখ দিয়ে অনর্গল ভাবে বেরিয়ে আসতে লাগল সাংঘাতিকতম সব শপথবাক্য। প্রতিটি শপথবাক্যকেই মনে হচ্ছিল যেন এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গালাগালি ও

শাপশাপান্তর ভাষা যে এরকম তীব্র, জোরাল হতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার এতদিন ছিল না। জোহানসেন নামের নাবিকটির সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে মৃত লোকটিই ছিল 'ঘোষ্ট' বা 'অশরীরী' নামের এই জাহাজটার 'মেট'। তা, এই মেট হতভাগা সানফ্রান্সিসকো বন্দরে স্ফূর্তি করতে নেমে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি, মাত্রাছাড়া পানভোজন করতে গিয়ে এই বিপদ ঘটিয়েছে। যাত্রার ঠিক শুরুতেই এইভাবে লোক কমে যাওয়াতে 'নেকড়ে' লারসেন এত ক্ষেপে গিয়েছে। যাই হোক, খানিকক্ষণ পরে লারসেন একটু শান্ত হয়ে হুকুম দিল, মৃতদেহটা চট দিয়ে মুড়ে দুপায়ে ভারি কয়লার বস্তা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল-ও হয়ে গেল,—গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল হতভাগ্য মেটের দেহ।

এবার আমি ক্যাপটেনের মুখোমুখি হলাম। কোনোরকম আজেবাজে ভণিতা না করে প্রথমেই ওকে অনুরোধ জানালাম—'ক্যাপটেন সাহেব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবার আমাকে একটু কোথাও নামিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিন দয়া করে। তার জন্য অবশ্য আপনাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেব।'

লারসেন কিন্তু আমার প্রস্তাবের কোনো গুরুত্বই দিল না। বরং এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন সে কোনো অদ্ভুত জীব দেখছে। ওর চোখেমুখে একটা চাপা বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে গেল। তারপর বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল—'ওহে, জীবনে যে নিজে খেটে খাওনি, বাপের পয়সায় ফুটুনি করে যে বেড়াও, সেটাতো তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। এবার আমি যা বলছি শোন। দেখতেই তো পেলে যে আমার জাহাজের 'মেট' মারা গিয়েছে। তার জায়গা নেবে একজন নাবিক, নাবিকের জায়গা নেবে আমাদের 'কেবিন বয়'। আমি বলছি কি, তুমি বরং এই 'কেবিন বয়ের' চাকরিটা নিয়ে নাও। মাসে কুড়ি ডলার মাইনে পাবে, এ ছাড়া দুবেলা খাওয়া দাওয়া তো আছেই। এতদিন পর্যন্ত তো অন্যের ওপর ভর করেই জীবনটা কাটালে, এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখো, কেমন?'

লারসেনের কথাগুলো অবশ্য আমার কানেই গেল না। আমার চোখে পড়ল, আমাদের জাহাজের খুব কাছ দিয়েই একটা জাহাজ ঠিক উল্টোদিকে—অর্থাৎ আমার গন্তব্যস্থল সানফ্রান্সিসকোর দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি দৌড়ে এসে ডেকের রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে অনেক ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু ঐ জাহাজ থেকে কোনো সাড়াই পেলাম না। হতাশায় ভেঙে পড়ে ডেকের ভেতরে ফিরে এসে লারসেনকে আর একবার বলতে গেলাম—'দেখুন, যদি হাজার ডলার নিয়েও আমাকে তীরে পৌঁছে দেন'—

কিন্তু আমার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে লারসেন বলে উঠল—'ওহে, থাম তো এবার! আর প্যান্‌প্যান কোর না। বলি ভালয় ভালয় এখুনি 'কেবিন বয়ের' কাজকর্ম বুঝে নেবে, না তোমাকে ঢিট্‌ করার জন্য আমাকে হাত লাগাতে হবে?' ওর ভাবভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, আমার সামনে এখন আর কোনো পথ নেই। হয় ওর কথা শুনতে হবে, নয়তো ওর কাছে বেদম ঠ্যাঙানি খেতে হবে। অগত্যা রাজি হতেই হল আমাকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ডাঙার নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবন থেকে উপড়ে এসে আমি পড়লাম সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে। সানফ্রান্সিস্‌কো ক্রমশই দূরে সরে যেতে লাগল, আর আমি প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'দি ঘোস্ট' জাহাজের ক্যাপটেন 'নেকড়ে' লারসেনের কাছে শুরু হল আমার দুঃস্বপ্নের জীবন। জাহাজে ওঠবার সময় 'মাগ্রিজ' নামের যে রাঁধুনিটা আমার শুশ্রূষা করেছিল, সে-ই হল আমার নতুন মনিব। যতখানি খাতির তখন সে আমাকে করেছিল, এখন ঠিক তার উল্টো ব্যবহার সে আমার সঙ্গে করতে লাগল। একদিনেই আমার জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলল সে। আমি যে আগে কখনো 'কেবিন বয়ে'র কাজ করিনি, এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা—এ ব্যাপারটা সে বুঝতেই চাইল না। প্রতিটি মুহূর্তে আমার কাজে খুঁত ধরে, গালাগাল দিয়ে সে তার কর্তৃত্ব জাহির করে যেতে লাগল। তার ওপর প্রথম দিনেই আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হল যে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম সমুদ্রের জীবনটা কত কঠোর। আমি এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে এক প্লেট 'টোস্ট' নিয়ে রান্নাঘর থেকে 'কেবিনে' যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা 'সামাল, সামাল' রবে চমকে উঠে দেখি, জাহাজের থেকে অনেক উঁচু একটা ঢেউ এসে ডেকের ওপর আছড়ে পড়তে যাচ্ছে, আর আমি ঠিক তার নিচেই দাঁড়িয়ে আছি। লারসেন দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল—'আরে, এই মাথামোটা, হতভাগা রামছাগল 'হাম্প', শিগগির কিছু একটা আঁকড়িয়ে ধর!' কিন্তু কোনো কিছু বুঝে ওঠবার আগেই ঢেউটা এসে আমার ওপর ভেঙে পড়ল, আর আমি ইঁদুরছানার মতো সেই নোনা জলে নাকানি চোবানি খেতে খেতে ডেকের চারদিকে গড়াগড়ি যেতে লাগলাম। হঠাৎ কাঠের একটা কিছুতে ডান হাঁটুটা এমন জোরে ঠুকে গেল যে আমার মনে হল সেটা বোধহয় ভেঙেই গেল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই জলটা সরে গেল,

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দেখি, আমার ডান মালাইচাকিটা ফুলে একেবারে ঠেলে উঠেছে,—পা-টা ঠিকমতো ফেলতেই পারছি না। কিন্তু ওই অবস্থায় আমাকে কেউ-ই কোনোরকম সহানুভূতি দেখাল না—বরং আমার রাঁধুনি মনিব আমাকে 'অপদার্থ, তালকানা'—ইত্যাদি নানারকম আখ্যা দিয়ে গালাগালের একেবারে ঝড় বইয়ে দিল। এছাড়াও আমার 'হাম্প' নামটা সারা জাহাজে এমনভাবে চাউর হয়ে গেল যে আমার মনে হতে লাগল যে সত্যি সত্যি বোধহয় 'হাম্প' আমার আসল নাম। পায়ের এই ভয়াবহ অবস্থা নিয়েই সারাদিন ধরে আমাকে কাজ করে যেতে হল। পায়ের ওই চোট নিয়ে কেউ কোনোরকম মাথাই ঘামাল না। খালি লারসেন একবার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে উঠল—'এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। কয়েক-দিন হয়ত একটু খুঁড়িয়ে হাঁটবে, কিন্তু এর ফলে নিজে একটু স্বাবলম্বী হয়ে হাঁটাচলা করতে শিখবে। কি, আমার কথাগুলো স্ববিরোধী 'প্যারাডক্সের' মতো মনে হচ্ছে, তাই না?'

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম 'হ্যাঁ, স্যার।' আমার উত্তর শুনে লারসেন বেশ খুশি মনেই বলে উঠল—'বাঃ! তোমার সাহিত্য টাহিত্য সম্বন্ধে বেশ ভালই জ্ঞান আছে, তাই না? ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।'—কথাগুলো বলে আমাকে কোনোরকম উত্তর দেওয়ারই সুযোগ না দিয়ে লারসেন ডেকের দিকে চলে গেল।

রাতে আমার শোয়ার জায়গা হল 'ফোকসালে', সীল শিকারিদের ঘরেই একটা খালি বাঙ্কে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এতক্ষণ ধরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে ভিজে আর ভেজা জামাকাপড়ে থেকেও কিন্তু আমার একটুও সর্দি হল না, ঠাণ্ডাও লাগল না। কিন্তু হাঁটুর যন্ত্রণায় যেন একেবারে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। বাড়িতে থাকলে তো এতক্ষণে চিৎকার চেঁচামেচি করে সবাইকে একেবারে তটস্থ করে তুলতাম; কিন্তু এখানকার এই আদিম পরিবেশে সবকিছু সহ্য করে যাওয়াটাই যে নিয়ম, সেটা এতক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম। জাহাজের নাবিকরা আমার যন্ত্রণা নিয়ে যেমন মাথা ঘামায়নি, তেমনি নিজেদের মারাত্মক শারীরিক চোট বা জখমের বেলাতেও তারা একইরকম উদাসীন থাকত। একদিন তো 'কারফুট' নামে এক সীল শিকারির একটা আঙুল থেঁতলে একেবারে উড়েই গেল; কিন্তু কারফুটের মুখ দিয়ে একটা টুঁ শব্দও বেরোল না।

বিনিদ্র, যন্ত্রণাময় রাতটা কাটতে না কাটতেই একদম ভোর বেলায় মাগ্রিজ আমাকে টেনে তুলে রান্নাঘরের কাজে লাগিয়ে দিল। আমার নিজের জামাকাপড়গুলো

এতক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছিল। সেগুলোকে ফেরৎ পেয়ে হতবাক হয়ে দেখলাম, প্যাণ্টের পকেটে মানিব্যাগে রাখা আমার একশো পঁচাশিটা ডলার উধাও হয়ে গিয়েছে। মাগ্রিজকে সে কথা বলতেই লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে আমাকে মারতে তাড়া করে এলো। এবং স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমিও চরম কাপুরুষের মতো ভয় পেয়ে তার সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। তাই দেখে তো মাগ্রিজ হেসেই বাঁচে না—আমাকে টিট্‌কারী দিতে দিতে অনেক কথা বলে গেল সে। এই ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পরে কি একটা কাজে লারসেনের ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, তার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না একেবারেই। লারসেনের বিছানার ঠিক পেছনের একটা র‍্যাকে সারি সারি নামজাদা সব লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বই সাজানো আছে—শেক্সপীয়ার থেকে এডগার অ্যালান পো—কেউই বাদ নেই। এ ছাড়া পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ইতিহাসের-ই বহু বিখ্যাত বইয়ের সেখানে সমাবেশ ঘটেছে দেখলাম। শুধু তাই নয়। একটা বই চাপা দেওয়া একতাড়া কাগজে বেশ কিছু জটিল, কঠিন অঙ্কের-ও সমাধান করা আছে, এবং তা লারসেনের-ই হাতের লেখা। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে লারসেন নামক লোকটির সম্পূর্ণ বিপরীত এই দ্বৈত সত্ত্বার কথা ভাবতে লাগলাম। তবে, ওর চরিত্রের এই উজ্জ্বল দিকটার খোঁজ পেয়ে বোধ হয় আমার একটু সাহস বেড়ে গেল। ওকে ডেকের ওপর একলা পায়চারি করতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বললাম—'স্যার, একটা কথা আপনাকে জানাচ্ছি। এই জাহাজে ওঠার সময় আমার কাছে যা টাকা পয়সা ছিল, তার সবটাই আপনার রাঁধুনি মেরে দিয়েছে।' কিন্তু আমার এই অভিযোগ শুনে লারসেন খালি একটু মুচ্‌কি হেসে বলল—'ঠিকই হয়েছে, 'কুকি' হতভাগা কিছু স্বাধীন উপার্জন করেছে। তাছাড়া, তুমিই বা কেমন লোক যে নিজের টাকাপয়সা ঠিক করে রাখতে শেখোনি এখনও ? 'কুকি'-কে এভাবে লোভ দেখানোটা তোমার খুবই অন্যায় হয়েছে—তোমার পাতা ফাঁদের লোভে 'কুকি' বেচারার অমর আত্মা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি হবে বল তো ? ভাল কথা, আত্মার অমরত্ব, প্রাণের অবিনশ্বরতা—এ সব মহান ব্যাপারে বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই ?'—বলতে বলতে মনে হল, এক মুহূর্তের জন্য যেন ওর চোখের ভেতর দিয়ে ওর মনের আসল রূপটা ফুটে উঠল। এক পলক মাত্র—সঙ্গে সঙ্গেই আবার লারসেন ডুবে গেল তার সেই সীমাহীন কাঠিন্যের মধ্যে। আমি এবার আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ। আর, তোমার চোখেই আমি সেই অমরত্বের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।' ইচ্ছে করেই এবার ওকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করলাম—কারণ এতক্ষণে আমাদের মধ্যে বেশ খানিকটা অন্তরঙ্গতাও গড়ে উঠেছিল।

লারসেন-ও এই সম্বোধনটা যেন লক্ষ্যই করল না—বলে উঠল, 'কেন ? কিসে আমি অমর, অবিনশ্বর ? ওসব ছেঁদো, অর্থহীন, ন্যাকা কথাবার্তায় আমার কোনও বিশ্বাস নেই।' আমার সাহস ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছিল—এবার আমি বেশ খানিকটা কৈফিয়ৎ চাওয়ার ভঙ্গিতেই ওকে জিজ্ঞেস করলাম—'তাহলে তুমি কিসে বিশ্বাস কর, আর এই জীবন সম্বন্ধেই বা তোমার ধারণা কি ?' লারসেন সঙ্গে সঙ্গে যেন গর্জে উঠল—'আমি ? আমি মনে করি যে আমাদের এই জীবনটা একটা তালগোল পাকানো জগাখিচুড়ি পিণ্ডি, গেঁজিয়ে ওঠা একপাত্র মদ ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন, দুদিন, একশো বছরও হয়তো তুমি নড়াচড়া করতে পার ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জীবনের গতি একদিন না একদিন থেমে যাবেই, আর তখনই সব কিছুর শেষ। সবল দুর্বলকে, বড় ছোটকে খেয়ে বেঁচে থাকে। যে বেশি ভাগ্যবান, সে বেশিদিন টিঁকে থাকে। এই তো ব্যাপার, তাই না ?' কথা বলতে বলতে দূরে একদল নাবিককে দেখিয়ে বলল লারসেন—'ঐ দেখ, লোকগুলো কেমন নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে, ঠিক যেমন কিলবিল করে নড়ে জেলিফিশগুলো। তারপর একদিন সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যস, সব শেষ। তার পরে আর কিছু নেই।'—লারসেন আরও কী সব যেন বলতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—'কেন, এই লোকগুলোর মনে নিশ্চয়ই খেলা করে বেড়াচ্ছে অনেক স্বপ্ন, কল্পনা'—লারসেন আমার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বলল—'হ্যাঁ, টাকা—আরও বেশি টাকা কামানোর স্বপ্ন। কি করে আরও বেশি সুখ ভোগ করা যায়, তার কল্পনা—নিজেরা বেশ আয়েসে জীবন কাটাব, আর অন্যরা খেটে সেই আরামের আয়োজন করে দেবে—সেই চিন্তা। তুমি বা আমিও এর ব্যতিক্রম নই। তুমি তো নিশ্চয়ই বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছ,—কে তোমার খাবারদাবার, কাপড়চোপড়ের জোগান দেয় ? তুমি নিজে নিশ্চয়ই নও ? তুমি তো বোধহয় জীবনে এক গেলাস জল-ও নিজে গড়িয়ে খাওনি কখনো, একবারও কি ভেবে দেখেছে, তোমার পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার, বিছানা-পত্র—এ সবই তৈরি করে দেয় এমন সব লোকেরা, যাদের নিজেদের ঠিকমতো খাওয়া পরা জোটে না ? তোমরা রাজ্য চালাও, বড় বড় বাড়ি বানাও,—আর তোমাদের পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য ক্ষুধার্ত লোক। তোমরা যাতে আরামে থাকতে পার তার জন্য ওরা দিনরাত খাটে, আর একটা চাকরির জন্য, কোনো একটা জীবিকার জন্য, তোমাদের উমেদারি করে চলে। এটাই হল বাস্তব জীবনের ঘটনা। তোমাকে আর আমাকে দিয়েই বিচার করে দেখনা। তোমার বড় বড় কথা, আত্মার অমরত্বের অহংকার—আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার কি এক কানাকড়িও

দাম আছে ? তুমি চাইছ এখুনি ডাঙায় ফিরে যেতে, আর আমি চাইছি তোমাকে জলেই আটকে রাখতে। এটা আমার একটা খেয়াল বলতে পার। আমি তো তোমাকে ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি। আমরা যদি অমর আত্মার-ই অধিকারী হই, তাহলে প্রকৃতির নিয়মে এতো বৈষম্য কেন ? কেন আমি তোমার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী ? কারণ, আমার মধ্যে গেঁজিয়ে ওঠা ফেনা—যাকে তোমরা জীবন বল—তা বেশি পরিমাণে আছে। তার কাছে তুমি, তোমার অমর আত্মা—একেবারেই অসহায়। তোমার মধ্যে যে প্রাণটুকু আছে, সে চায় যেভাবে হোক অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রেখে বেঁচে থাকতে। তাহলে আর বেশি কথা বলে লাভ কি ?'—একটানা এত কথা বলেই হঠাৎ লারসেন জিজ্ঞেস করে বসল—'ভাল কথা, তোমার কত টাকা খোয়া গিয়েছে 'কুকি'র খপ্পরে পড়ে ?' আমি উত্তর দিলাম—'১৮৫ ডলার।' লারসেন কোনো কথা না বলে শুধু ঘাড়টা নেড়ে অন্যদিকে চলে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জনসন নামে নাবিকটার সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, এ তল্লাটে সীল শিকারি ক্যাপ্টেন আছে, তাদের মধ্যে 'নেকড়ে' লারসেনের দুর্নাম সবচাইতে বেশি। এ জাহাজে যত নাবিক বা সীল-শিকারি আছে, তারা কেউই স্বেচ্ছায় এখানে আসেনি। বিশেষতঃ যে সব শিকারিগুলো এখানে আছে, তারা প্রায় সবাই নাম-কাটা সেপাই, চূড়ান্ত বজ্জাতির জন্য অন্য কোনো জাহাজে তাদের ঠাঁই হয় না। লারসেন নিজে যে কটা খুন করেছে তার তো কোনো হিসেবই নেই। মন বা হৃদয় বলে কোনো বস্তু লোকটার মধ্যে কখনো কেউ দেখেনি।

যতই দিন যেতে লাগল, 'মাগ্রিজ'-এর শয়তানি ততই বেশি অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। আমার এখন ওকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে 'স্যার' বা 'মিস্টার' বলে সম্বোধন করতে হয়, যাতে ওর সম্মানের কোনো হানি না হয়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, লারসেন-ও ওকে খুব খাতির করে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, মাগ্রিজের লম্বা চওড়া বুলির বহর এতে আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ওকে যে সব সময়েই সব অফিসাররা কিরকম খাতির করে চলে, তার গল্প শুনতে শুনতে আমাদের কান একেবারে পচে গেল ! ওকে দেখলেই রাগে, ঘেন্নায় আমার সারা গা যেন জ্বলে যেত।

ওর হাতের রান্নাও ইদানীং একেবারে অখাদ্য আর নোংরা হয়ে উঠেছিল! আমার পেছনে সারাক্ষণই লোকটা এমন লেগে থাকত যে 'বিশ্রাম' বলে কথাটার মানে এতদিনে আমি ভুলেই গেছিলাম। ভোরবেলায় সবার আগে উঠতাম আর শুতে যেতাম সবার শেষে। কিন্তু এত খাটুনিতে আমার সহ্যশক্তি বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। এর আগে জীবনে আমাকে কখনো কাজ করতে হয়নি। এখন আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম কর্মজীবী লোকদের দিন কিভাবে কাটে। তবে আমার শরীরও এতদিনে হয়ে উঠেছিল একেবারে লোহার মতো শক্ত আর পেটানো।

এতদিনে আমরা উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বায়ুর দেখা পেলাম। আমাদের জাহাজ এবার এই বাতাসের ঠেলা খেয়ে তরতর করে এগিয়ে চলল। আবহাওয়াটিও হয়ে উঠল ভারী মনোরম। আমি সারাদিনের খাটুনির মধ্যেও সুবিধা পেলেই ডেকে এসে দু'চোখ ভরে সমুদ্রের এই বৈচিত্র্যময় রূপ, চারিদিকের অন্তহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতাম—আমাদের এই পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা সত্যিই এতদিন জানতাম না। একদিন রাতে 'ফোকসালে' শুয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ লারসেন সেখানে এসে হাজির। দেখলাম, লারসেন খুব খোশমেজাজে আছে। আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছে। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল—'আরে হাম্প যে! তারপর জীবনটাকে এখন কি রকম মনে হচ্ছে? তোমাকে তো এ ব্যাপারে কিছুতেই কিছু বোঝাতে পারছি না। তোমার আশেপাশের লোকজনদের মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রাণের স্রোত বয়ে চলেছে, তার দাম কখনো পয়সা দিয়ে মাপা যায় না। এই, আমার কথাই ধর—আমিও মনে করি, আমার জীবন অমূল্য—দাম দিয়ে তা কেনা যায় না। জীবনীশক্তির গেঁজিয়ে ওঠা একটা মাদকতা যেন আমাকে নেশাগ্রস্তের মতোই বেহিসেবী করে তুলেছে। কিন্তু এর শেষ পরিণতি কি? একদিন না একদিন আমি মারা যাবই,—এবং হয়ত বা এই সমুদ্রের বুকেই। সব শেষ। তারপরে আর কিছু নেই। এটাই হল আমাদের জীবনের আসল রূপ। বুঝলে?'—কথাগুলো বলেই লারসেন লঘুপায়ে ডেকের ওপর উঠে গেল। লারসেন যে আসলে কি,—সেটা আমি এতদিনেও বুঝে উঠতে পারলাম না। ওকি বদ্ধ পাগল, অসামান্য প্রতিভাবান, না এই দুয়ের-ই এক সংমিশ্রণ? তবে ওযে আদিম, বন্য পৌরুষের একটা নিখুঁত উদাহরণ সেটা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলাম। তাছাড়া, লারসেন ছিল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এক ব্যক্তিত্ব—এই জাহাজের কারো সঙ্গেই ওর ঘনিষ্ঠতা বা বন্ধুত্ব ছিল না। সবাই ওকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করত। কাউকে ডেকে লারসেন কোনো কথা বললে সে বেশ একটু অস্বস্তিতেই পড়ে যেত। কারণ, কখন যে লারসেন

কোন্ মূর্তি ধরবে, তা কেউই বুঝে উঠতে পারত না। ওর খামখেয়ালিপনারও সত্যিই কোনো শেষ ছিল না। একদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে যাওয়ার পর দেখি, লারসেন খুব অন্তরঙ্গভাবে মাগ্রিজের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলছে—'ও, তাহলে তুমি 'ন্যাপ' খেলাও জান? অবশ্য, একজন ইংরেজ ভদ্রলোক হয়ে তুমি যে এসব জানবে তা আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। এই যে হাম্প, আমার তাসের প্যাকেট, গেলাস, হুইস্কির বোতল আর চুরুটের বাক্সটা নিয়ে এসো তো!'

স্বয়ং লারসেনের কাছ থেকে এভাবে তোল্লাই খেয়ে আনন্দে মাগ্রিজ তো একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল। ওর শরীরে যে খাঁটি ইংরেজের রক্ত বইছে, তার প্রমাণ দিতে গিয়ে মাগ্রিজ যে কত রকমের আজগুবি গল্প বলে গেল, তার আর ইয়ত্তা নেই। যাই হোক, বাজি রেখে তো 'ন্যাপ' খেলা শুরু হল এবং লারসেন একতরফা জিতে চলল। দুজনের মদের গেলাসও খুব ঘন ঘন খালি হচ্ছিল বটে, কিন্তু লারসেনের বিন্দুমাত্রও নেশা হল না। মাগ্রিজ অবশ্য খানিকক্ষণের মধ্যেই বেহেড মাতাল হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই ও টলতে টলতে উঠে গিয়ে নিজের ঘর থেকে টাকা নিয়ে আসছিল আর জড়ানো গলায় নিজের বংশমর্যাদার গুণগান করে যাচ্ছিল। অবশেষে এক সময় শেষ পয়সাটি পর্যন্ত হেরে গিয়ে দুহাতে মুখ গুঁজে হাঁউমাউ করে কাঁদতে লাগল মাগ্রিজ। লারসেন চাপা গলায় আমাকে ডেকে বলল—'এটাকে এখন থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মাথায় এক বালতি একেবারে কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে বল।' মাগ্রিজকে চ্যাংদোলা করে অন্য নাবিকরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর লারসেন ওর জেতা টাকাটা গুণে দেখল ঠিক ১৮৫ ডলারই আছে অর্থাৎ আমার যে টাকাটা খোয়া গিয়েছিল তার সবটাই। আমি বলে উঠলাম—'এই টাকাটা আমারই।' লারসেন একটু ঠাট্টার হাসি হেসে বলল—'হাম্প, তোমার ব্যাকরণে বোধ হয় একটু ভুল হচ্ছে। বল, 'টাকাটা আমার ছিল।' আমি উত্তর দিলাম—'স্যার, এটা ব্যাকরণের প্রশ্ন নয়, নীতিবোধের প্রশ্ন।' লারসেন প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অন্যমনস্কভাবে বেশ একটু হতাশ কণ্ঠেই বলে উঠল—'বুঝলে হাম্প, এই জাহাজে একমাত্র আমরা দুজনেই এই 'নীতিবোধ' কথাটার মানে জানি। এক সময় আমি স্বপ্ন দেখতাম যে বড় বড় লোকের সঙ্গে বসে এই ধরনের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলব, আলোচনা করব। কিন্তু—যাক্‌গে সে কথা। তুমি তাক থেকে ঐ বিশ্বসাহিত্যের বইখানা নিয়ে এসো তো!'

লারসেন আর আমি এরপর প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ধরে সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি নিয়ে

গভীর আলোচনায় মেতে রইলাম। বিভিন্ন বিষয়ে লারসেনের গভীর জ্ঞান দেখে বার বার চমৎকৃত হলাম। রাতের খাওয়াও ওর সঙ্গে বসেই সারতে হল। মাগ্রিজকে একলাই রান্নাঘরের সব ঝামেলা সামলাতে হল—লারসেন ওকে বলেই দিয়েছিল যে আপাততঃ আমি রান্না ঘরে ঢুকবই না। এরপর পুরো তিনটে দিন লারসেন আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় ডুবে রইল। চতুর্থ দিনে অবশ্য লারসেনের খামখেয়ালির উল্টো এক ধাক্কায় আমি আবার 'পুনর্মূষিক' হয়ে ফিয়ে গেলাম মাগ্রিজের কাছে, আর সে-ও এই তিনদিনে জমে ওঠা গায়ের ঝাল আচ্ছাসে আমার ওপর দিয়ে মিটিয়ে নিল। লারসেনের ঘর থেকে এই আকস্মিক প্রস্থানের জন্য দায়ী কিন্তু আমি-ই। আমরা ওর প্রিয় বিষয় 'জীবন' নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি এতদিনে ওর সঙ্গে বেশ খোলাখুলি সব আলোচনা করতাম। তাই আমি লারসেনের জীবন নিয়ে এমন সব কটূক্তি আর ব্যাঙ্গোক্তি করতে লাগলাম যে লারসেন আর সহ্য করতে না পেরে নেকড়ে বাঘের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাতখানাকে চেপে ধরল। ওর গায়ে যে কি অসাধারণ শক্তি, তা টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। লারসেন খালি আমার হাতখানাকে একটু চাপ দিয়ে ধরে রেখেছিল। তাতেই আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমার হাতদুখানা অসাড় হয়ে খসে পড়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে অবশ শরীরে মাটিতে পড়ে গেলাম। একটু পরে কোনোরকমে টলতে টলতে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু তার মধ্যেও এক ফাঁকে চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিলাম, লারসেন কিরকম যেন একটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় ও দেখতে চাইছিল, আমার 'জীবনীশক্তি' বা 'অমর আত্মা'র প্রতিক্রিয়াটা কিরকম হয়।

এই তিনদিন লারসেনের সঙ্গে কাটিয়ে আমার কিন্তু বেশ উপকারই হল। হাড়ভাঙা খাটুনির হাত থেকে রেহাই পেয়ে শরীরের সব ক্লান্তি তো দূর হয়ে গেলই, এ ছাড়া আমার জখম হওয়া হাঁটুও অনেকটা সেরে উঠল। মুস্কিলটা হল খালি 'মাগ্রিজ'-কে নিয়ে—সে আমার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করল, এমন কি মাঝে মাঝে আমাকে মারবার ভয়ও দেখাতে লাগল। তবে এতদিনে আমি আর সেই আগেকার শহুরে 'ভদ্রলোক'-টি ছিলাম না—আমিও এখন পাল্টা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওর গালিগালাজের জবাব দিতে লাগলাম। মাগ্রিজ আদতে ছিল এক নম্বরের কাপুরুষ। আমার মারমুখী হাবভাব দেখে মনে মনে ঘাবড়ে গিয়ে আমার গায়ে আর সত্যি সত্যি হাত তুলতে সাহস পেল না সে। শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরের একটা ভোঁতা ছুরি নিয়ে এসে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ছুরিটাতে খালি শান দিতে

লাগল। আমিও ছাড়বার পাত্র নই, লুইস নামের নাবিকটার কাছ থেকে একটা ছুরি চেয়ে নিয়ে এসে ওর উল্টোদিকে বসে আমিও ঐরকম ধার দিতে দিতে আড়-চোখে মাগ্রিজকে লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম। শিগগিরই ব্যাপারটা গোটা জাহাজে চাউর হয়ে গেল—সমস্ত নাবিক আর সীল শিকারিরা এসে আমাদের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতে লাগল। আমাদের মধ্যে কে জিতবে,—তাই নিয়ে বাজি ধরাও শুরু হয়ে গেল ওদের মধ্যে। গোটা ব্যাপারটাই অবশ্য এতক্ষণে অত্যন্ত হাস্যকর হয়ে উঠে ছেলেমানুষির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আমি এবার মরিয়া হয়ে গিয়েছিলাম যে যা-ই ঘটুক না কেন, মাগ্রিজের বিষদাঁত আমি চিরতরে ভেঙে দেবই। ঘণ্টা দুয়েক এই ভাবে কেটে গেল। তারপর মাগ্রিজ ওর ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার দিকে দুটো হাতই বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল—'খুব হয়েছে। শুধু শুধু আর নিজেদেরকে লোকের কাছে হাস্যাষ্পদ করে লাভ কি ? এসো, দুজনে হাত মিলিয়ে বন্ধু হয়ে যাই।' আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ভয়ে কাপুরুষটার প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছে, বাছাধন এখন থেকে আর আমার ওপর কোনরকম জারিজুরি খাটাতে আসবে না। আমি ওর সঙ্গে হাত মেলালাম না, তবে গম্ভীরভাবে ঘাড়টা একটু কাৎ করে ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে, ব্যাপারটা আমিও চুকিয়ে ফেলতে রাজি। জাহাজের যে সব নাবিকরা মহানন্দে আমাদের দুজনের ছুরিতে শান দেওয়ার ব্যাপারটা উপভোগ করছিল, তারাও মন্তব্য করল যে এবার মাগ্রিজের খেলা শেষ, আমার কাছে এখন থেকে ওকেই নিচু হয়ে থাকতে হবে। সত্যি সত্যিই মাগ্রিজ এর পর থেকে আর কখনো আমার পেছনে লাগতে আসেনি।

লারসেনের সঙ্গেও আমার মেলামেশাটা এরপর থেকে বেড়েই চলল। তবে আমাদের সম্পর্কটা দাঁড়াল অনেকটা যেন রাজা আর বিদূষকের মতো। ওর মেজাজ ঠিক রাখার জন্য আমাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হত। কোনো কারণে ওর মেজাজ বিগড়ে যেতে শুরু করলেই আমি ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়তাম। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম যে লারসেন লোকটা একেবারে নিঃসঙ্গ—ওর পরিচিতরা ওকে সবাই হয় ভয় করে নয়তো ঘেন্না করে। অন্যান্য 'স্ক্যানডিনেভিয়ন'দের মতো লারসেনও ছিল খুব চাপা স্বভাবের লোক, তাছাড়া সব সময় কি যেন একটা বিষণ্ণতাবোধ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখত। সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ অবশ্য ওর যথেষ্টই ছিল, কিন্তু হালকা হাসিঠাট্টায় মশগুল হতে ওকে কখনো দেখিনি। ওর স্বভাবের মধ্যে একটা চরম বৈপরীত্যও ছিল—প্রচণ্ড রাগ ও চরম নিষ্ঠুরতার যে আদিম অভিব্যক্তি ওর মধ্যে ফুটে উঠতে দেখেছি, স্বাভাবিক অবস্থায়

ওকে দেখে সেই আদিমতার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে ওর মাথায় একটা অসহ্য যন্ত্রণা হত, এবং সেই যন্ত্রণা প্রায় সব সময়েই দু'তিনদিন ধরে একটানা হয়েই যেত। লারসেনের মতো ইস্পাতকঠিন লোকও তখন কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করত। ওর মুখ থেকে প্রায়ই বেরিয়ে আসত চাপা আর্তনাদ। এবং এই ধরনের যন্ত্রণা হওয়ার পরেই যেন লারসেন ওর বেঁচে থাকার আনন্দকে আরো বেশি উপভোগ করতে চাইত। একবার এইরকম এক দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা শেষ হওয়ার সময় লারসেনের ঘরে ঢুকে দেখলাম, ও এমন একটা অসাধারণ দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র বা 'কম্পাস' বানিয়েছে, যা নাবিকদের সমুদ্রে সঠিক পথ চেনবার কাজটা খুবই সহজ, কিন্তু নির্ভুল করে দেবে। লারসেন বলল, জীবিত থাকার আনন্দই তাকে এই ধরনের একটা জিনিস সৃষ্টি করতে প্রেরণা দিয়েছে। তবে লারসেন তার সঙ্গে এ কথাটাও বলতে ভুলল না যে, এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করে চিরস্থায়ী খ্যাতি বা অমরত্ব পাওয়ার কোনো-রকম আগ্রহই তার নেই। তার উদ্দেশ্য হল এই আবিষ্কারটার 'পেটেণ্ট' নেওয়া এবং তা থেকে ভবিষ্যতে প্রচুর পয়সা কামিয়ে বড়লোক হওয়া।

যতই দিন যেতে লাগল, লারসেন সম্বন্ধে আমার কৌতূহলও ততই বেড়ে চলল, —লোকটা আসলে কে? কি ওর আসল পরিচয়? শক্তি, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যের এরকম সমন্বয় এর আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। এত সম্ভাবনাময় একজন পুরুষ কেন একটা সীল-শিকার জাহাজের এক অখ্যাত, অজানা ক্যাপ্টেন হয়ে দিন কাটাচ্ছে? একদিন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না,—একনিঃশ্বাসে ঝড়ের বেগে লারসেনকে এই ধরনের অনেক প্রশ্ন করে বসলাম। লারসেন চুপ করে আমার কথা শুনল। তারপর উত্তর দিল, 'ওহে, তুমি 'প্যারাব্‌ল অফ দ্য সোআর' কাহিনীটা জান তো—বহু ভাল ভাল বীজ পথের ধারে পাথরে বা কাঁটাঝোপে পড়ে বৃথা নষ্ট হয়ে যায়? তা, আমার জীবনটাকেও সেরকম একটা বীজের সঙ্গে তুলনা করতে পার।' এরপর লারসেনের হৃদয়ের উৎসমুখ যেন খুলে গেল,—ওর জীবনের সব কাহিনী আমার কাছে উজাড় করে দিল ও। চরম দারিদ্র্য আর অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে লারসেন বড় হয়ে উঠেছে। শৈশবে দুবেলা মাছসেদ্ধ ছাড়া আর কোনো খাবার ওর ভাগ্যে বড় একটা জুটত না। দশ বছর বয়সেই বিভিন্ন জাহাজে 'কেবিন বয়ের' কাজ করতে হয়েছে লারসেনকে,—এবং এই কাজ করতে গিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছ থেকে ওর জুটেছে সীমাহীন লাঞ্ছনা, শারীরিক নির্যাতন আর আধপেটা খাওয়া। কোনো রকম লেখাপড়া করার সুযোগই লারসেন ছোটবেলায় পায়নি। সেই সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে লারসেন এখনো রাগে পাগল হয়ে যায়। একটু বড়

হয়ে জাহাজে কাজ করতে করতেই লারসেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখে।

'কিন্তু'—এত কথা বলে লারসেন মন্তব্য করল—'আমি এত কিছু করলাম কিসের জন্য ? কি পেলাম আমি ?' আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতে গেলাম—'কেন, ইতিহাসে তো দেখা যায় কত ক্রীতদাস পরে রাজা হয়েছে'—আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে লারসেন গর্জে উঠে বলল—'থাম, থাম। তারা অনেক সুযোগ পেয়েছে যা আমি কখনো পাইনি। যাক্‌গে হাম্প, আজ তুমি আমার সম্বন্ধে যা জানলে তা একমাত্র আমার ভাই 'যমদূত' লারসেন ছাড়া আর কেউই জানে না। আমার ভাই 'ম্যাসিডোনিয়া' নামের সিল শিকার করার জাহাজটার ক্যাপ্টেন—ওর সঙ্গে আমাদের শিগ্‌গিরই জাপানের উপকূলে দেখা হবে। আমার ভাই একেবারে ঢেঁকি মুখ্যু, নিরক্ষর,—ঘটে একফোঁটাও বুদ্ধি নেই, শয়তানি মতলব ছাড়া। স্বভাবে অবশ্য আমাদের দুজনের মধ্যে হুবহু মিল,—আমাদের দুজনকেই লোকে নরপশু বলে জানে। তবে ও আমার চাইতে অনেক বেশি সুখী, কারণ কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা কারার মতো মাথাটাই ওর নেই। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসের সমস্ত শব্দই ওর কাছে একেবারে অজানা। বইয়ের পাতা উল্টে, লেখাপড়া শিখে পড়াশোনা করে জীবনের যে চরমতম ভুলটি আমি করেছি, সেই ভুলের ফাঁদে আমার ভাই কখনো পা দেয়নি।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গত চব্বিশ ঘণ্টায় সারা জাহাজ জুড়ে যেন একটা আদিম হিংস্রতার ঝড় বয়ে গিয়েছে। হতভাগা মাগ্রিজটাই সব কিছুর জন্য দায়ী। জনসন জাহাজের স্টোর থেকে কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কিনেছিল। জিনিসগুলো ছিল একেবারে নিচু মানের এবং জনসন তা নিয়ে বেশ কিছু কড়া মন্তব্যও জোর গলায় করেছিল। বেইমান মাগ্রিজটা করেছে কি, লারসেনের কাছে নিজেকে একটু জাহির করবার জন্য জনসনের সেই সমস্ত মন্তব্য লারসেনকে বলে দিয়েছে। আমি একদিন লারসেনের ঘরে বসে ওর সঙ্গে 'হ্যামলেট' নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় জোহানসেন জনসনকে সঙ্গে নিয়ে এসে ঢুকল। লারসেন চোখের ঈশারায় আমাকে কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলল। তারপর জনসনের দিকে ফিরে বলল, 'জনসন, আমার জাহাজের স্টোর নিয়ে যারা মুখ খোলে, তাদের নিয়ে আমি কি করি সেটা নিশ্চয়ই তোমার জানা আছে ?'

জনসন নির্ভয়ে উত্তর দিল—'আছে।'

'তাহলে ?'

'তাহলে আর কি ? আপনি এবং আপনার এই মেট এখন আমাকে নিয়ে যা করবেন তাই হবে।' নিশ্চিন্ত মনে উত্তর দিল জনসন।

লারসেন আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে হাম্প, এই হচ্ছে অজেয়। চৈতন্যময় জীবনরূপী ধূলিকণার আত্মপ্রকাশ। জনসন কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছে যে, সে খুব ভাল কিছু একটা করছে। এইসব ব্যাপারগুলো সত্যিই আমি বুঝতে পারি না। তোমার জনসন সম্বন্ধে ধারণা কি হাম্প ?'

আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম, 'আমার মনে হয় জনসন মানুষ হিসেবে তোমার চাইতে অনেক বড়।' আসলে আমি চাইছিলাম যে লারসেনের রাগের খানিকটা অংশ যেন আমার ওপরেও এসে পড়ে, তাহলে জনসনের ওপর অত্যাচারটা কম হবে।

কিন্তু আমার কৌশল বৃথাই গেল। লারসেন হঠাৎ বসে বসেই তিন গজ দূর থেকে একটা লাফ দিয়ে জনসনের পেটে মারল এক প্রচণ্ড ঘুষি। জনসনের মতো অত বড়ো চেহারার লোকটা একটা অস্ফুট আওয়াজ করে ঠিক কাটা কলাগাছের মতো দূরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল। তারপর লারসেন ও জোহানসেন এই দুজনে মিলে জনসনকে যেভাবে পেটাল, তার বর্ণনা দিতেও আমার কলম বন্ধ হয়ে আসছে। মারের পালা যখন শেষ হল তখন জনসন একটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের আকার নিয়েছে, মানুষ বলে তখন আর ওকে চেনা যাচ্ছিল না। দুজনে মিলে ওর নিঃসাড় দেহটা শুইয়ে দিল ডেকের ওপর। এরপরেই জনসনের অনুচর কিশোর 'লীচ' যা করল তাতে আতঙ্কে আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটা আধঘণ্টা ধরে লারসেনকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান ও গালাগাল করে গেল। আমি প্রতি মুহূর্তে ভাবতে লাগলাম, এই বোধহয় লারসেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে খুন করে ফেলল। কিন্তু লারসেন একেবারে নির্বিকার রইল। যেন 'লীচ'-এর কথাগুলো ও শুনতেই পাচ্ছে না। এই সময় মাগ্রিজ হতভাগাটা এসে লারসেনকে তোয়াজ করে বলে উঠল—'ছি! ছি! লীচ, এ ধরনের ভাষা কি ব্যবহার করা উচিত ?' ব্যস, লীচের রাগের আগুনে এবার যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। একটু আগে জনসন যেরকম মার খেয়েছিল এবার লীচের হাতেও মাগ্রিজ ঠিক সেরকম বেধড়ক ঠ্যাঙানি খেল। কোনোরকমে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে না দিলে মাগ্রিজের ভাগ্যে সেদিন নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। এই ঘটনার পর গোটা জাহাজটার আবহাওয়াই যেন কেমন বিষিয়ে উঠল। দুপুরবেলাতে দুই সিল শিকারি স্মল আর হেণ্ডারসনের মধ্যে লেগে গেল প্রচণ্ড মারামারি। লারসেন অবশ্য লাফিয়ে গিয়ে দুজনকেই বেদম পেটাল। সারাদিন ধরে দফায় দফায় সামান্য ছুতোয় মার-

পিট লেগেই রইল—এমনকি রাতে শুতে যাওয়ার আগেও জোহানসেনের সঙ্গে ল্যাটিমার বলে একটা সীল শিকারীর প্রচণ্ড ঘুঁষোঘুঁষি হয়ে গেল। সারাটা দিন যেন কেটে গেল একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। যখন অবশেষে শুতে গেলাম, তখন আমার শরীর ও মন—দুইই একেবারে বিধ্বস্ত। যে জগতে বা পরিবেশে আমি এতদিন চলাফেরা করেছি, সেখানে বুদ্ধির লড়াই। কঠোর ব্যঙ্গের কশাঘাত খুব চলে, তুমুল বাক্‌বিতণ্ডাও সেখানে লেগেই আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে পাশবিক শক্তি আর নিষ্ঠুরতার এরকম নগ্ন আত্মপ্রকাশ আমি আগে কখনো দেখিনি, এরকম রক্তস্নানও না। বিছানায় শুয়ে বিনিদ্র অবস্থায় অনবরত এপাশ ওপাশ করতে করতে মনে হল, বাস্তব জীবন থেকে বোধহয় আর কোনো শিক্ষা নেওয়াই আমার বাকি রইল না। হঠাৎ একটা তিক্ত হাসি আমার গলা থেকে বেরিয়ে এলো—অবাক হয়ে দেখলাম, নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যেন আমি মাগ্রিজের ঐভাবে মার খাওয়াটাকে মনে মনে বেশ সমর্থন জানিয়ে ফেলেছি। লারসেনের যে জীবনদর্শন এতদিন আমার কাছে একেবারেই পরিত্যাজ্য ছিল, তার বেশ খানিকটা প্রভাব আমার ওপর এসে পড়েছে। সভয়ে বুঝতে পারলাম না, আমার পারিপার্শ্বিক এই আদিম, জান্তব পরিবেশ আমার মনোবৃত্তিকেও অনেকখানি নিচে নামিয়ে এনেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহিলাদের উপস্থিতি আর সাহচর্য যে আমাদের জীবনে কতখানি অপরিহার্য, 'ঘোষ্ট' জাহাজে দিনের পর দিন কাটানর সময় সেটা খুব ভালভাবেই টের পাচ্ছিলাম। জাহাজে যে সব নাবিক ছিল, তারা সকলেই অবিবাহিত, এবং বহুদিন ধরে নারী সংসর্গ থেকে বঞ্চিত। তার ফলে লোকগুলো সবাই হয়ে উঠেছিল কাটখোট্টা আর হিংস্র—সূক্ষ্ম কোমল মনোবৃত্তি বলে ওদের মধ্যে কিছুই ছিল না। দেখে মনে হত, ওরা বোধহয় কোনোদিন মায়ের শিশু ছিল না, মায়ের স্নেহ ভালোবাসাও কোনোদিন পায়নি।

জোহানসেনের সঙ্গে রাতের খাওয়া দাওয়ার পর একদিন কথা হচ্ছিল। জোহানসেন বলল, মায়ের সঙ্গে ওর গত কুড়ি বছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ওর মায়ের বয়স এখন সত্তর বছর পেরিয়ে গিয়েছে। প্রতি বছরই ও ভাবে, মায়ের কাছে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কোনোবারেই যাওয়া হয়ে ওঠে না। জোহানসেন অবশ্য খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বলল, দেশে ওরা সবাই খাটে সবসময়, বাঁচেও বহুদিন,—গড়ে একশো বছর তো বটেই। জোহানসেনের সঙ্গে এটাই আমার শেষ কথা। আমার ঘরটা

খুব গরম বলে আমি ডেকেই শোবার ব্যবস্থা করছিলাম। খানিকক্ষণ পরে ডেকে বিছানা পাতছি। এমন সময় হঠাৎ জাহাজের সামনের দিক থেকে একটা কিরকম আওয়াজ ভেসে এলো। সামনে তাকিয়ে দেখি ডেকের রেলিং বেয়ে লারসেন উঠে আসছে। ওর হাত-পা ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে, মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। দুই চোখে খুনির দৃষ্টি। আমাকে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল—'মেটকে দেখেছে?' নিজেও কয়েকবার জোহানসেনকে ডাকাডাকি করল। তারপর আমাকে পেছন পেছন আসতে বলে নিচে 'ফোকসালে' যেখানে নাবিকরা শোয়, সেখানে নেমে গেল সে, আমিও গেলাম। ত্রিকোণাকৃতি ফোকসালের তিনদিকের দেওয়ালে সারি সারি 'বাঙ্ক' ঝুলছে। সারা জায়গাটায় ঝাঁঝালো, কটু গন্ধ। সারা দেওয়াল জুড়ে নানারকম জিনিসপত্র ঝুলছে। লারসেন প্রতিটি ঘুমন্ত নাবিকের নাকের সামনে, হাত ধরে, নাড়ি টিপে দেখতে লাগল—সত্যি সত্যিই কে ঘুমিয়ে আছে, আর কে জেগে থেকে ঘুমের ভান করছে। জনসনের কাছে এসে লারসেন যেই নিচু হয়ে ওর নাড়ি দেখতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওপরের 'বাঙ্ক' থেকে 'লীচ' হাতের এক ঝাপটায় আলোটা ভেঙে দিল। এরপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শুরু হল এক সাংঘাতিক লড়াই। চরম আতঙ্কে আর উত্তেজনায় আমার শরীর একেবারে অবসন্ন হয়ে গেল—আমি কোনোরকমে নিচে নামবার সিঁড়িটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, জনসন, লীচ এবং আরো অনেক নাবিকরা মিলে লারসেনকে খুন করার একটা ষড়যন্ত্র এঁটেছে। প্রথমবার প্রচণ্ড ঘুঁষি খেয়ে লারসেন একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল; কিন্তু তারপর থেকে ওর গলা দিয়ে আর কোনো শব্দও বেরোতে শুনলাম না। অনেকজন লোক একসঙ্গে ওর ওপর পড়ে অন্ধকারে ওকে বেদম ঠেঙিয়ে যাচ্ছিল। কে একজন—বোধহয় লীচ—হিস হিস করে বলে উঠ্‌ল—'আরে, একটা ছুরি বার করনা কেউ শিগ্‌গির।' লারসেন যে কিছুতেই এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবেনা, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই রইল না। কিন্তু লারসেনকে চিনতে তখনো আমার বাকি ছিল। ও একটা লক্ষ্য নিয়েই লড়ে যাচ্ছিল—তা হল, কি করে ওপরে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে পেঁছিনো যায়। আর ওকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের মধ্যে কোনোরকম শৃঙ্খলাবোধই ছিল না। লোকগুলো অন্ধকারে নিজেরাই নিজেদের রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে পড়ছিল, একজনের ঘুঁষি আর একজনের গায়ে লাগছিল। যাই হোক, লারসেন একটু একটু করে আস্তে আস্তে সিঁড়ি পর্যন্ত পেঁছে রেলিংটা ধরে ফেলল। শরীরে আসুরিক শক্তি আর সহ্য ক্ষমতা না থাকলে পুরো এক দঙ্গল লোকের সঙ্গে এভাবে কিছুতেই লড়া যায়না।

এবার কয়েকজন মিলে মরিয়া হয়ে ওকে চেপে ধরল। কিন্তু লারসেনকে আর কি কব্জা করা যায়? ঠেলেঠুলে সিঁড়ি দিয়ে কয়েকটা ধাপ উঠে দুদিকের রেলিং চেপে ধরে নিচের অন্ধকার লক্ষ্য করে প্রাণপণে কয়েকটা লাথি চালাল লারসেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকের চাকের মতো জমাট বেঁধে থাকা নিচের ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ল্যাটিমার ওপর থেকে সিঁড়ির মুখে লণ্ঠনের আলো ফেলছিল। যারা এখনো নিচ থেকে লারসেনের পা ধরে টেনে ফেলবার চেষ্টা করছিল, তারা এক এক করে নিচে অন্ধকারে নেমে পড়ল, আর লারসেন খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিচের লোকগুলো এতক্ষণে ভয়ে আর হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছিল—বিশেষতঃ লীচ আর জনসনকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত লাগছিল। ওদের ওপর সহানুভূতি আর সমবেদনায় আমার মন ভরে উঠল। আমি যে নিচে ওদের সঙ্গে বরাবর আছি, সেটা ওরা টেরই পায়নি। এবার ল্যাটিমার ওপর থেকে আমাকে চেঁচিয়ে ডাকল। আমি সিঁড়ির দিকে এগনো মাত্র আমাকে সবাই ঘিরে ধরল। ওরা ভয় পাচ্ছিল যে আমি ওপরে গিয়েই বোধহয় সবাইকে ধরিয়ে দেব। আমি ওদের খুব ভাল করে বুঝিয়ে বললাম যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমি কিছু দেখিও নি, শুনিও নি। অসহায় বিপন্ন লোকগুলো এবার পরস্পরকে দোষারোপ আর শাপশাপান্ত করতে লাগল, আর আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। লারসেন-ই আমার খোঁজ করছিল, তাই ওর 'কেবিনে' গিয়ে ওর শরীরের আহত জায়গাগুলোতে ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে দিতে থাকলাম। অবাক হয়ে দেখলাম যে অতগুলো লোক মিলে লারসেনকে ধরে ঐ ভাবে পেটানোর পরেও এক এক জায়গায় হালকা কাটাছেঁড়া হওয়া ছাড়া ওর শরীরে মারাত্মক আঘাত বা চোটের চিহ্নমাত্রও নেই। ওর খালি শরীরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম—লোকটার শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি-ই যেন ভগবান নিখুঁত করে গড়েছেন। সাটিনের মতো মসৃণ চামড়া, জীবন্ত প্রতিটি পেশীর ছন্দোবদ্ধ ওঠানামা—সব মিলিয়ে লারসেন ছিল যেন পুরুষ সৌন্দর্যর এক নিখুঁত প্রতিমূর্তি। একই সঙ্গে শক্তি ও লাবণ্যের, কাঠিন্য ও নমনীয়তার এরকম ত্রুটিহীন শরীর আমি অন্ততঃ আর কখনো দেখিনি। আমি একদৃষ্টে লারসেনের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও একটু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করল—'কি হে, আমার শরীরটাকে খুঁটিয়ে দেখছ? শোন, ঠিকমতো ব্যবহার করার জন্যই এই শরীরটা তৈরি হয়েছিল,—একটা মোটা, আর একটা হাঁটুরও কম বয়সী ছেলের হাতে ঘায়েল হওয়ার জন্য নয়। আমার লোহার মতো শক্ত এই পেশীগুলো টিপে একটু দেখ

না, আমার সমস্ত শরীরটাই ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য তৈরী। আমি লড়াই করি খুন করার জন্য, খুন হওয়ার জন্য নয়।' আমি কোনো কথা না বলে একমনে কাজ করে যাচ্ছিলাম। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ওষুধ লাগান এতক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ লারসেন বলে উঠল—'যাকগে, হাম্প, তুমি কিন্তু সত্যিই বেশ কাজের লোক। জোহানসেন তো খতম। আজ থেকে তুমিই এই জাহাজের 'মেট' হলে।' আমি দারুণ চম্‌কে উঠে বলতে যাচ্ছিলাম—'কিন্তু আমি তো 'মেট'-এর কাজ কিছুই জানি না—' লারসেনের চোখমুখ দেখে কথাটা আর শেষ করলাম না। ও জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—'আচ্ছা, মিঃ মেট, শুভরাত্রি। আমি কেবিনে ফিরে যাচ্ছি।'

আমি দুর্বলভাবে, ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলাম—'শুভরাত্রি স্যার।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'মেট' হয়ে প্রথমটায় আমি বেশ মুস্কিলেই পড়ে গেছিলাম। 'মেট'রা কি কি কাজ করে থাকে, করতে পারে—এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই অন্যান্য নাবিকদের সাহায্যে ব্যাপারটা মোটামুটি এসে গেল আমার। সীল শিকারিদের মধ্যে কয়েকজন খুব হাসি-ঠাট্টা করে আমাকে বিব্রত করতে চেয়েছিল। কিন্তু লারসেন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে চড়চাপড় মেরে তাদেরকে একদম সিধে করে দিল। সবাই—এমনকি লারসেনও আমাকে 'মিঃ উইডেন' বলে ডাকতে লাগল। সব মিলিয়ে এখন আমার জাহাজের এই জীবনযাত্রা বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু অবিমিশ্র সুখ তো আর এ জগতে পাওয়া যায় না—ওকে যে খুন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল সেটা লারসেন একেবারেই ভোলেনি। তাই সব সময়েই ও চেষ্টা করত কি করে, কিভাবে সেইসব সন্দেহভাজন নাবিক আর শিকারিদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ করে তোলা যায়। ওরা যে একজোট হয়ে হঠাৎ লারসেনের ওপর চড়াও হবে, তার উপায়ও ছিল না, কারণ লারসেনের ঘরখানা ছিল অস্ত্র শস্ত্রে বোঝাই। তাই, লারসেনের সব অত্যাচারই ওদের হাসিমুখে সহ্য করে যেতে হত। ব্যতিক্রম ছিল শুধু লীচ্‌ আর জনসন। এ দুজনকে লারসেন কিছুতেই জব্দ করতে পারল না। লীচ বিন্দুমাত্র সুযোগ পেলেই লারসেনের সঙ্গে ঝামেলা বাধিয়ে দিত। লারসেন বার বার ওকে মেরে তুলো ধোনা করত, কিন্তু লীচ সে সব গ্রাহ্যই করত না। একদিন তো লারসেনকে তাক্‌ করে লীচ এমন একখানা

ছোরা ছুঁড়ে মেরেছিল যে আর একটু হলেই লারসেনের গলাটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেত। আর একবার মাস্তুলের ওপর থেকে লারসেনকে লীচ লোহার একটা তীক্ষ্ণ ছুঁচ্‌লো রড-ও ছুঁড়ে মেরেছিল। সেবারও এক চুলের জন্য লারসেন বেঁচে গিয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম, কেন লারসেন লীচকে খুন করে ফেলছে না। কিন্তু লারসেন খালি একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সব কিছু অগ্রাহ্য করে যেত বরং মাঝে মাঝে মনে হত, সে যেন ব্যাপারটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। একদিন তো লারসেন খোলাখুলি আমাকে বলেই ফেলল—'কি ব্যাপার জান হাম্প, একঘেয়ে দিন কাটানর চাইতে প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচে থাকাটা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। যত বেশি বিপদ তত বেশি রোমাঞ্চ। আর তাছাড়া লীচকে তো আমি মোটেই দয়া দেখাচ্ছি না, বরং ও যে আমাকে খুন করতে না পেরে প্রতিটি মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা আর নিষ্ফল রাগে জ্বলছে—সেটাতে ওরই জীবনীশক্তি শেষ হয়ে আসছে। লীচ বরং আমাকে আনন্দেই রেখেছে, ও যখন অসহ্য কিন্তু নিরুপায় রাগে গজরায় তখন ওর সেই নির্ভেজাল রাগী মূর্তি দেখে আমার দারুণ আনন্দ হয়।'

আমি সরবে লারসেনের কথার প্রতিবাদ করে উঠলাম। বললাম, 'এটা তো নিছক কাপুরুষতা করছ তুমি। এটা তো সম্পূর্ণ অসম লড়াই, কারণ তোমার হাতেই সব ক্ষমতা, তুমি যে কোনো সময়ে লীচকে নিয়ে যা খুশি করতে পার।'

লারসেন কিন্তু আমার কথায় মোটেই বিচলিত না হয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—'কে বেশি কাপুরুষ বল তো, তুমি না আমি? বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তুমি যে তোমার বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে রেখে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস কর, সেটা কি কাপুরুষতা নয়? তোমার তো আসলে লীচ ও জনসনের সঙ্গে থাকা উচিত—তাই নয়? কিন্তু তা তুমি করনি, কারণ তুমি ভীতু, তুমি চাও বেঁচে থাকতে। তোমার প্রাণ, তোমার অন্তরাত্মা চায় যে কোনো মূল্যেই হোক তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। আমার সম্বন্ধে যে যা-ই ভাবুক, আমি আসলে পাপী নই। কারণ আমার আত্মরাত্মা যা বলে, আমি তাই করি। আমার আত্মার কাছে, আমার বিবেকের কাছে আমার মনোবৃত্তিকে আমি খুলে দেখাতে পারি, কিন্তু তুমি তা পার না।' পরের দিন আমরা 'উষ্ণ স্রোত' প্রবাহের এলাকায় গিয়ে পেঁছিলাম। এবার সীলের ঝাঁকের দেখা পাওয়া যাবে। লারসেন লীচকে ডেকে এনে খোলাখুলি বলল—'দেখ লীচ, তুমি ভাল করেই জান যে আমি তোমাকে একদিন না একদিন খুন করবই, তাই না? উত্তরে লীচের মুখ থেকে তাচ্ছিল্য, ঘেন্না মেশান একটা অস্ফুট আওয়াজ বার হল। লারসেন বলে

চলল—'তবে, এখন সামনের ৩।৪ মাস আমাদের আসল কাজ অর্থাৎ সীল শিকারের সময়। তাই এখন আপাততঃ আমাদের চুপচাপ থাকাই ভাল, কি বল ?'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমরা সীলদের একটা বিশাল দলের দেখা পেয়েছি—পুরোদমে সীল শিকার শুরু হয়ে গিয়েছে। সীলগুলো সব চলেছে বেরিং সাগরের ওদের বিভিন্ন ঘাঁটি বা 'রুকারি'তে। এই সীল শিকার ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় নিছক খুন করা ছাড়া কিছুই নয়—আর এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য পুরোপুরি দায়ী আমাদের ফ্যাসন দুরস্ত, সুবেশা মহিলারা, কারণ আমাদের সমাজে সীলের মাংস বা তেল কারো দরকারে লাগে না। যাইহোক, আমাদের জাহাজের ডেক্‌টা একটা বিশাল কসাই-খানার চেহারা নিয়েছে, পুরো জায়গাটা সীলের চর্বি, চামড়া, মৃতদেহ আর রক্তে ভর্তি। আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল চামড়াগুলো গুণে মিলিয়ে রাখা, চামড়া ছাড়ানর কাজের তদারকি করা আর ডেক্‌টা ধুইয়ে পরিষ্কার রাখা। আমার সমস্ত শরীর আর মন প্রথম প্রথম বিদ্রোহ করে উঠত। গা গুলিয়ে পাকস্থলীর সমস্ত খাবার বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইত। কিন্তু এই সব কাজ দেখতে গিয়ে আমার একটা দারুণ উপকার হল। আমি একজন শক্তপোক্ত দক্ষ প্রশাসক হয়ে উঠলাম। আগেকার সেই নরম-সরম মেয়েলি উইডেন আর রইল না। তার জায়গায় দেখা দিল এক কঠোর, বাস্তবমুখি 'ভ্যান উইডেন'। অবশ্য মানুষের প্রতি, মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাস আমি হারাইনি। তবে এতদিন ধরে কল্পনাময় 'রোম্যাণ্টিক' যে জগতটা আমি নিজের চারপাশে তৈরি করে রেখেছিলাম, এবার সেই অবাস্তব কল্পলোক থেকে বেরিয়ে এসে আমি বাস্তব জগতের, সত্যের মুখোমুখি হলাম।

সীল শিকার পুরোদমে শুরু হয়ে যাওয়ার পর সারাটা দিন জাহাজে থাকতাম খালি আমি, লারসেন আর মাগ্রিজ। সীল শিকারীদের নৌকোগুলো জাহাজ থেকে সমুদ্রে নেমে চারিদিকে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ত—মাঝে মাঝে ১০।১২ মাইল পর্যন্ত দূরে চলে যেত তারা। আমাকে প্রায় সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হত—জাহাজটাকে ঠিকমতো চালানো, নৌকোগুলোর ওপর নজর রাখা, জাহাজের পালগুলো সঠিক-ভাবে খাটানো ও গোটানো, সব কিছুই করতে হত। নৌকোগুলোকে দেখার জন্য মাঝে মাঝেই আমাকে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মাস্তুলের ডগায় উঠতে হত। লারসেনের কাছে নিজেকে যোগ্য সাহসী বলে প্রমাণিত করার জন্য আমার যেন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল।

কয়েকদিন বাদে একটা সুন্দর, ঝকঝকে সকালে সীল শিকারিদের সব ক'টা নৌকোই সমুদ্রে নেমে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে—কোনো নৌকোকেই আর আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখি লারসেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—ব্যারোমিটারের পারা নাকি খুব নেমে গিয়েছে। পূর্বদিকে আকাশের চেহারাটা ক্রমশই ঘোরাল হয়ে উঠতে লাগল। বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে সমুদ্র একেবারে কাচের মত স্থির হয়ে গেল। পূর্বদিকের আকাশটা এতক্ষণে ঘন মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কি যেন একটা আসন্ন বিপদের অনুভূতিতে ভরে উঠল মন। লারসেন খুব শান্তভাবে বলল, 'বুঝলে, মেট সাহেব, যেটা এখন আসছে সেটা কেবলমাত্র একটু ঝড়ই নয়। প্রকৃতি দেবী একেবারে প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে সেজে আসছেন, আমাদেরকেও নাকে দড়ি দিয়ে নাচাবেন। আমাদের অনেকগুলো নৌকো আজ মারা পড়তে পারে। এক কাজ কর, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওপরের পালের দড়িগুলো খুলে দাও নইলে সব উপ্‌ড়ে নেবে এক্ষুণি।'

কোনোরকমে গোগ্রাসে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। লারসেনকে কিন্তু একটুও চিন্তিত বা বিচলিত বলে মনে হল না বরং প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে একটা জোর লড়াই করবার সুযোগ পেয়ে ও যেন খুব খুশি হয়ে উঠল। একবার চোখে পড়ল, বাইরের অসীম জলরাশি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের একটা বেপরোয়া হাসি হাসল লারসেন—দেখে মনে হল ও যেন স্বয়ং ভাগ্য দেবতাকেই এক হাত দেখে নিতে চাইছে।

পশ্চিম দিকের আকাশটাও এতক্ষণে একেবারে ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। সূর্য বহুক্ষণ আগেই মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কি রকম একটা অপার্থিব নিস্তব্ধতায় চারদিক থমথম করছিল—ভৌতিক এক গোধূলির আলোয় সব কিছুই কেমন যেন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। ভ্যাপ্‌সা গরমে একেবারে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ একঝলক মৃদু নিঃশ্বাসের বাতাস এসে আমাদের ছুঁয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লারসেন আমাকে আর মাগ্রিজকে হুকুম দিল, তক্ষুণি জাহাজের পালগুলোকে যথাসম্ভব ছড়িয়ে মেলে দিতে। আমাদের জাহাজখানা উত্তর-পশ্চিমের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, যাতে জোরে বাতাস বইতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের নৌকোগুলোর দিকে ছুটতে পারি।

বাতাস এখন ফিসফিস করছিল না, গজরাচ্ছিল। পালগুলো একেবারে টান টান হয়ে উঠেছিল। 'ঘোস্ট'-এর গতিও ক্রমশঃ বেড়ে চলছিল। বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটা আমাদের নিয়ে হেলছিল, দুলছিল। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে সবচাইতে

উঁচু পালগুলোকে ঠিকঠাক করে দিলাম, তারপর জাহাজের ডেক থেকে প্রায় সত্তর ফুট উঁচুতে সামনের 'ক্রস-টি'টাতে উঠে গেলাম। এবার দৃষ্টি মেলে ধরলাম সামনের ধূ ধূ জলরাশির দিকে। সমুদ্র এতক্ষণ ফুঁসতে শুরু করেছিল। এই প্রচণ্ড বাতাস ও ঢেউয়ের মধ্যে কোনো নৌকোই টিকে থাকতে পারবে বলে আমার মনে হল না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা নৌকো চোখে পড়ল—নৌকোটার তিনজন আরোহী প্রাণপণে জল ছেঁচে ফেলতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝেই একটা প্রকাণ্ড রাক্ষুসে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, আর নৌকোটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ পর যখন ভাবতে শুরু করেছি যে নৌকোটা নিশ্চয়ই তলিয়ে গেছে, তখনই আবার দেখলাম যে নৌকোটা রাশি রাশি ফেনা ভেদ করে ঢেউ-এর চুড়োয় উঠে এসেছে, আর তারপরেই উল্টে গিয়ে ঢেউয়ের চুড়ো থেকে নিচে গড়িয়ে সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ছে। নৌকোটা যেভাবে ঢেউয়ের পাহাড় ভেদ করে প্রত্যেকবার বেরিয়ে আসছিল, সেটা আমার কাছে একটা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল। হাওয়া আর ঢেউ—এই দুজন মিলে এখন একেবারে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল। আমি ইতিমধ্যে 'ক্রস-টি' থেকে নেমে এসেছিলাম। হঠাৎ পাহাড়ের মতো উঁচু একটা ঢেউ এসে সজোরে আমাদের জাহাজের ওপর আছড়ে পড়ল—আমার মনে হল এবার নিশ্চিত মৃত্যু। প্রচণ্ড একটা আঘাতে ছিট্‌কে পড়ে জলের তলায় হাবুডুবু খেতে লাগলাম। কোনো একটা শক্ত জিনিসের সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আতঙ্কে দিশেহারা হলাম না একটুও। ঢেউটা যখন সরে গেল, তখন মনে হল যে আমরা একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের 'ঘোস্ট' ভেঙে একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে। পালগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে, দড়ি-দড়া-গুলো-ও ছিন্ন ভিন্ন। সারা ডেক্‌টা ভাঙাচোরা জিনিসে ভর্তি হয়ে আছে। এমনকি আমাদের 'গ্যালিরুম' বা রান্নাঘরের অর্ধেকটাও অদৃশ্য। যাই হোক, এই অবস্থাতেও আমরা জাহাজ নিয়ে নৌকোটার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। একটা খুব উঁচু ঢেউয়ের মাথায় নৌকোটা যেই উঠেছে, লারসেন সঙ্গে সঙ্গে নৌকো বাঁধবার হুকওয়ালা রশিটা ছুঁড়ে দিল—নৌকোর আরোহীরাও তখুনি নৌকোটাকে রশিটার সঙ্গে আট্‌কে দিল। ঢেউটা যখন আবার সরে যাচ্ছে, তখন আরোহী তিনজন সময়ের নিখুঁত হিসেব করে একসঙ্গে লাফিয়ে আমাদের জাহাজে এসে উঠল। এরপর নৌকোটাকে টেনে জাহাজে উঠিয়ে আনা হল। এইভাবে আমরা চারটে নৌকোকে তুলে আনলাম। তবে শেষ নৌকোটা আমরা তুলে আনলাম একেবারে খালি অবস্থায়—তার সব কজন আরোহীই সমুদ্রে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে। আমরা এইভাবে নৌকোগুলোকে জাহাজে

তুলে আনছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের 'ঘোস্ট' যে নিজে কতক্ষণ জলের ওপর ভেসে থাকতে পারবে, সেটাই ঘোর অনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে যে এভাবে টিঁকে থাকা যায়, সেটা নিজের এই অভিজ্ঞতা ছাড়া কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। পুরো জাহাজখানাই বারবার বিশাল ঢেউয়ের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল—প্রতিবারই মনে হচ্ছিল, এইবারই বোধহয় সব শেষ। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ নাকানি চোবানি খাওয়ার পর আবার আমরা ঢেউয়ের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, আর শক্ত হাতে জাহাজের 'হুইল' ধরে বসে থাকা অবিচলিত লারসেনের চেহারাটা চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। একবার এরকম একটা প্রচণ্ড ঢেউ জাহাজের ওপর আছড়ে পরে ফিরে যাওয়ার মুখে আমিও জলের তোড়ের সঙ্গে ভেসে জাহাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে চলে গেলাম। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতি আর একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আবার জাহাজের ডেকে ফিরে এসে আছড়ে পড়লাম। তবে 'কেলি' নামে যে সীল শিকারিকে আমরা একটু আগেই নৌকো থেকে তুলে এনেছিলাম, সে এই রকম একটা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে সমুদ্রে চলে গিয়ে আর ফিরে এলো না। কিছুক্ষণ পর প্রকৃতি দেবীকেই এই অতি ক্ষুদ্র, অসম-সাহসী কয়েকটি লোকের কাছে হার মানতে হল—প্রচণ্ড হাওয়া থাকলেও ঢেউয়ের দাপট আস্তে আস্তে কমে এলো। 'ঘোস্ট' নিজের ইচ্ছে মতো ঝড়ের সঙ্গে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল। এবার লারসেন আমাদের ডেক্ থেকে সরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে বলল। এতক্ষণকার তীব্র উদ্বেগ কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ টের পেলাম যে, দারুণ খিদে পেয়েছে। খানিকক্ষণ পরে আয়েস করে বসে হুইস্কিতে চুমুক দেওয়ার সময় মনে হল, এত ব্যগ্রভাবে, এত আগ্রহের সঙ্গে বোধহয় জীবনে কখনো কিছু খাইনি। খাওয়া দাওয়ার পর লারসেন সবাইকে হুকুম দিল শুয়ে পড়তে। আমার দু হাতের সব কটা নখ ফেটে গিয়েছিল। ভাবলাম যে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঘুম হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, গা এলিয়ে দেওয়া মাত্র গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম। সারা রাত অকাতরে ঘুমলাম। আর আমাদের 'ঘোস্ট' নিঃসঙ্গ ভাবে সারারাত ঝড়ের মুখে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ভেসে চলল।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থেমে যাওয়ার পর আমরা সমুদ্রের বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করলাম। ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজটা মেরামতি করার কাজও চলল পুরোদমে। ঝড়ের সময় সমুদ্রে যে সব শিকারি নৌকো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা প্রথম সুযোগেই

সব চাইতে কাছের জাহাজ বা 'স্কুনারে' গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এইভাবে 'সিস্‌কো' নামের জাহাজটা থেকে আমরা সব লোক সমেত আমাদের দুখানা নৌকো ফেরৎ পেলাম। তবে খুব দুঃখের ব্যাপার হল, 'সান ডিয়েগো' নামের জাহাজখানা থেকে স্মোক, জনসন আর লীচকে-ও ফেরৎ পাওয়া গেল। লারসেন যে এতে দারুণ খুশি হয়ে উঠল, তা বলাই বাহুল্য—ওর অত্যাচারের হাত থেকে লীচ আর জনসন পালিয়ে গেল ভেবে লারসেন খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মোট চারজন নাবিককেই আমরা হারিয়েছি। আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে চলতে লাগল। সারাদিন সীল শিকার নিয়েই আমরা ব্যস্ত রইলাম। এখন আমাদের মাঝে মাঝেই ছোটখাট ঝড়ের মুখে পড়তে হচ্ছিল। আমি এতদিনে একেবারে পাকা একজন নাবিক হয়ে উঠেছিলাম—একদিন তো সারাদিন ধরে আমিই 'ঘোস্ট'কে চালালাম, আবার সন্ধ্যেবেলায় শিকারি নৌকোগুলোকে জাহাজে ফিরিয়ে আনলাম। সব কিছুই এখন আবার ঠিক আগের মতো চলছিল। লারসেন লীচ্‌ আর জনসনের ওপর আবার নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল। ওরা দুজন এতদিনে পরিষ্কার বুঝে গেছিল যে যতদিন 'সীল' শিকারের 'সিজন' থাকবে ততদিন লারসেন ওদেরকে বাঁচিয়ে রেখে এভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাবে। একদিন সন্ধ্যেবেলা লীচ আমার কাছে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল—'মিঃ উইডেন, বলতে পারেন এখান থেকে জজ কতদূরে, আর 'ইয়োকোহামা'-ই বা এখান থেকে ঠিক কোন্‌দিকটায়?' আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। ওকে খুঁটিনাটি সব বলে দিলাম। পরদিন সকালে দেখা গেল জনসন আর লীচ সমেত তিন নম্বর নৌকোখানা অদৃশ্য হয়েছে। লারসেন রাগে, দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেল। জাহাজের সবকটা পাল তুলে দিয়ে ডাঙার দিকে—অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমে ছুটে চলল সে। তিনদিনের দিন দেখা গেল, বহুদূরে একখানা নৌকো ভেসে চলেছে। কাছে গিয়ে দেখা গেল এটা সম্পূর্ণ অন্য নৌকো—আর, তাতে আবার একজন মহিলাও আছেন। নৌকোটার চারজন যাত্রীকে তুলে আনার সময় মহিলাকে ভাল করে দেখলাম—এক মাথা বাদামি চুল, সেই রং-এর বড় বড় দুটি চোখ, সুন্দর, ধারাল একখানা মুখ। সুগঠিত, ছিপছিপে শরীর। ওকে দেখে যেন অন্য কোনো গ্রহের জীব বলে মনে হচ্ছিল—বহুদিন কোনো মহিলার মুখ দেখিনি, তাই প্রথমে খুব বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। লারসেন আমাকে মহিলাটির জন্য একটা ভাল দেখে কেবিনের বন্দোবস্ত করতে বলে দিল। মহিলাটি শারীরিক ক্লান্তি আর অবসাদের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেছিলেন—আমার হাতের ওপর ভর করে কোনোরকমে

কেবিনে পেঁছেই গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলেন তিনি। ইতিমধ্যে ডেক্ থেকে 'স্মোক'-এর তীক্ষ্ন গলা শোনা গেল—'নৌকো—একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে!' আমি খুব ভারাক্রান্ত মনে ডেকে উঠে এলাম। লারসেন আমাকে জিজ্ঞেস করল—'কি ব্যাপার হাম্প? ভদ্রমহিলা কে, কি নাম ওর—এসবের কোনো খোঁজ পেলে?' আমি উত্তর দিলাম—'না, কি করে জানব? মহিলা ভয়ানক ক্লান্ত ছিলেন, কেবিনে পেঁছেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমি একটা অন্য কথা আপনাকে বলতে এসেছি, লীচ আর জনসন যা করেছে, তার জন্য দায়ী আপনি নিজে। আপনার দুর্ব্যবহার আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই ওরা এরকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, ওদের সঙ্গে একবারটি ভাল ব্যবহার করে দেখুনই না। আমি কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, ওদের ওপর ফের যদি আপনি অত্যাচার করেন, তাহলে আমিই একদিন আপনাকে খুন করে বসব।'

লারসেন চেঁচিয়ে উঠল—'সাবাশ হাম্প, সাবাশ! এইতো, এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখে গেছ। এসো, তোমার সঙ্গে একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তি' করে ফেলি। আমি কথা দিচ্ছি, ওদেরকে আমি আর কিছুই বলব না। তার বদলে তুমি আর খুন করার চেষ্টা করবে না, কেমন?'

আমি সোৎসাহে জবাব দিলাম—'ঠিক আছে।' কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম—দেখলাম, ওর দুই চোখে চাপা শয়তানী খেলা করছে। তখন যদি ওর আমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির আসল অর্থটা বুঝতে পারতাম!

আমরা এতক্ষণে লীচদের নৌকোর একেবারে কাছে এসে গিয়েছিলাম। লীচ আর জনসনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল,—দেখলাম, ওদের চোখমুখ চরম হতাশা আর আতঙ্কে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। যখন ভাবছি যে এবার নিশ্চয়ই ওদেরকে জাহাজে তুলে নেওয়া হবে, তখনই লারসেনের হুকুমে আমাদের জাহাজখানা যেন লাফিয়ে উঠে ওদের সামনে দিয়ে বন্দুকের গুলির মতোই জোরে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে শুরু হয়েছে—পাহাড়ের সমান উঁচু ঢেউ সমানে এসে আছড়ে পড়ছে। লীচ্দের ঐ ছোট্ট নৌকোর পক্ষে এই অবস্থায় বেশিক্ষণ টিঁকে থাকা একেবারেই সম্ভব ছিল না। জনসন প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে আমাদের জাহাজের পেছনে আসতে লাগল। কিন্তু লারসেন এবার ওদের সঙ্গে যেন ঠিক ইঁদুর ধরার খেলা শুরু করল—ওদের নৌকো যতবার জাহাজের কাছে আসতে লাগল, ততবারই লারসেন জাহাজখানাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। পাক্কা দু'ঘণ্টা ধরে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলে চলল সে। তারপর হঠাৎ নামল অঝোরে

বৃষ্টি, তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। চারদিক ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। আবার যখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন জনসনদের নৌকোর আর কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটা যে কি ঘটছে—সেটা আমরা কেউ-ই প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর সবাই যেন তড়িতাহতের মতো চমকে উঠলাম, ফ্যাকাসে হয়ে গেল সকলের চোখমুখ। আমি এক লাফে লারসেনের সামনে গিয়ে বিকৃত স্বরে বলে উঠলাম—'কি হল, এটা কি ঘটল? আপনার প্রতিজ্ঞার কি হল?' লারসেন খুব ঠাণ্ডা মেজাজে হেসে উত্তর দিল—'কেন, প্রতিজ্ঞা তো রেখেছি। ওদের গায়ে কি আমি হাত তুলেছি, বা অন্য কোনোরকম অত্যাচার করেছি। তবে, ওদেরকে আমি জাহাজে তুলে নেব, এমন কোনো প্রতিজ্ঞা তো আমি করিনি, করেছি কি?'

ওর সঙ্গে কোনো কথা বলার মতো প্রবৃত্তি বা মানসিক অবস্থা আমার আর তখন ছিল না। তাই আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে সরে এলাম। সারা জাহাজ জুড়ে নেমে এলো একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। কিন্তু লারসেনকে এ বিষয়ে কিছু বলার সাহস কারোর-ই হল না।

দশম পরিচ্ছেদ

এবারের ঝড়টা আর বিশেষ বাড়ল না। যে নৌকোটা থেকে আমরা মহিলাটিকে তুলে আনলাম, তাতে আরো চারজন যাত্রী ছিল। তাদের সঙ্গে লারসেনের বেশ একচোট বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে গেল। তবে বলাই বাহুল্য যে, লারসেনের সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা তাদের ছিল না। লারসেনের চরিত্রের যে পরিচয় তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছিল, আর জাহাজের অন্যান্য নাবিকদের কাছে যা শুনেছিল, তাতেই তাদের সব সাহস উবে গিয়েছিল। খুব শিগগিরই ওরা বুঝে গেল যে, আপাততঃ ডাঙায় ফেরত যাওয়ার কোনোরকম সম্ভাবনাই তাদের নেই, এবং লারসেনের কথা না শুনে চললে কপালে খুব দুঃখ আছে। তাই লারসেন যখন তাদেরকে জাহাজের বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিল, তখন তারা প্রথমে খানিকটা গাঁইগুঁই করলেও শেষ পর্যন্ত সবাই লারসেনের কথা মেনে নিল।

ভদ্রমহিলা সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সে ঘুম তাঁর ভাঙল একেবারে পরের দিন সকালবেলায়। ওঁর নৌকোর সহযাত্রীদের কাছে শুনলাম, ওঁর নাম মিস ব্রুস্টার। ওঁর খাবারটা আমি আলাদা করে ওঁর কেবিনে দিয়ে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু লারসেন তাতে রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা এসে খাবার টেবিলে

বসা মাত্র সবাই চুপ করে গেল। লারসেন-ও প্রথমে চুপচাপই ছিল, তবে সেটা অবশ্যই লজ্জার মাথা খেয়ে নয়। আসলে সে এই ধরনের বা এই স্তরের মহিলাকে আগে খুব কাছ থেকে কখনো দেখেনি। তাই ও খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, আর একমনে মহিলাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা দুচারটে কথার পরেই জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা, আমরা 'ইয়াকোহামা পৌঁছচ্ছি কখন?' লারসেন খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিল—'এই, মাসচারেক বাদেই।' 'ভদ্রমহিলা তো এরকম অভাবনীয় কথা শুনে একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন—দারুণ চমকে উঠে বললেন—'সে কি? কখনো তা হয় নাকি? এই তো কাল জাহাজে ওঠার সময়েই শুনেছিলাম যে 'ইয়াকোহামা' এখান থেকে মাত্র একদিনের পথ। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না তো?'

লারসেন এবার বলে উঠল—'দেখুন, এ বিষয়ে আপনি বরং মিঃ উইডেনের সঙ্গে কথা বলুন। আমি তো নেহাৎই একজন নাবিক মাত্র। যা বলার, তা মিঃ উইডেন-ই বলবেন।'—কথাগুলো বলতে বলতে লারসেনের দুই চোখে একটা বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে গেল। ও বলে চলল—'তবে, কয়েকটা দিন না হয় আমাদের সঙ্গেই কাটিয়ে যান। দেখবেন, আপনার তাতে উপকারই হবে। আমাদের মিঃ উইডেনের কথাই ধরুন না। প্রথম যখন উনি আমাদের কাছে এলেন, তখন তো উনি নিজের থেকে দুপা হাঁটতেই পারতেন না। আর এখন উনি কথায় কথায় আমাকেই খুন করে ফেলার হুমকি দেন। কি বিপদ বলুন তো?'

যে সব সীল শিকারিরা এতক্ষণ চুপ করে বসে খাচ্ছিল, তারা এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল। অসহ্য, নিরুপায় রাগে আমার হাত পা কাঁপছিল, চোখ আর কান দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছিল। সেটা লক্ষ্য করে লারসেন বলতেই থাকল—'ঐ দেখুন, মিঃ উইডেন রাগে যেন একেবারে ফেটে পড়ছেন। তাছাড়া, মহিলাদের উপস্থিতিটাও ওঁর খুব একটা পছন্দসই নয়। নাঃ, আজ আমাকে 'ডেকে' খুবই সাবধানে চলাফেরা করতে হবে দেখছি!'

এতক্ষণে আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মুখ তুলে লারসেনকে খুব কড়াভাবে কিছু বলতে গিয়ে মিস ব্রুস্টারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আমার—দেখলাম, ওঁর দুই চোখে সহানুভূতির চাউনি ফুটে উঠেছে। লারসেন যে কি ধরনের মানুষ, সেটা এতক্ষণে উনি কিছুটা বুঝতে পারছিলেন। লারসেন যে আমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস শুরু করেছে, সেটাও উনি বুঝতে পেরেছেন। তবে, এই সঙ্গে ওঁর চোখদুটিতে একটা অনিশ্চয়তার ছায়াও খেলে গেল। উনি বলে উঠলেন—'যাক্‌গে, ফিরতি কোনো একটা জাহাজে উঠে পড়তে পারব নিশ্চয়ই।'

লারসেন একটু শুক্‌নো গলায় উত্তর দিল—'আপাততঃ এখান দিয়ে সীল শিকারি জাহাজ ছাড়া আর কিছুই যাবে না।' এতক্ষণে ভদ্রমহিলা, অর্থাৎ মিস ব্রুস্টার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। উনি স্বগতোক্তি করে উঠলেন—'আরে, আমার কাছে যে আর কোনো জামাকাপড়-ই নেই। আমি কি পুরুষদের মতো ভবঘুরে সেজে থাকব নাকি? না ঐ রকম ভাবে থাকতে আমি অভ্যস্ত?'

'যত তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, ততই ভাল।'—সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন, নীরস গলায় জানিয়ে দিল লারসেন। তারপর বলে উঠল—'ওঃ হো, ব্যাপারখানা এবার বুঝতে পেরেছি। ভ্যান উইডেনের মতো আপনিও নিশ্চয়ই জীবনে নিজের হাতে কোনোদিন কোনো কাজ করেননি, তাই না? খেটে খেতে তো হয়ই না, জীবনে কখনো একটা ডলারও নিজে উপার্জন করেননি। কি, ঠিক বলছি তো?'

মিস্ ব্রুস্টার খুব আস্তে আস্তে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ, তা করেছি। খুব ছোটবেলায় বাবা আমাকে পাঁচমিনিট চুপ করে থাকার জন্য একটা ডলার দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য আমি বছরে মোটামুটি ১৮শো ডলার আয় করি।'—ওঁর এই কথা শুনে দারুণ চম্‌কে গিয়ে সবাই একসঙ্গে ওঁর দিকে ফিরে তাকাল। লারসেন-ও খুব অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'তাই নাকি? তা, কি জিনিস তৈরি করেন আপনি?' এবার একগাল হেসে মিস্ ব্রুস্টার জানালেন—'কাগজ আর কালি—এই হচ্ছে আমার জিনিস তৈরি করার কাঁচামাল। আর হ্যাঁ, এছাড়া একটা টাইপরাইটার।'

এবার সব কিছুই আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। এ রকম অবস্থার মধ্যেও মনে মনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, সত্যি ভাগ্যের কি বিচিত্র যোগাযোগ! মিস্ ব্রুস্টারের দিকে তাকিয়ে খুব নিশ্চিতভাবে বললাম—'তার মানে, আপনিই সেই বিখ্যাত মহিলা কবি মড ব্রুস্টার!' মিস ব্রুস্টার খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়ে আমাকে পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন—'আপনি কি করে জানলেন?' আমি উত্তর দিলাম—'কি, ঠিক কথা বলেছি তো? আমার মনে আছে, আপনার একটা কবিতার বইয়ের আলোচনা করে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম—'আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মিস ব্রুস্টার বলে উঠলেন—'তার মানে, আপনি হলেন হাম্‌ফ্রি ভ্যান উইডেন! ঈস, কি আনন্দ যে হচ্ছে! তবে আপনি কিন্তু আমার কবিতাগুলোর খুব বেশি প্রশংসা করেছিলেন—অতটা প্রশংসার যোগ্য আমি নই।'

মুহূর্তের মধ্যে আমরা দুজনে গভীর ও বিস্তারিত সাহিত্য আলোচনার মধ্যে ডুবে গেলাম। লারসেন প্রথমটায় খুব হকচকিয়ে গিয়েছিল। পুরো ব্যাপারটা যে

কি ঘটছে তা বুঝতেই পারছিল না। তারপর আমরা যখন সাহিত্য আলোচনার মধ্যে তলিয়ে গেলাম, তখন ও একমনে আমাদের কথা শুনতে লাগল। সীল শিকারি নাবিকরা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। হঠাৎ এক সময় চমক ভেঙে দেখলাম, একমাত্র লারসেন-ই চুপ করে বসে আছে। আমরা থেমে যাওয়া মাত্রই লারসেন বলে উঠল—'আহা হাম্প, কি হল? থেমে গেলে কেন? যে আলোচনা হচ্ছিল, তা চলুক না কেন?' কিন্তু ওর চোখ দেখে আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে, লারসেন ভেতর ভেতর জ্বলে যাচ্ছে—কোনো না কোনো ভাবে ও এর বদলা নেবেই। তাই আমি একদম চুপ করে গিয়ে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। সারারাত ঘুম হল না—কেন, তা-ও ঠিক বুঝতে পারলাম না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আমাদের আলোচনার মধ্যে একেবারেই মাথা গলাতে না পেরে লারসেন যে মনে মনে কতখানি জ্বলছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরের দিনই। এবং তার ফল দাঁড়াল যেমন মারাত্মক, তেমনই করুণ। আমাদের সেই রাঁধুনি অর্থাৎ মাগ্রিজ ওর নোংরা পোশাক-আশাক আর জঘন্য রান্নার জন্য প্রায়ই সকলের কাছে গালাগাল আর ধমক খেত। এদিন সকালে দুর্ভাগ্যক্রমে মাগ্রিজ পড়ে গেল খোদ লারসেনেরই নজরে। ডেকে ওকে দেখেই লারসেন একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলল—'এই যে হতভাগ্য কুকি! তোর নোংরামি অনেকদিন সহ্য করেছি, আর নয়। আজ তোকে একবার জল-চিকিৎসা করাতেই হবে। এই, কারা আছিস, ওকে ধর তো। ওর জল-চিকিৎসা শুরু হোক।'

'জল-চিকিৎসা' ব্যাপারটা কি তা জেনে তো আমি আঁতকে উঠলাম। যাকে চিকিৎসা করা হয়, তার দু কাঁধের তলা দিয়ে দড়ি আটকে দিয়ে ডেক থেকে সমুদ্রে নামিয়ে জলে চোবানো হয়। জল-চিকিৎসার কথা শুনেই তো মাগ্রিজের চোখ মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল এক প্রাণান্তকর দৌড়াদৌড়ির নাটক। সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু তখন একটা দারুণ মজার খেলা বলে মনে হচ্ছিল। মাগ্রিজ যে এরকম খরগোসের মতো দৌড়তে পারে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল। সারা জাহাজময় দৌড়ে পালাতে লাগল সে, আর তাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল নাবিকের আর সীল শিকারির দল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ধরা পড়তেই হল মাগ্রিজকে। ওর দুই বগলের তলা দিয়ে দড়ি গলিয়ে ওকে সমুদ্রের জলে নামিয়ে চোবানো হতে

লাগল। মাগ্রিজ সারাক্ষণই পরিত্রাহী চীৎকার করে যাচ্ছিল। চুবুনি দেওয়ার এই খেলা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল 'হাঙর! হাঙর আসছে!' সত্যি সত্যি দেখা গেল, একটা হাঙর তীরবেগে সোজা মাগ্রিজের দিকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতিটা বদলে গেল। তাড়াতাড়ি মাগ্রিজকে জল থেকে তোলা হতে লাগল বটে, কিন্তু হাঙরটা আরো তাড়াতাড়ি মাগ্রিজের কাছে পৌঁছে গেল। লারসেন তার অমানুষিক শক্তি দিয়ে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে মাগ্রিজকে জল থেকে উঠিয়ে আনল বটে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই হাঙরটাও জল থেকে অনেকখানি লাফিয়ে উঠে মাগ্রিজের ঠিক পায়ের নিচে যেন একটা ঠোক্কর মারল, আর মাগ্রিজ তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। ওকে যখন ডেকে উঠিয়ে আনা হল, তখন দেখা গেল যে ওর ডান পায়ের গোড়ালিটা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, আর সেখান থেকে অঝোরে রক্ত পড়ছে। শোকে, দুঃখে, যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গিয়ে মাগ্রিজ ঠিক হিংস্র জন্তুর মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে সজোরে লারসেনের পা কামড়ে ধরল। লারসেন কিন্তু খুব শান্তভাবে মাগ্রিজের চোয়ালের দুদিকে দুটো আঙুল দিয়ে ধরে একটা চাপ দিল, আর মাগ্রিজের কামড়ও সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। এরপর লারসেন আমার দিকে ফিরে বলে উঠল—'বুঝলে হাম্প, কাটা জায়গাটায় ওষুধ লাগিয়ে বেশ ভাল করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও।' তাই করা হল। এবার আরো একটা পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষী হতে হল আমাকে। অপরাধী হাঙরটাকে মাংসের টুক্‌রোর টোপ দিয়ে ধরা হল। তারপর তার মুখটা ওপর নিচে টান টান করে হাঁ করিয়ে একটা লোহার গজাল এফোঁড় ওফোঁড় করে দুই চোয়ালের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে হাঙরটাকে আবার ছেড়ে দেওয়া হল সমুদ্রে। ১৬ ফুট লম্বা বিশাল জীবটাকে এভাবে ঠেলে দেওয়া হল এক ভয়াবহ, নির্মম মৃত্যুর দিকে। শরীরের সবটুকু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিল তিল করে অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে তাকে। আমার মনে হল, এ শাস্তিটা তাকে যে লোকটি দিল, তার নিজেরই এই পরিণতিটা হওয়া উচিত ছিল। মড-ও সমস্ত ব্যাপারটাই দেখল। আতঙ্কে, ঘেন্নায় দিশেহারা হয়ে এ নিয়ে লারসেনকে কিছু বলতেও গিয়েছিল সে। কিন্তু লারসেন ব্যাপারটার কোনোরকম গুরুত্বই দিল না—হাসতে হাসতে বলল, 'আরে ম্যাডাম, এটা একটা নিছক খেলা। হ্যাঁ, হাঙরটা অবশ্য আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না। দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে, তাই না?' মড আর কিছু না বলে মুখ কালো করে ফিরে এল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন বিকেলে ডেকের ওপর পায়চারি করছি, এমন সময় ফ্যাকাসে, বিবর্ণ মুখে মড এসে কাছে দাঁড়াল। তারপর আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি। গতকাল রাঁধুনি আর হাঙরটাকে নিয়ে যা ঘটল, তার মধ্যে কিছুটা আকস্মিক দুর্ঘটনা হয়ত ছিল। কিন্তু যেদিন আমরা এই জাহাজে এসে উঠি, সেদিন নাকি দুজন লোককে ঠাণ্ডা মাথায় সমুদ্রে ডুবিয়ে খুন করা হয়েছে ? আমাদের নৌকোতে যে ইঞ্জিনিরার ভদ্রলোক ছিলেন, তিনিই আমাকে সব কিছু জানিয়েছেন—ঘটনাটা পুরোপুরি তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। তাছাড়া, বেশ কিছু লোককে এখানে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আটকে রেখে কাজ করিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে। আপনি কেন এগুলো বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন, কেন আপত্তি করেননি ? আপনার কি নৈতিক সাহস বলে কিছুই নেই ?'

চুপ করে সব শুনলাম। তারপর আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, 'মিস্ ব্রুস্টার, যে জগতে আপনি এখন এসে পড়েছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণাই নেই। আমিও এখানে খুব বেশিদিন আসিনি, কিন্তু সব কিছু জেনে গেছি। কি রকম লোকের খপ্পরে এসে যে আপনি বা আমি পড়েছি, সেটা হয়ত আপনি এর মধ্যেই কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। কোনোরকম আপত্তি করলে বা প্রতিবাদ জানালে আমি আর একটা মৃতদেহের সংখ্যাই শুধু বাড়াতাম, কাজের কাজ কিছুই হত না। আপনাকেও আমি একটা অনুরোধ জানাচ্ছি, সেটা মন দিয়ে শুনে সেভাবে চলুন। এই জাহাজে যতদিন আছেন, ততদিন লারসেনের কোনো কথা বা কাজের বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ করবেন না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এখন কিছুই করণীয় নেই। ওকে তাচ্ছিল্যও দেখাবেন না বরং ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুর মতোই ব্যবহার করবেন, কথাবার্তা বলবেন। এটা ঠিক যে, লারসেন বহুরকম বিষয় নিয়েই গভীর-ভাবে আলোচনা করার ক্ষমতা রাখে। আবার সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, ও একটা নরদেহী দানব। তাই কখনো রাগাবেন না।' মডের সঙ্গে এই সব কথা বলতে বলতে নজরে এল, লারসেন ঠিক একটা বুনো, গর্বিত বাঘের মতো নিঃশব্দ, দ্রুত পদক্ষেপে আমাদের দিকেই আসছে। আমি একই ভাবে বলে চললাম—'আর হ্যাঁ, মিস ব্রুস্টার, ওর এই অসাধারণ প্রতিভা যে প্রথমে আমিই আবিষ্কার করেছিলাম, তার জন্য আমি সত্যিই গর্বিত।' কথাগুলো বলতে বলতেই লারসেনের দিকে ফিরে বললাম—'হ্যারিসের কথা বলছিলাম।'

লারসেন উত্তর দিল—'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। 'ফোর্জ'-এর লেখক তো ? দূর,

যত্তোসব ফাঁকা মানসিক আবেগে ভর্তি। ভাল কথা, মিঃ উইডেন, একবার 'কুকি'কে দেখে আসুন, খুব ছট্‌ফট্‌ করছে বেচারি।' আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, লারসেন আমাকে ওখান থেকে সরাতে চাইছে। অগত্যা গেলাম 'কুকি'র কাছে—দেখলাম, মর্ফিয়ার ঝোঁকে বেচারি বেহুঁস হয়ে ঘুমচ্ছে। বেশ খানিকটা সময় এদিক ওদিক ঘুরে ডেকে ফিরে এসে দেখি, মড ব্রুস্টার লারসেনের সঙ্গে খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন আলোচনা করছে। আমার পরামর্শ শুনেছে বলে একদিকে যেমন খুশি হয়ে উঠলাম অন্যদিকে আবার মনে মনে এই ভেবে একটু আঘাতও পেলাম যে, এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মড শেষ পর্যন্ত লারসেনের সঙ্গে এতটা মনোযোগ দিয়ে কথা বলতে পারছে।

এর পরের কয়েকটা দিন কেটে গেল নিরুপদ্রবেই। অবশ্য আমার মনের মধ্যে সমানে বয়ে চলছিল চিন্তার ঝড়। অনুকূল বাতাস পেয়ে আমাদের জাহাজ সীলদের ঝাঁকের একেবারে মধ্যেখানটিতে গিয়ে হাজির হল। তারই সঙ্গে দেখা দিল ঘন কুয়াশা। দিনের পর দিন সূর্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না, চারদিকের কিছুই দেখাও যাচ্ছিল না। হঠাৎ একদিন দম্‌কা বাতাসের ধাক্কায় কুয়াশা রেস গিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল ঝকঝকে রোদে ভরা আকাশ। দু'একদিন ভাল আবহাওয়া থাকার পর আবার আমরা ঢাকা পড়ছিলাম আদিঅন্তহীন কুয়াশার চাদরের মধ্যে। এই ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে 'ওয়েনরাইট' নামের সীল শিকারিটি তার দুজন লোকের সঙ্গে একটা নৌকো নিয়ে পালিয়ে গেল একদিন। ওদেরকে-ও অবশ্য লারসেন জোর করেই নিয়ে এসেছিল। আমিও সবসময়েই এই সুযোগটা পেতে চাইছিলাম। কিন্তু লারসেন কিছুতেই আমাকে সেরকম সুযোগ দিচ্ছিল না। আমি 'মেট' বলেই অসুবিধাটা বেশি হয়েছিল, কারণ নিয়ম অনুযায়ী 'মেট'দের কোনো নৌকোয় চাপবার কথা নয়। আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম যে সুযোগ পেলেই মড ব্রুস্টারকে সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকোয় উঠে পালিয়ে যাব। আস্তে আস্তে ঘটনা যে দিকে মোড় নিচ্ছিল, তাতে মড্‌-এরও তখুনি পালিয়ে যাওয়াটা খুবই দরকারী হয়ে পড়েছিল।

সমুদ্রের বুকে জাহাজে রোম্যান্সের অনেক রগ্‌রগে কাহিনী এককালে পড়েছি। তাতে সব সময়েই একটি মাত্র মেয়ে ও একাধিক পুরুষের গল্প থাকে। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতির সত্যি সত্যি সৃষ্টি হলে ব্যাপারটা যে আসলে কিরকম দাঁড়ায়, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। যে মড ব্রুস্টারের লেখা পড়ে এতদিন মুগ্ধ হয়েছি, এবার সশরীরে তার দেখা পেয়ে রক্তমাংসের মানুষটার ওপরেও সেরকমই মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। জাহাজের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মড যেন ছিল একটা

বৈপরীত্যের প্রতিমূর্তি। ও ছিল ছিপ্‌ছিপে, হালকা, মোহময়ী—যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া কোনো এক জীব। ওর হাঁটাচলা দেখে মনে হত যেন কোনো পাখি নিঃশব্দে ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভঙ্গুর কোনো সুন্দর ছবির সঙ্গেও ওর তুলনা করা যেত—একটু টোকা খেলেই যা ভেঙে যাবে। ওর কবিতার মতোই ওর শরীর-খানাও ছিল লাবণ্য আর সৌন্দর্যে ভরপুর। উলফ্‌ লারসেনের সঙ্গে ওর পার্থক্যটাই ছিল সত্যি চোখে পড়ার মতো। একদিন ওরা পাশাপাশি ডেক দিয়ে হেঁটে আসছিল। ওদের দেখে সৃষ্টিতে বিবর্তনবাদের সূত্রটা যে কত সত্যি তা একেবারে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছিল—একজন হল সমস্ত হিংস্রতা, বর্বরতার প্রতীক, আর অপরজন সৃষ্টির সুন্দরতম, নিখুঁত এক ফসল। লারসেনের বুদ্ধি অবশ্য ছিল ক্ষুরধার; কিন্তু সেই বুদ্ধির প্রায় সবটুকুই সে খরচ করত তার বর্বরোচিত অনুভূতিগুলোকে ঠিকমতো কাজে লাগানর জন্য। ওর চেহারা ছিল যেমন বলিষ্ঠ তেমনই পেশীবহুল; কিন্তু ওর চলাফেরা ছিল ঠিক যেন সদাসতর্ক, লঘুপদ কোনো হিংস্র, শিকারি জানোয়ারের মতো। ওর চোখে যে তীব্র চাউনি খেলা করে বেড়াত, তা আমি দেখেছি একমাত্র খাঁচায় বন্ধ চিতাবাঘের চোখেই।

মড ব্রুস্টারকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জাহাজের পুরুষ সাম্রাজ্যে একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েকজন একটু বেশি সাহসী সীল শিকারি তো খোলাখুলিভাবেই মডের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিল। তবে, লারসেনের ভয়ে কেউ কোনোরকম বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায়নি। কিন্তু সমস্যাটা দেখা দিচ্ছিল লারসেনকে নিয়েই। আমি লক্ষ্য করছিলাম, মড-এর প্রতি ওর মনোভাবটা ক্রমশঃ অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। ওর চোখ দেখেই আমি যা বোঝার তা বুঝে গেছিলাম। ওর দুই চোখের সেই তীব্র, কঠিন, ঠাণ্ডা চাউনি মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠছিল নরম, উষ্ণ, আবেশভরা এক চাউনি। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ওর ভেতরে শুরু হয়েছে এক প্রচণ্ড আলোড়ন। বলা বাহুল্য, মড ওর এই পরিবর্তন এবং তার আসল কারণ খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল, এবং তার ফলে মড ভীষণ ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। ওর দুই চোখে এই অসহায় আতঙ্কের চিহ্ন আমি খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। মডের এই চরম আতঙ্ক আমার মনকেও একটা অজানা, ভয়াবহ বিপদের আশঙ্কায় ভরিয়ে তুলল—আর তখনই বিদ্যুৎচমকের মতো বুঝতে পারলাম যে, মড ব্রুস্টারকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আতঙ্ক আর ভালবাসার আবেগে আমার সারা দেহ মন যেন থরথর করে কেঁপে উঠল—আমার শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল

পাগলের মতো। লারসেন আর মড আমার কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। লারসেন একটু দূরে সরে যাওয়া মাত্র মড কাঁপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে আমাকে বলে উঠল—'আমার ভয় করছে। দারুণ ভয় করছে আমার।'—আমি ওকে সাহস দেওয়ার জন্য সেই ভাবেই ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম—'সব ঠিক হয়ে যাবে, মিস্ ব্রুস্টার। আমাকে বিশ্বাস করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' আশ্বাস পেয়ে মড আমার দিকে তাকিয়ে একঝলক কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল—আমার মনে হল, আমার হৃদ্‌যন্ত্রটা যেন লাফিয়ে বাইরে চলে এলো। অনেকক্ষণ চুপ করে একা ডেকে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার জীবনেও প্রেম এলো—আর এলো এমন সময় যখন মানসিকভাবে আমি এর জন্য একেবারেই তৈরি ছিলাম না। আমার পরিচিত মহলে সবাই জানে যে আমার মধ্যে আবেগ, উত্তাপ, প্রেম—এ সব অনুভূতিগুলো একেবারেই নেই। আর সেই আমি কিনা প্রেমে পড়েছি! গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়ে কতক্ষণ যে ঐভাবে ডেকে দাঁড়িয়েছিলাম, তা জানি না। হঠাৎ লারসেনের তীব্র কণ্ঠস্বরে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমি মডকে ভালবাসি—এই সত্যটা আবিষ্কার করার পরের ২৪ ঘণ্টায় আমাদের জাহাজে যা ঘটে গেল, সেরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আগে কখনো ঘটে নি। পরেও আর কখনো ঘটবে বলে মনে হয় না। দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর জাহাজের 'হুইলে' যে নাবিকটি ছিল, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'জাহাজ! একটা জাহাজ সোজা এদিকেই আসছে!' ল্যাটিমার ভীতভাবে প্রশ্ন করল—'কোনো রাশিয়ান জাহাজ নয় তো?' লারসেন একটু মুচকি হেসে বলল—'কোনো চিন্তা করার দরকার নেই। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, জাহাজটার নাম 'ম্যাসিডোনিয়া', যার ক্যাপ্টেন হল আমার সুযোগ্য ভাই 'যম' লারসেন। এবং তার মানে হল, খুব শিগ্‌গিরই একটা বিরাট ঝামেলা বাধতে যাচ্ছে।'

আজকের দিনটা ছিল খুব পরিষ্কার—গত কয়েকদিনের ঝোড়ো আবহাওয়াটা এখন আর ছিল না। তাই সীল শিকারিরা যে যার নৌকো নিয়ে সমুদ্রে নেমে গেল—সামনে একটু দূরেই একটা প্রকাণ্ড সীলমাছের ঝাঁক দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যে 'ম্যাসিডোনিয়া' আমাদের ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। এবং এরপর যে

ঘটনা ঘটল, তাতে 'ম্যাসিডোনিয়া'র ক্যাপ্টেনকে যে কেন 'যম লারসেন', 'শয়তানের স্যাঙাত'-এ সব বিশেষণ দেওয়া হয়, তার কারণ বোঝা গেল। আমাদের জাহাজের নৌকোগুলো যেখানে গিয়ে সীল শিকার করবে ঠিক সেই জায়গাটিতেই 'ম্যাসিডোনিয়া' তার নিজস্ব সীল শিকারের নৌকোগুলোকে নামিয়ে দিল। এবং যেহেতু ওদের চোদ্দখানা নৌকোর বহর আমাদের নৌকোর বহরের চাইতে সংখ্যায় বেশি, তাই ওদের টপ্‌কে গিয়ে সীল শিকার করা আমাদের নৌকোগুলোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ চমৎকার আবহাওয়া, শান্ত সমুদ্র, অফুরন্ত সীলের ঝাঁক —সব মিলিয়ে এমন একটা দিন পাওয়া গিয়েছিল যা গোটা সীল শিকারের মরসুমে কদাচিৎ মেলে। আমাদের শিকারিরা অকথ্য ভাষায় 'যম লারসেন'কে গালাগাল দিতে দিতে জাহাজে ফিরে এলো। 'নেকড়ে লারসেন' এবার আমার দিকে ফিরল—মুখে তার বিদ্রূপের হাসি। একটু বাঁকা সুরেই আমাকে ও জিজ্ঞেস করল—'কি হল? ওদের মুখ থেকে এখন খুব উঁচু আদর্শ, বিশ্বাস, প্রেম এই সমস্ত বেরিয়ে আসছে, না?'

মড ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব মধুর স্বরে বলে উঠল—'ওদের বিশ্বাস, মৌলিক অধিকার—এগুলোর ওপর হঠাৎ একটা আঘাত পেয়েছে বলেই সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওরা।' লারসেন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উত্তর দিল—'ওসব কিচ্ছু না। ওরা এত গালিগালাজ, শাপ-শাপান্ত যে করে চলেছে, তার একমাত্র কারণ হল যে ওদের আরো টাকা কামানোর পথটা বন্ধ হয়ে আছে—বেশি টাকা মানে বেশি খাবার, আরো নরম গদিওয়ালা বিছানা, আরো সুন্দরীর সঙ্গে মেলামেশা—এক কথায়, পৃথিবীটাকে আরো বেশি উপভোগ করা। তাতে বাধা পড়েছে বলেই ওদের এত রাগ—বুঝলেন? কোনো আদর্শের জন্য রাগ নয়। আমারও তো আজ প্রায় ১৫০০ ডলারের মতো সীলের চামড়া হাতছাড়া হয়ে গেল। 'যম লারসেন' আমার নিজের ভাই হলে কি হবে, আমি বাগে পেলে ওকে নিশ্চয়ই খুন করে ফেলব। কাজে কাজেই, মিস ব্রুস্টার, ওসব ভাবাবেগে ভরা ছেঁদো কথা বলবেন না।' মড এতেও না দমে বরং একটু অনুনয়ের সুরে বলল—'আচ্ছা, আপনারা নিজেদেরকে শোধরাবার চেষ্টা করেন না কেন?' এবার লারসেন কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস হয়ে গেল। সুদূর সমুদ্রের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লারসেন জবাব দিল—'খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। আর শোধরানোর সময় নেই।'

পরের দিন লারসেন তার ভাইয়ের ওপর বদলাটা নিল বেশ ভালভাবেই।

ঘন কুয়াশার সুযোগ নিয়ে নিজেদের নৌকায় বন্দুকধারী সীল শিকারিদের পাঠিয়ে ম্যাসিডোনিয়ার প্রায় সবকটা নৌকার ওপর আচমকা বন্দুক চালিয়ে সেগুলোকে ঘায়েল করল সে। ম্যাসিডোনিয়ার বেশ কয়েকজন সীল শিকারিকে বন্দিও করা হল। ছোটখাটো একটা নৌযুদ্ধই সারাদিন ধরে চলল বলা যেতে পারে। নানাদিকে ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করার ফলে ম্যাসিডোনিয়া জাহাজের লোকেরা ঘন কুয়াশার আড়ালে পড়ে গিয়ে প্রথমটায় কিছু বুঝতেই পারেনি। লারসেন আবার ওদের একজন পাণ্ডাগোছের নাবিককে একটু লড়াইয়ের পর কথায় ভুলিয়ে জাহাজে তুলে এনে আটক করল। চট্‌পট্‌ সব কাজ সেরে ঘন কুয়াশার একেবারে ভেতরে ঢুকে গেল আমাদের 'ঘোস্ট'। লড়াইয়ে এই জয়টাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য পরের দিন লারসেন জাহাজে অফুরন্ত পানাহারের আসর বসাল। কোনো মানুষ যে এরকম অবিরাম হুইস্কী খেয়ে যেতে পারে, তা লারসেন আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। যাদের সঙ্গে কাল যুদ্ধ হল, তারাও এখন সকলের বন্ধু হয়ে গিয়ে আকণ্ঠ মদ গিলে যাচ্ছিল। হৈ হট্টগোল যখন পুরোদমে চলেছে, তখন হঠাৎ কুয়াশাটা পাতলা হয়ে যেতে দেখা গেল, ম্যাসিডোনিয়া হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজতে খুঁজতে খুব কাছ দিয়ে চলে গেল। মড বলে উঠল—'আমি যদি এখন চেঁচিয়ে ওদের ডাকি, তাহলে কি হবে?' লারসেন সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল—'আপনাকে আমি এত বেশি পছন্দ করি যে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারব না; কিন্তু হাম্পকে সঙ্গে সঙ্গেই খুন করে ফেলব।' সমস্ত কথাবার্তাটাই হালকা ভাবে হল বটে, কিন্তু মডের প্রতি ওর আচরণ বা মনোভাব যে একেবারে অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, তা ক্রমশঃই পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। লারসেন এদিন যেন ওর জীবনীশক্তি আর বুদ্ধিমত্তার একেবারে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে গেছিল। ও এদিন বারবার স্বীকার করল যে বিদ্রোহী, গর্বিত, স্বাধীনচেতা নরকের রাজা 'লুসিফার' বা শয়তানকেই ও সমর্থন করে সারা মনপ্রাণ দিয়ে। কিন্তু লারসেন যতই আসর জমিয়ে রাখুক, ওর চাউনি, হাবভাব মডকে ক্রমশঃই বেশি আতঙ্কগ্রস্ত, আর আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলল। খুব অস্থির মন নিয়েই রাত্রে শুতে গেলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ। অন্ধ এক অনুভূতির তাগিদে দৌড়ে গিয়ে মড-এর কেবিনের দরজাটা

একটানে খুলে ফেলে দেখি, লারসেন একটা হিংস্র জন্তুর মতো মডকে চেপে ধরেছে, আর মড সর্বশক্তি দিয়ে প্রাণপণে নিজেকে লারসেনের বাহুবন্ধন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আমার। এক লাফে লারসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে সজোরে ধাক্কা মারলাম। তাতে অবশ্য লারসেনের কিছুই হল না—বরং ও আমাকে এমন একটা ঠেলা মারল যে আমি ছিট্‌কে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। আমি অবশ্য তাতে ঘাবড়ালাম না একটুও। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ঘরের টেবিলে রাখা একটা বড় ছুরি তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে গেলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। লারসেন মডকে ছেড়ে দিয়ে মাতালের মতো টলতে শুরু করল—আর ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল চাপা গোঙানীর আওয়াজ। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে লারসেন যন্ত্রণা-বিকৃত স্বরে বলে উঠল—'হাম্প, আমার সেই পুরনো মাথার যন্ত্রণাটা ভয়ানক ভাবে চাড়া দিয়েছে। আমার ভয়ানক অসুস্থ লাগছে। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।' এই প্রথম লারসেনকে এত অসহায় অবস্থায় দেখলাম। ওকে ধরাধরি করে ওর কেবিনে পেঁাছে দিলাম। ইতিমধ্যে আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে, আমার এবার সুযোগ এসে গেছে। আর একটুও সময় নষ্ট না করে এখান থেকে পালাতে হবে। মডকে আমার প্ল্যানের কথা জানিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলাম—'কি, আমার সঙ্গে ৬০০ মাইল রাস্তা সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়ার মতো সাহস আছে তো?' এর উত্তরে মড খালি একটু হাসল আর তাতেই আমার প্রশ্নের সব জবাব পেয়ে গেলাম। একটা নৌকায় খাবারদাবার, জল, বিছানাপত্র এবং আরো সব দরকারী জিনিস বোঝাই করে মডকে নিয়ে সমুদ্রের জলে নৌকা ভাসালাম। এর আগে কখনো নৌকা চালাইনি, খালি অন্য লোককে চালাতে দেখেছি। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হচ্ছিল, তবে একটু পরেই ব্যাপারটা ধাতস্থ হয়ে গেল। এবার মড বলে উঠল—'হামফ্রে, তুমি সত্যিই সাহসী পুরুষ।' আমি উত্তর দিলাম—'না মড, আসলে তুমিই খুব সাহসী মেয়ে।' আমাদের নৌকা ক্রমশঃই আমাদের এতদিনকার আশ্রয় 'ঘোষ্ট' থেকে দূরে চলে যাচ্ছিল। শেষ-বারের মতো একবার জাহাজটার দিকে তাকালাম, সমুদ্রের ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে, জাহাজের সবাই ঘুমে অচেতন। আস্তে আস্তে 'ঘোষ্ট' আমাদের দৃষ্টি পথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমরা অন্ধকার অজানা সমুদ্রে গভীর রাতের বুক চিরে নিঃসঙ্গ ভাবে এগিয়ে চললাম।

আস্তে আস্তে ভোর হয়ে এল। মড এতক্ষণে নৌকার ভেতরে শুয়ে ছিল। এবার ও উঠে হাতমুখ ধুল, চুল আঁচড়ে ঠিকঠাক হয়ে নিল। আমার দেখে খুব আনন্দ হল

যে ও যতই আধুনিকা, স্বাবলম্বী হোক, ওর নারীসুলভ লাবণ্য, সৌন্দর্য আর কমনীয়তার কিন্তু তাতে একটুও হানি হয়নি। আমি জাহাজ থেকে নিয়ে আসা জামাকাপড়ের বাণ্ডিল থেকে একটা মোটা, জল নিরোধক শার্ট আর টুপি বার করে মডকে দিলাম। মড আমাকে বলল—'তুমি তো আর একলা সারাক্ষণ নৌকা বইতে পারবে না, আমাকেও নৌকা চালাতে শিখিয়ে দাও। আমরা জাহাজ চালাবার নিয়মেই পালা করে নজরদারি করব।'

আর একটু বেলা বাড়লে আমরা প্রাতঃরাশ সেরে নিলাম। খুবই সাদাসিধে, ঠাণ্ডা প্রাতঃরাশ। প্রাতঃরাশ শেষ হওয়ার পর আমি মডকে নৌকা চালানো শেখাতে শুরু করলাম। 'ঘোষ্ট'-এ থাকাকালীন জাহাজ চালাবার যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, সেটাই এখন কাজে লাগালাম। মড খুবই বুদ্ধিমতী,—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, কি করে দিক ঠিক রেখে নৌকা চালাতে হয়, সেটা শিখে নিল। খানিকক্ষণ পরে মড উঠে গিয়ে নৌকার ভেতরে ভাল করে বিছানা পেতে এসে আমাকে বলল—'এই যে মশাই বিছানা তৈরী। শুয়ে পড়ুন। এবার আমি নৌকা চালাব। রাতের খাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিন।' আমি অনেক আপত্তি করলাম, কিন্তু কোনো ফল হল না। বিশেষতঃ ওর বিশেষ একটা ভঙ্গিতে 'প্লীজ, প্লীজ' বলার পর আমার যে কোনোরকম বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকত না, সেটা ও ভাল করেই জানত। শোবার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম—জেগে উঠলাম সাত ঘণ্টা পর। এই দীর্ঘ সময়টায় বেচারী মড ঠাণ্ডায় আর ক্লান্তিতে একেবারে জমে গিয়েছিল। প্রথমেই দাঁড় থেকে ওর জমে যাওয়া আঙুলগুলোকে ছাড়িয়ে আনলাম। তারপর ওর আঙ্গুল, হাত, পা—এগুলিকে ঘষে ঘষে গরম করে দিলাম। গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিলাম। মড কপট রাগ দেখিয়ে বলল—'খবরদার বলছি, আমাকে একদম বকবে না কিন্তু।' আমিও ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললাম—'শোন, জাহাজের নাবিকরা যেমন ক্যাপ্টেনের কথা মেনে চলে, সেরকম ভাবেই আমার সব কথা বাধ্য হয়ে শুনবে। আর হ্যাঁ, যখন তখন 'প্লীজ, প্লীজ' বলা চলবে না।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন আমরা সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে চললাম। সমুদ্র কখনো শান্ত, কখনো বা অশান্ত—বাতাসও কখনো বা মৃদু, মনোরম, আবার কখনো বা সে বইত প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে। ঝড় যখন উঠত, তখন সমুদ্র ফুঁসে উঠত, আর আমাদের

নৌকাখানা ঠিক মোচার খোলার মতো টাল খেতে খেতে চলত। এক এক সময় মনে হত, আর রক্ষে নেই—সমুদ্র যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। মডকে প্রথমেই যে তেলতেলে জলনিরোধক পোশাকটা দিয়েছিলাম, তার ফলে ও একদম ভেজেনি। এছাড়া আমার পোশাক এবং নৌকার আর সব জিনিসপত্রই ভিজে একেবারে সপ্‌সপে হয়ে গিয়েছিল। মড ওর সাধ্যমতো আমাকে সাহায্য করত—নৌকায় যখন জল উঠত, তখন ও প্রায়ই সেই জল ছেঁকে ফেলার ভার নিত। ক্লান্তিতে, ঠাণ্ডায় একেবারে অসাড় হয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে ও হঠাৎ ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত। প্রায় প্রত্যেক রাতেই আমার ভয় হত, সকালে গিয়ে দেখব যে নৌকার ছইয়ের মধ্যে ও মরে পড়ে আছে। একবার প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ে আমি পুরো ৪৮ ঘণ্টা একনাগাড়ে জেগে রইলাম। আমাদের নৌকাখানা যে কি করে টিকে রইল, সেটা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রায় তিনদিন ধরে আমরা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ভেসে চললাম—কোথায়, কোনদিকে চলেছি তা বোঝার কোনো উপায়ই ছিলনা। অবশেষে তিনদিন পরে যখন রোদ উঠল, তখন দেখলাম যে আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল জাপানের উপকূল থেকে উল্টোদিকে চলে এসেছি—এই তিনদিন ১৫০ মাইল পথ ভেসে আমরা আবার 'ঘোষ্ট' জাহাজের কাছাকাছিই এসে পড়েছি। এরপর আবার শুরু হল ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন দিন—চোখের সামনে থেকে সব কিছু দৃশ্য যেন কে এক নিমেষে মুছে দিল। এই ভারী, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া আমাদের মনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলল। এমনকি মডও মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগল। কয়েকদিন বাদেই অবশ্য কুয়াশা কেটে গিয়ে চমৎকার আবহাওয়া পেলাম। আমরা ক্লান্তিহীন ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে টিকে রইলাম। মডের প্রতি আমার ভালবাসা ক্রমশঃ বেড়েই চলল—ওকে বিভিন্নরূপে কাছ থেকে যতই দেখতে লাগমাম, ততই ওর প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলাম। মডকে অবশ্য মুখ ফুটে আমার মনের কথা কিছুই বলিনি কখনো। আমি ওর চরম নির্ভীকতা দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেসলাম—চরম সংকটের মুখে পড়েও ওকে কখনো বিচলিত হতে দেখিনি।

কয়েকদিন আবহাওয়া ভাল থাকার পর আবার ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এইরকম একটা ঝড়ের সময়েই হঠাৎ আমার নজরে এল, কাছেই একটা উঁচু, কালো মতো কি একটা খাড়া হয়ে আছে—তার গায়ে গিয়ে ঢেউগুলো সজোরে আছাড় খেয়ে ভেঙে যাচ্ছে। দ্বীপ—নিঃসন্দেহে আমরা কোনো দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি। প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই মডকে ডেকে আনলাম। মড বলে উঠল—'আমরা আলাস্কায় পৌঁছে যাইনি তো?' আমি অবশ্য বেচারীকে

নিরাশ করে জানিয়ে দিলাম যে, সেটা একেবারেই অসম্ভই। তবে, ওকে মুখে খুব সাহস দেখালাম। বললাম, 'আমরা দুজনের কেউই সাঁতার না জানলেও চিন্তার কিছু নেই, দ্বীপটার খাড়া পাথরের মধ্যে কোনো ফাঁক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, সেইখান দিয়ে নৌকা চালিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ব।' মনে মনে কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের প্রাণের আশা খুব কম। সামনে খাড়া নিরেট পাথরের দেওয়াল, প্রবল স্রোতের টানে নৌকা সেদিকে এগিয়ে চলেছে। শিগগীরই নৌকাটা পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে। নিজের প্রাণের জন্যে কোনো ভয় হল না, তবে মডের কথা ভেবে খুব দুঃখ পেলাম। ঠিক করলাম, যখন দেখব আর কোনো আশা নেই, তখন প্রথম ও শেষবারের মতো মডকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওকে আমার ভালবাসার কথা জানাব, তারপর দুজনেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা শেষ চেষ্ট করে দেখব।

যখন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, তখনই হঠাৎ ভাগ্যদেবী অপ্রত্যাশিত ভাবে মুখ তুলে চাইলেন, প্রাণের আশা ফিরে পেলাম। আমি এতক্ষণ যে খাড়া দেওয়ালটা দেখছিলাম, সেটা আসলে দ্বীপটার একটা প্রান্তের বেরিয়ে আসা একটা প্রকাণ্ড পাথর। আসলে দ্বীপটা বেশ খানিকটা ভেতরে। দ্বীপের তটভূমি একেবারে সমতল, সমুদ্রও সেখানে পুকুরের জলের মতো শান্ত, ঠিক একটা বন্দরের জলের মতো। আরো একটু এগোতেই প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে কানে একেবারে তালা লেগে যাওয়ার মতো হল। সামনে তাকিয়ে দেখি, দ্বীপের বেলাভূমিতে যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য সীলমাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুঝলাম যে আমরা এসে পড়েছি সীলদের একটা বড় আস্তানা বা 'রুকারী'তে। যাই হোক, আমাদের নৌকা খানিকক্ষণের মধ্যেই তীরের শক্ত মাটিতে গিয়ে ধাক্কা খেল। আমি লাফিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়ে হাত ধরে মডকে নামিয়ে আনলাম। এতদিন ধরে নৌকায় থেকে সমুদ্রের দোলা খাওয়ার ফলে মাটিতে নেমেও বেশ খানিকক্ষণ আমাদের শরীরের দুলুনি থামল না। একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই আমাদের রক্ষাকর্তা এই দ্বীপটার নাম আমরা দিলাম 'এনডেভার আইল্যাণ্ড'। একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর ভাবলাম, কফি তৈরী করব। কিন্তু হতাশভাবে আবিষ্কার করলাম, আমার কাছে দেশলাই-এর চিহ্নমাত্র নেই। ফলে গরম জল বা গরম কফি কোনোটাই ভাগ্যে জুটল না। এর পরে ভাবলাম, দ্বীপের চারদিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি। সঙ্গে সঙ্গেই মড গোঁ ধরল যে সে-ও সঙ্গে যাবে। আমি যতবারই না বলি, ততবারই ও 'প্লিজ, প্লিজ' বলে জেদ করে। যাই হোক, সেদিন আর ঘুরতে বেরোলাম না। নৌকার পালগুলো দিয়ে মড-এর জন্য একটা তাঁবু তৈরী করতে চেষ্টা

করলাম অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু যতবারই তাঁবু খাটালাম ততবারই জোর বাতাসে আর জলের ঝাপটায় সেটা ভেঙে যেতে লাগল। অগত্যা নৌকাটাকে তীরে তুলে এনে ভাল করে আটকে দিয়ে সেখানেই শোবার ব্যবস্থা করলাম। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাথায় একটা দারুণ মতলব খেলে গেল। বহুদিন পরে গতকাল চরম অনিশ্চয়তা ও বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে একটু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমানর ফলেই বোধহয় মগজ আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিল। গুলির কার্তুজ থেকে বারুদটা বার করে নিয়ে সেটার খানিকটা কাগজের ওপর রাখলাম। তারপর বারুদের ওপর 'ক্যাপ' রেখে পাথর দিয়ে বাড়ি মারতেই কাগজটায় আগুন ধরে গেল। তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত কাগজটার ওপর কাঠকুটো চাপিয়ে বেশ ভাল করে আগুন জ্বালালাম। মড আমার এই উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করল। এবার বেশ আরাম করে গরম কফি আর খাবার খেয়ে আমরা দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বেরোলাম। সারা দ্বীপটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু হাজার হাজার সীল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না—একেবারে জনমানবশূন্য একটা দ্বীপ। মড তো বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। আমি নানারকম কথাবার্তা বলে, আবার ওকে চাঙ্গা করে তুললাম। রাতে নৌকার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার জীবনের এই আমূল পরিবর্তনের কথা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম। অল্প কিছুদিন আগেও জীবনে কখনো কারো দায়িত্ব নিইনি, এমনকি নিজেরও নয়। 'ঘোষ্ট'-এ এসে ওঠবার পরে প্রথম নিজের দায়িত্ব নিজেকে নিতে হয়েছিল। আর এখন আবার আর একজনের—মড-এর দায়িত্বও আমাকে নিতে হচ্ছে। এবং এটাই আমার জীবনের সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, কারণ মডই সারা পৃথিবীতে আমার জন্য একমাত্র নারী। অসহায়া, আমার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা নারী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

দু সপ্তাহ ধরে অক্লান্ত খেটে দ্বীপের একটু উঁচুতে একটা কুটির তৈরী করলাম। পাথর বয়ে এনে তার দেওয়াল তৈরী করলাম, আর নৌকার দাঁড়গুলো দিয়ে বানালাম ছাদের কড়ি বরগা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ছাদের আচ্ছাদন নিয়ে। শ্যাওলা বা ঘাস দিয়ে জল ঝড় আটকানো যাবেনা, নৌকার পালগুলো দিয়েও নয়। একমাত্র উপায় হল সীলের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করা। মুস্কিলটা হল, আমি কোনোদিন সীল শিকার করিনি। মডও এরকম একটা নিষ্ঠুর কাজের ঘোর বিরোধী।

কিন্তু উপায় নেই, গরজ বড় বালাই। অগত্যা ঠিক করলাম, যে করেই হোক সীলের চামড়া জোগাড় করতেই হবে। তিরিশটা গুলি খরচ করে মাত্র তিনটে সীল মারা পড়ল। আমি দেখলাম যে এভাবে চললে খুব শিগ্‌গীরই আমার আর একটি গুলিও অবশিষ্ট থাকবে না। তাই এবার সিদ্ধান্ত নিলাম, যতগুলো চামড়ার দরকার ততগুলো সীলকে দাঁড় দিয়ে পিটিয়ে মারব। পরের দিন থেকে আমাদের অভিযান শুরু হল। প্রথমে সাংঘাতিক ভুল করে একটা প্রকাণ্ড বড় সীলের কাছাকাছি গিয়েছিলাম, সেটা আবার একটা বড় সীল পরিবারের কর্তা। ওটাকে শিকার করতে গিয়ে আমি নিজেই আর একটু হলে ওরই শিকার হয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে ওর দিকে এগোতে দেখেই হতভাগাটা জ্বলন্ত চোখে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে তাড়া করে এসে আমাকে একদম আমাদের নৌকায় তুলে দিল। এরপর অবশ্য আমি সাবধান হয়ে গেলাম। ঠিক করলাম, সীলদের পরিবারগুলো যেখানে একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে আছে, সেদিকে যাবই না। ওদের থেকে দূরে অনেক দলছুট মদ্দা সীল একা একা ঘুরে বেড়ায়। সীল পরিবারের বুড়ো কর্তারা এইসব ছোক্‌রা সীলকে কাছাকাছি ঘেঁসতেই দেয় না। এই সব নিঃসঙ্গ তরুণ মদ্দা সীলকে বলা হয় 'হলাশ্‌চিকি'। বলা বাহুল্য, মড এবার আর আমার সঙ্গ ছাড়ল না। দুজনে দুটো দাঁড় হাতে নিয়ে সন্তর্পণে এগোলাম। সীল পরিবারগুলোর একপাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন তাদের প্রচণ্ড চিৎকার আর ঝগড়াঝাঁটি দেখে মড তো ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল—ওকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চলতে লাগলাম। ওকে এইভাবে আমার কাছে আশ্রয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমি যেন এতদিনে একজন খাঁটি পুরুষ মানুষ হয়ে উঠেছি। আমার আদিম পুরুষ সত্ত্বা যেন এবার ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। আমার মনে হল, পৃথিবীর যে কোনো শক্তির সঙ্গে আমি নির্ভয়ে লড়ে যেতে রাজি আছি। আমার দৃঢ়তা দেখে মড-এর মনেও সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। মনে মনে লারসেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম—আমার আজকের স্বভাবের এই আমূল পরিবর্তনের জন্য সে-ই দায়ী। দ্বীপের মাঝামাঝি আমরা অনেকগুলো কমবয়সী নিঃসঙ্গ সীলের দেখা পেলাম। আমি তাদের মধ্যে একটাকে তাড়া দিয়ে আলাদা করে ফেললাম। মড্‌-এর পাশ দিয়ে অবশ্য অনেকগুলো সীল পালিয়ে গেল—ওর দয়া হচ্ছিল বলে কাউকেই তাড়া দিতে পারছিল না। যাই হোক, অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা বারো সীল আমার হাতে মারা পড়ল। সেগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে নিলাম। বার কয়েক এরকম অভিযান চালানর ফলেই কুটিরের ছাদের আচ্ছাদন করার মতো যথেষ্ট পরিমাণে সীলের চামড়া জোগাড় করে ফেললাম। কুটিরে ফিরে আসবার সময়

মড বলে উঠল 'মনে হচ্ছে ঠিক যেন নিজের বাড়িতে ফিরে আসছি।' আমি বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন সারাটা জীবনই এইভাবে এখানেই কাটিয়েছি—শিকার আর লড়াই করে।' এরপরেই আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'আর তুমি, তুমিই হচ্ছ আমার নিজস্ব নারী, আমার সঙ্গিনী।' কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, 'আর তুমি, তুমিও কিন্তু হাসিমুখে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ।' মড কিন্তু বুঝতে পারল যে আমি অন্য কোনো কথা বলতে যাচ্ছিলাম। সে-ও বোধহয় এই পরিবেশে অন্য ধরনের কিছু কথাই আমার কাছ থেকে আশা করেছিল। মনে হল, ও যেন একটু হতাশ হল। এরপরে আমরা নানারকম কথাবার্তা বলতে বলতে ফিরে এলাম। আমার মনে কিন্তু সারাদিন সারারাত গুণগুণ করে বেজে চলল—'তুমি আমারই নারী, আমার একান্ত সঙ্গিনী।'

প্রথম কুটিরটা তৈরী হয়ে গেলে তার গায়েই দ্বিতীয় কুটিরটা তৈরী করার কাজে হাত দিলাম। এটা হবে আমার কুটির। প্রত্যেকদিন সকালবেলায় আমরা দুজনে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রই এখন বেশ শান্ত ছিল। তীরের ধার ঘেঁষে গিয়ে সুবিধামতো জায়গায় নৌকা লাগিয়ে দ্বীপে উঠে যেতাম। তারপর দুপুরবেলা নৌকা ভর্তি করে সীলের চামড়া আর দরকার মতো মাংস নিয়ে আসতাম। ফিরে এসে আমি কুটির তৈরী করতে লেগে যেতাম আর মড সীলের তেল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মাংস রান্না করত। শুকনো সীলের মাংস ঝলসে খেতে যে এত সুস্বাদু লাগে, তা কখনো ভাবিই নি। মডও আমার সঙ্গে সমানে সারাদিন খাটত। রান্না করা ছাড়াও আমাকে কুটির তৈরী করার ব্যাপারে নানারকম সাহায্য করত, হাতে হাতে জিনিসপত্র জুগিয়ে দিত। অবশেষে একদিন দুটি কুটিরই তৈরী হয়ে গেল। আমি এর মধ্যে শুক্‌নো শ্যাওলা লতাপাতা আর খড়কুটো দিয়ে মড-এর জন্য একটা বেশ আরামদায়ক নরম গদিও বানিয়ে ফেলেছিলাম। সভ্য জগতের চোখে হয়ত কুটির দুটোকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে মনে হবে; কিন্তু যে ভাবে আমরা জল ও ঝড়ের নিচে এতদিন কাটিয়েছি, তাতে এই কুটির দুটোই আমাদের কাছে পৃথিবীর দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর। সেই রাতে শুতে যাওয়ার আগে মড হঠাৎ বলে উঠল, 'হাম্‌ফ্রে, কিছু একটা ব্যাপার কিন্তু শিগ্‌গীরই ঘটতে চলেছে। সেটা ভাল কি খারাপ, তা আমি জানিনা। তবে ওখানে, ঐদিক থেকে সেটা ঘটতে চলেছে।' বলে সে সমুদ্রের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরের দিন সকালে কি রকম একটা নতুন ধরনের অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠলাম। বহু দিন পরে এই প্রথম আমরা কুয়াশা বা জলের ঝাপটার কবল এড়িয়ে কোনো আচ্ছাদনের নিচে শুলাম। তাড়াতাড়ি কুটির থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে তীরের দিকে চোখ পড়তেই যেন মাথায় একটা প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমাদের থেকে একশো গজের মধ্যে মাস্তুল ভাঙা, হালে কালো রং করা একটা জাহাজ এসে তীরে ভিড়েছে। জাহাজটা অন্য কোনো জলযান নয়—'দি ঘোষ্ট!' আমি তো আতঙ্কে বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অবশ হয়ে রইলাম, ভাগ্যের একি বিচিত্র পরিহাস! পেছনে, পাশের দিকে তাকালাম, দ্বীপের কালো কালো খাড়া পাথরগুলো যেন হতাশার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। ঘুমন্ত মডকে জাগালাম না। 'ঘোষ্ট'কে দেখতে পেলে ওর মনে হবে, ও বোধহয় সত্যিই কোনো অশরীরীর দেখা পেয়েছে! আমি প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলাম, লারসেন কিংবা জাহাজের নাবিকদের কেউ দ্বীপে নেমে আসবে। কিন্তু জাহাজে কোনো নড়াচড়ার লক্ষণ দেখলাম না। মনে হল, সবাই বোধহয় তখনো ঘুমিয়ে আছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল, মডকে নিয়ে এখুনি নৌকায় চড়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু তারপরেই অন্য একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল। জাহাজের সবাই তো ঘুমিয়ে আছে। এই সুযোগে নিঃশব্দে জাহাজে উঠে লারসেনকে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করলে কেমন হয়? বড় ছুরি আর বন্দুকটা নিয়ে চুপি-চুপি জাহাজে উঠে গেলাম। উঠেই বুঝতে পারলাম, জাহাজে কোনো লোক নেই, সবাই জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে। জাহাজে একটা নৌকাও নেই। খুব তাড়াতাড়ি করে সবাই যে জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে, সেটাও বুঝতে পারলাম। দারুণ খুশি হয়ে উঠলাম, জাহাজটা এখন তাহলে আমার আর মডেরই দখলে। কিন্তু রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং লারসেন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা আমার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। আমার শরীরে ভয়ের কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল—লারসেন সম্বন্ধে সেই পুরনো আতঙ্ক আবার আমাকে গ্রাস করে ফেলল। কিন্তু আমাকে যে এক্ষুণি কিছু একটা করতে হবে, সেটা ভুলিনি। বন্দুকের ঘোড়া তুলে নলটা লারসেনের দিকে তাক করলাম। লারসেন নড়াচড়া করলে হয়ত আমি ওকে গুলি করতে পারতাম। কিন্তু ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকল। এবার আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, লারসেনের চোখমুখ একেবারে ফ্যাকাসে, বিবর্ণ

দেখাচ্ছে, ওর দু চোখে কি রকম একটা অদ্ভুত ফাঁকা দৃষ্টি। আমি এত কিছু চিন্তা করলাম, যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই তার জন্য, ওর দিকে এগিয়েও গেলাম, কিন্তু কিছুতেই ওকে গুলি করতে পারলাম না। এবার লারসেন বলে উঠল—'কি হল, আমাকে গুলি করলে না? আমি জানি তোমার পক্ষে গুলি করা সম্ভব নয়। তুমি ভীতু নও কিন্তু অক্ষম। তোমার নীতিবোধের জন্য কোনো নিরস্ত্র, অসহায় লোককে তুমি গুলি করতেই পারবে না। যাকগে, বন্দুকটা সরিয়ে নাও। এই জায়গাটার নাম কি? মড কোথায়? নাকি এতদিনে সে মিসেস উইডেন হয়ে গিয়েছে?'

ওকে গুলি করতে না পারার জন্য আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। যাই হোক, মনের ভাব মনেই চেপে রেখে উত্তর দিলাম—'এই জায়গাটার নাম 'এন্‌ডেভার' দ্বীপ। অন্ততঃ আমরা দ্বীপটার এই নামই রেখেছি। মড দ্বীপেই আছে। কিন্তু তুমি একলা কেন? আর সব লোকজন কোথায় গেল?'

লারসেন এবার বেশ স্থিরভাবে উত্তর দিল, 'আমার সুযোগ্য ভাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে পেয়ে গিয়েছিল। গভীর রাতে যখন ডেকে প্রায় কেউই ছিলনা, তখনই ও আমাদের জাহাজে চড়াও হয়। আমার জাহাজে যে সব সীল শিকারিরা ছিল, তারা ভাইয়ের কাছ থেকে বেশি অর্থের অতিশ্রুতি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে চলে গেল। জাহাজের অন্যান্য মাঝি-মাল্লা আর কর্মচারীরাও চলে গেল তাদের সঙ্গে। যাওয়ার আগে পা-কাটা 'কুকি' নিজের হাতে মাস্তুলগুলো কেটে দিয়ে গেল। আমাকে আমারই নিজের জাহাজে একলা ফেলে রেখে সরে পড়ল সবাই।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মাথার সেই যন্ত্রণাটা কেমন আছে?' লারসেন জবাব দিল, 'মাথার যন্ত্রণাটা হয়েই চলেছে। এই এখনো তো হচ্ছে।' গলার আওয়াজেই টের পাওয়া যাচ্ছিল যে, শারীরিকভাবে লারসেন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। ডেকের মাঝখানে গিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল সে। আমি এই সুযোগে ওর ঘরে গিয়ে ওর রিভলবারটা হস্তগত করলাম। এরপর ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে যতটা পারলাম খাবার দাবার জোগাড় করলাম। মাংস, শাকসব্‌জি কিছুই বাদ দিলাম না। রান্নার বাসনপত্র, কফি এগুলোও নিলাম। ডেকে ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে শুয়ে থাকা লারসেনের প্যাণ্টের পকেট থেকে ওর বড় ছুরিটাও বার করে নিলাম। এরপর জাহাজ থেকে নেমে দ্বীপে ফিরে গেলাম। মড এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করছিল, কোনো কিছু টের পায়নি। আমি যখন জাহাজ থেকে নিয়ে আসা নানারকম খাবার, মার্মালেড-এ সমস্ত ওর সামনে সাজিয়ে রাখলাম তখন ও তো দারুণ অবাক হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে তীরের দিকে চোখ ফেরাতেই 'ঘোষ্ট'কে

দেখতে পেল সে, আর সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চোখমুখ। দুই চোখে ফিরে এল সেই পুরনো আতঙ্কের চাউনি। ফিসফিস করে আমাকে কোনোরকমে বলে উঠল—'হাম্‌ফ্রি, একি ?' আমি বেশি কথা না বলে শুধু ঘাড়টা নাড়লাম।

আমরা প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলাম, লারসেন এবার জাহাজ থেকে নেমে আসবে। কিন্তু তিনদিনের মধ্যে একবারও দেখা পেলাম না। অগত্যা চারদিনের দিন আমি আবার জাহাজে গিয়ে উঠলাম। লারসেনের কেবিনে গিয়ে ওকে ডাকলাম। লারসেনের শরীর একরকম থাকলেও দেখলাম যে ও খুব বিষণ্ণ, চুপচাপ হয়ে আছে। এর পরে আবার এক সপ্তাহ কেটে গেল, লারসেনকে নিয়ে আমি আর মড নানারকম আলোচায় মেতে রইলাম। কিন্তু লারসেনের দেখাই পাওয়া গেল না। জাহাজের রান্নাঘর থেকে কোনোরকম ধোঁয়াও বেরোতে দেখলাম না। আমি আবার জাহাজে উঠে ভাঁড়ার ঘর থেকে খাবারদাবার জোগাড় করলাম। ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে লারসেনের দেখা পেলাম—ওর হাবভাব দেখেই বুঝলাম, চরম হতাশা ওকে গ্রাস করেছে। মাথা নাড়তে নাড়তে ও গোঙাচ্ছিল, 'ওঃ ভগবান! ভগবান!' ওকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম, এবার দেখলাম ও একেবারে বাদুড়ের মতো অন্ধ হয়ে গিয়েছে। ও আমার হাঁটাচলার আওয়াজ শুনে ভাবল আমি বোধহয় এখনো ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই আছি। সঙ্গে সঙ্গেই ও হাতড়ে হাতড়ে ভাঁড়ার ঘরের দোরগোড়ায় এসে ঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলে আটকে রাখতে চাইল। আমিও আবার একপ্রস্থ খাবার দাবার জোগাড় করে দ্বীপে ফিরে এলাম।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মড এর মধ্যে একদিন আমাকে বলল যে, 'ঘোষ্টের যদি মাস্তুলটা ঠিক থাকত, তাহলে ঐ জাহাজে চড়েই হয়ত লোকালয়ে পেঁছে যাওয়া যেত।'—মডের এই কথায় আমার মাথায় বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা বুদ্ধি এসে গেল। নিজের মনেই বলে যেতে লাগলাম—'ঠিক তো! নিশ্চয়ই এটা করা যেতে পারে! অন্যে যা করতে পারে আমিই বা তা করতে পারব না কেন? কোনো কিছুতে পিছ্‌পা হওয়ার পাত্র আমি নই।'

আমাকে নিজের মনে কথা বলে যেতে দেখে মড বলে উঠল—'আরে ব্যাপরটা কি? কি বলে যাচ্ছ আপন মনে? কি করতে চাইছ তুমি?' আমি যেন এতক্ষণ

একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এবার মডের দিকে ফিরে বললাম—'শোন, মড। 'ঘোষ্ট'-এ আবার মাস্তুল চড়িয়ে, পাল খাটিয়ে ঠিকঠাক করে নেব। তারপর সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাব। লারসেন তো এখন অক্ষম, অন্ধ।' খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাগুলো বলে কি কি কাজ করতে হবে, তার একটা তালিকা তৈরী করতে বসে গেলাম। প্রধান মাস্তুল বা 'মেইন মাষ্ট'টাকে খাড়া করাটাই সবচাইতে কঠিন কাজ—তার জন্য যোগানের বন্দোবস্ত করতে হবে বহু সময় নিয়ে। এছাড়া 'ক্রস-টি-হেড'-টাকেও ঠিকঠাক করতে হবে। পরের দিনই কাজ শুরু করে দিলাম। প্রথমে এতদিনকার জঞ্জাল সাফাইয়ে লাগলাম—কাঠকুটো, ভাঙাচোরা লোহার টুকরোয় সমস্ত জায়গাটা ভর্তি হয়েছিল। অনেক জায়গায় বেঁকেচুরে গিয়েছিল, সেখানে হাতুড়ি পিটিয়ে ঠিকঠাক করলাম। আমার কাজকর্ম, হাতুড়ি পেটার আওয়াজে লারসেন কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—'কি হল, হাম্প? কি করছ? আমার জাহাজকে আমার হয়ে ভেঙে খুলে ফেলছ নাকি?' আমি উত্তর দিলাম—'ঠিক উল্টো কাজটাই করছি—জাহাজটাকে সারিয়ে তুলছি।' লারসেন সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বলল—'খবরদার ওসব করতে যেওনা। আমি তোমাকে আমার জাহাজে হাত লাগাতে একদম বারণ করছি। যেখানে যে জিনিস যেভাবে আছে, সবকিছু সেভাবেই থাকতে দাও।' আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কেন, তুমি কি এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে চাওনা?' তাতে লারসেন জবাব দিল—'না, একেবারেই না। আমি এখানেই মরতে চাই।' 'কিন্তু আমি তা চাইনা'—এই কথা বলে লারসেনকে থামিয়ে দিয়ে আমি আবার হাতুড়ি পেটা শুরু করলাম। এরপর কয়েকদিন ধরে আমি প্রচণ্ড খাটলাম। মডও ওর সাধ্যমতো আমাকে সাহায্য করল। 'মেইন মাষ্ট' অর্থাৎ প্রধান মাস্তুলটাকে ঠিক আবার আগের মতো করে বসানোটাই খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমার অধ্যবসায়েরই জয় হল—মাস্তুলটা ঠিক জায়গায় খাড়া করা গেল। অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আর উপকরণও সারানো হয়ে গিয়েছিল এতদিনে। আমার এতদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ফল এবার বোঝা যাচ্ছিল—জাহাজটাকে এবার বেশ চালাবার উপযোগী সভ্য, ভদ্র জলযান বলে মনে হচ্ছিল। হালকা মেজাজে মডের সঙ্গে অনেক হাসি ঠাট্টা করলাম। সেদিনকার মতো দ্বীপে ফিরে যাওয়ার আগে জাহাজটাকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখে নিলাম—নাঃ, সারানর কোনো কাজই আর বাকী নেই।

এত হাসিঠাট্টার ফল পেলাম হাতে নাতেই। পরের দিন মড সকালে কুটির থেকে বেরিয়ে এসে জাহাজের দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল—'হাম্‌ফ্রি, সর্বনাশ হয়ে

গেছে! জাহাজটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। মাস্তুলের চিহ্নমাত্র নেই।' তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে যা দেখলাম, তাতে আমার মন একেবারে দমে গেল। লারসেন জাহাজটার একেবারে দফারফা করে রেখেছে। পুরো জাহাজটাকে বেশ কিছুদিনের জন্য অকেজো করে রেখে দিয়েছে সে। দড়িদড়াগুলো ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে, অন্যান্য সাজসরঞ্জামগুলোও ভাঙাচোরা, হতশ্রী। সব ঘুরে দেখে এসে আমি বললাম—'নাঃ, লারসেনকে এবার সত্যিই খুন করে ফেলতে হবে।' চরম হতাশায় ভেঙে পড়লাম আমি। কিন্তু মড কাছে এসে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—'কিছু ভেবনা, হাম্‌ফ্রি। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কেন শুধু শুধু অকারণে মন খারাপ করছ?'

মডের সান্ত্বনায় আমার সমস্ত ক্লান্তি, হতাশা যেন এক নিমেষে চলে গেল। ভাবলাম, কুছ পরোয়া নেই। মাস্তুলগুলো নিশ্চয়ই কাছাকাছি সমুদ্রে কোথাও ভাসছে। সেগুলো নৌকায় করে গিয়ে তুলে আনলেই হবে। এমন সময় দেখি লারসেন এদিকেই আসছে। আমি একদম নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে মডকে ডেকে বললাম—'ওকে একদম কিছু বুঝতে দিওনা। ও যেন মনে না করে যে আমরা খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি।' লারসেন আমাদের খুব কাছে এসে গেলে আমরা ওর সঙ্গে লুকোচুরি শুরু করে দিলাম—মুখে কোনো কথা না বলে এদিক ওদিক সরে গেলাম। লারসেন কিন্তু চেঁচিয়ে বলে উঠল—'আরে আমি জানি, বুঝতে পেরেছি যে তোমরা জাহাজেই এখনো আছ।' ওকে দেখে এখন আমার রাতচরা অন্ধ প্যাঁচার কথা মনে হচ্ছিল, যারা অন্ধকারে নিজেদের ডাকের আওয়াজে পথ চিনে নেয়। দুষ্টু রাক্ষসের সামনে থেকে যেমন সবাই সরে যায়, আমরাও তেমনি সারা ডেকময় ঘুরে ঘুরে ওকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত লারসেন বিরক্ত হয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে গেল।

ঝাড়া দুদিন ধরে আমি আর মড সমুদ্রে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মাস্তুলের ভাসমান টুকরোগুলোকে খুঁজে পেলাম। সেগুলোকে নৌকার সঙ্গে ভাল করে বেঁধে নিয়ে যখন ফিরে আসছি, তখন সমুদ্রে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। দমকা হাওয়ার ধাক্কায় আমাদের নৌকা বাহির সমুদ্রের দিকে ভেসে চলে যেতে থাকল। নৌকার বোঝা কমানর জন্য একবার ঠিক করলাম, মাস্তুলের টুকরোগুলোকে খুলে দিয়ে আবার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব। কিন্তু মড কিছুতেই তা করতে দিল না—ওর সেই মোক্ষম অস্ত্র 'প্লীজ, প্লীজ' বলে আমাকে থামিয়ে দিল। সারারাত ধরে আমরা খোলা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ঠাণ্ডায় কাঁপতে লাগলাম। সকাল হলে দেখলাম,

দ্বীপ থেকে আমরা পাক্কা পনেরো মাইল দূরে চলে এসেছি। যাই হোক ভাগ্যক্রমে এবার আবার অনুকূল বাতাস বইতে লাগল, আমরা ভাসতে ভাসতে একসময় আবার দ্বীপে ফিরে এলাম। ক্ষিদে আর তেষ্টায় এতক্ষণে আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে হাতপা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজনেই। পরের দিনটাও পুরোপুরি বিশ্রাম নিলাম। তারপর জাহাজে ফিরে গিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার জাহাজ সারাইয়ের কাজ শুরু করে দিলাম। দিনরাত খেটে তিল তিল করে আবার সব তৈরী করতে লাগলাম। লারসেন এসে আমার কাছেই বসে থাকত, নানারকম কথাবার্তা বলত। আমি কিন্তু সারাক্ষণ সতর্ক থাকতাম। একদিন রাতে ও আবার চুপিচুপি এসে সারানর সাজ-সরঞ্জাম সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। আমি ঠিক ওর পেছনেই ছিলাম, বলে উঠলাম—'লারসেন, যথেষ্ট হয়েছে। প্রাণের মায়া থাকে তো কোনো জিনিসে হাত দিওনা।' বলতে বলতে শব্দ করে আমার রিভলভারে গুলি ভরলাম। লারসেন প্রথমে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে উঠল। কিন্তু আমি এবার মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। খুব কঠিন স্বরে ওকে বললাম, 'লারসেন, আমি তোমাকে খুন করবার একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। নাও, গিয়ে জিনিসপত্রগুলো ফেলে দিয়ে আমাকে সেই সুযোগটা করে দাও।' লারসেন কিন্তু এবার থমকে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কেবিনে ফিরে গেল সে। আমি সারারাত ওখানেই থেকে জেগে পাহারা দিলাম। পরের দিন সকালে মড বলল—'হামফ্রি, এভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারেনা! কিছু একটা করতে হবে।' কিন্তু খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল। আমি সারাইয়ের কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় লারসেন টলতে টলতে এসে সিঁড়ির কাছে পড়ে গেল। ওঠবার কোনোরকম চেষ্টা না করে বাঁকাচোরা ভাবে পড়ে রইল সে। আমি ফিসফিস করে মডকে বললাম—'আবার ওর সেই মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।' মডের মনেও ওর অবস্থা দেখে দুঃখ হল। আমি ওর কাছে গিয়ে বসে পড়ে ওর নাড়ী টিপে দেখলাম, নাড়ীর গতি একেবারে স্বাভাবিক। আমার মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই লারসেন ঠিক ইস্পাতের সাঁড়াশীর মতো একটা হাত দিয়ে অমানুষিক জোরে আমাকে চেপে ধরল। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলাম। হিংসা আর আমাকে ধরতে পারার আনন্দ—এই দুই অভিব্যক্তি একসঙ্গে মিশে গিয়ে ওর মুখটা এখন দেখাচ্ছিল ঠিক একটা পিশাচের মতো। এবার অন্য হাতটাও তুলে আমাকে আরো জোরে চেপে ধরল সে। আমার আর নড়াচড়া করার

ক্ষমতাও রইল না। আস্তে আস্তে একটা হাত দিয়ে আমার গলাটা প্রাণপণে টিপে ধরল লারসেন। ক্রমশঃ আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আমার অবস্থা দেখে মড প্রাণপণে দৌড়ে সীল মারবার ডাণ্ডাটা নিয়ে আসতে গেল। কিন্তু লারসেন আমকে ছেড়ে দিয়ে ডেকের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল—ওর হাতের বজ্রকঠিন চাপও আমার গলা থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল। ইতিমধ্যে মড ডাণ্ডাটা নিয়ে ফিরে এসেছিল। এত বিপদের মধ্যেও মড ডাণ্ডাটা নিয়ে ফিরে এসেছিল। এত বিপদের মধ্যেও মড যেন আমার চোখে নতুন হয়ে দেখা দিল—আমার মনে হল, মড আমার সত্যিকারের সঙ্গিনী। আদিম যুগের গুহামানবকে বাঁচাতে তার সঙ্গিনী যে ভাবে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ত, শিক্ষিতা মড তার সমস্ত সংস্কৃতি, আভিজাত্য ভুলে ঠিক সে ভাবেই আমাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমি উঠে দাঁড়াতেই মড এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল। আমি আস্তে আস্তে বললাম—'লারসেন এবার সত্যি সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তোমার বেলায় যা ঘটেছিল, আমার বেলাতেও ঠিক তাই ঘটেছে—হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওর মগজে চোট্ লেগেছে। এরকম একটা চোট লেগেই লারসেন শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেটা মনে আছে তো?' যাইহোক, এবার আমরা আর কোনো ঝুঁকি নিলাম না। দুজনে মিলে ওর অচৈতন্য দেহটাকে টেনে ওর কেবিন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। এবার ওর হাত ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

লারসেনকে বন্দি করার পর জাহাজ সারানোর কাজ খুব নিরুপদ্রবেই এগিয়ে চলল। এই অসুখের পর লারসেনের শরীরের একটা দিক অবশ হয়ে গিয়েছিল। এখন লারসেন সত্যি সত্যিই জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু ওর মনের জোর ঠিক আগেকার মতোই ছিল—ওর মধ্যে যে মানুষটা ছিল, তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অদম্য লারসেনের ভয়াবহতা সেরকমই রইল।

আমার জাহাজ সারাইয়ের কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে লারসেনের ওপর আর একবার রোগের আক্রমণ ঘটল। লারসেন এবার কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলল। ওর হাসিটাও কেমন যেন বেঁকে গেল। ও এখন বাঁ হাত দিয়ে কোনোরকমে কাঁপা কাঁপা হাতে ও কি বলতে চাইছে, সেটা কাগজে লিখে জানাত।

ক্রমে শীতের দিন এগিয়ে এল। আরম্ভ হল ঝড়, বৃষ্টি আর তুষারপাত। আমি উদয়াস্ত ডেকের ওপরেই থেকে একটানা কাজ করে যেতাম। মড ওর সাধ্যমতো আমাকে

সাহায্য করত, হাতের কাছে খাবার দাবার এনে দিত। অবশেষে মাস্তুলগুলো ঠিকঠাক হয়ে গেল। সব চাইতে বড় প্রধান মাস্তুল বা মেইন মাষ্টকে জল থেকে তোলা হল। তারপর অমানুষিক পরিশ্রম করে সেটাকে তুলে ঠিক জায়গায় লাগালাম। মডও প্রাণপণে খাটল। কাজ করতে করতে হঠাৎ কিছু পুড়ে যাওয়ার একটা তীব্র গন্ধ নাকে এল। জাহাজে কোথাও আগুন লেগেছে। আমি অবশ্য এই রকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেই রেখেছিলাম। একদৌড় লারসেনের কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার ধারণাই ঠিক, লারসেন ওর বাঁ হাত দিয়ে কোনোরকমে দেশলাই জ্বালিয়ে বিছানার গদীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমি আর মড তাড়াতাড়ি আগুনটা নিভিয়ে ফেললাম। লারসেন এই সময় কাগজ আর পেন্সিল চেয়ে নিয়ে তাতে লিখল—'হাম্প, আমি কিন্তু পুরোপুরিই টিকে আছি। আমার মাথা পরিষ্কার আছে। জীবনে কখনো বোধহয় এত ভালভাবে চিন্তা করিনি। আমি সব কিছু দেখে হাসছি।' আমার মনে হল, কবরের ভেতর থেকে যেন কেউ আমাকে খবর পাঠাচ্ছে। লারসেনের শরীরটাই যেন একটা কবরখানা, তার মধ্যে ওর আত্মা নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে।

লারসেনের অবস্থা প্রতিদিনই বেশ খারাপ হতে থাকল। এবার ওর শরীরের বাঁ দিকটা সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেল। কিন্তু ও আবার লিখল—'যখন বেদনাটা থাকে না, তখন আমি খুব পরিষ্কারভাবে সব কিছু চিন্তা করতে পারি। জীবন, মৃত্যু এ সব নিয়ে আমি এখন হিন্দু ঋষিদের মতোই গভীরভাবে ভাবছি।' মড ওকে জিজ্ঞেস করল—'আত্মার অমরত্ব নিয়েও কি ভাবছেন?' লারসেন সঙ্গে সঙ্গে লিখে জবাব দিল—'বোগাস।' শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লারসেন তার মতে অপরাজিতই থেকে গেল। আস্তে আস্তে লারসেনের জীবনদীপ নিভে আসতে লাগল, ওর নড়াচড়াও থেমে গেল। কিন্তু আমি যখন কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেন করলাম—'তুমি কি এখনো চিন্তা, মন, সব কিছু নিয়েই তোমার মধ্যে আছ?' তখন সঙ্গে সঙ্গেই ওর ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল। খুব অস্ফুট, ক্ষীণ স্বরে ও উত্তর দিল—'হ্যাঁ।' বুঝলাম, সেই দুর্ধর্ষ দুর্দম নেকড়ে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। জৈবিক ভাবে লারসেনের শরীরকে আর জীবিত বলা যাচ্ছিল না; কিন্তু ওর এই রক্ত মাংসের নিশ্চল দেহসৌধের ভেতরে ওর চেতনা, মন এগুলো সক্রিয় ছিল। আমার মনে হল, লারসেন যেন এক নিরাবয়ব মস্তিষ্ক।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমরা এবার সমুদ্রে ভেসে পড়ার জন্য তৈরি হলাম। ঘোষ্ট-কে সারিয়ে তোলবার কাজ এতদিনে পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাস্তুল, পাল, দড়িদড়া—সবই ঠিকঠাক মতো খাটানো হয়েছিল। এতদিনে মডের প্রতি আমার ভালবাসা আমার সমস্ত সংযম আর ধৈর্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল—আমি ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম। মডও সেটা খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরে গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত সে।

ঘোষ্টকে তীরের চড়া থেকে সমুদ্রে ভাসানোর কাজটা খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জোয়ারের সময় জাহাজটা খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। তার পরেই উঠল প্রচণ্ড ঝড়। ঝোড়ো বাতাসে জাহাজের পালগুলো টানটান হয়ে উঠল, ঘোষ্ট ছুটে চলল দুরন্ত গতিতে। আমি এতদিনে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছিলাম। এতদিনকার কাজ শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র গভীর অবসাদ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেলাম। প্রায় একটা পুরো দিন পরে আমার ঘুম ভাঙল। জেগে উঠে দেখি, মড লারসেনের কেবিনে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। লারসেন পরম প্রশান্তিতে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড ঝড় যখন চলছিল তখনই ওর জীবনদীপ পুরোপুরি নিভে গিয়েছে। মড বলে উঠল, 'ও কিন্তু মরেনি। ও এখন মুক্ত, স্বাধীন এক আত্মা।'

পরের দিন সকালে প্রাতঃরাশের পর লারসেনের দেহ ডেকে তুলে আনলাম। আমি বললাম, 'আমি অন্তিম প্রার্থনার খালি একটা লাইন-ই জানি—তা হল, তার দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে।' ঠিক এই প্রার্থনাই লারসেন নিজে তার এক মৃত সহকর্মীর উদ্দেশে করেছিল। এরপর লারসেনের দেহ চটে মুড়ে, পায়ে ভারী লোহার ওজন বেঁধে আমরা রেলিং টপকে সমুদ্রে ছেড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের গর্তে তলিয়ে গেল লারসেন। মড ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'বিদায়, গর্বিত লুসিফার। হে মুক্ত আত্মা, বিদায়।'

ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দুজনে মিলে লারসেনের বৈচিত্র্যময় চরিত্রের কথা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম মাইল তিনেক দূরে একটা ছোট ষ্টীমার চলেছে, এবং সেটা সোজা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ষ্টীমারটা আর একটু কাছে এলে বুঝতে পারলাম, সেটা আমেরিকান রাজস্ব বিভাগের জলযান। আমি মডের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, 'যাক্, তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলাম। তবে, আমি জানি না এতে আমি খুশি কিনা।' কথাগুলো শেষ হওয়ার

আগেই দেখি, মড আমার বাহু বন্ধনে ধরা পড়ে আছে। এবার আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কি কিছু বলার দরকার আছে? যা আমি তোমাকে বলতে চাই, তা কি আর বলতে হবে?' মড উত্তর দিল—'না, বলে কিছু বোঝাবার দরকার নেই। তবে, কানে ঐ সব কথাগুলো শুনতে বড় মিষ্টি লাগবে।'

এতদিন পরে, এই প্রথম মডকে গভীর ভাবে চুমু খেলাম তারপর ধরা গলায় বলে উঠলাম, 'তুমি—তুমিই আমার নিজস্ব নারী, আমার একমাত্র সঙ্গিনী। আমার ছোট্ট সোনা।'

মড পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল—ওর আয়ত দুই চোখের ঘন পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপছিল। এবার সেও চাপা গলায় উত্তর দিল—'আর তুমি, তুমিই হচ্ছ আমার পুরুষ, আমার একমাত্র সঙ্গী।'

ষ্টীমারটা এতক্ষণে প্রায় আমাদের জাহাজের পাশেই এসে গিয়েছিল। আমাদের ষ্টীমারে তুলে নেওয়ার জন্য একটা নৌকাও সেখান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। আমি বললাম—'মড, সোনা আমার, আর একটা চুমু আমাকে দাও। এখুনি ওরা এসে পড়বে।'

'—আর আমাদের হাত থেকেই আমাদের বাঁচাবে'—দুষ্টু হাসি হেসে উত্তর দিল মড। গভীর প্রেমের আলোয় ওর সমস্ত চোখমুখ ঝলমল করে উঠল।

THE MEXICAN

বিপ্লবী

ছেলেটাকে কেউই চিনত না, বিপ্লবী 'জুন্টা'র কর্তাব্যক্তিরা তো নয়ই। ও ছিল এক রহস্যময় দেশপ্রেমিক, যে মেক্সিকোর আসন্ন বিপ্লবের জন্য কোনো কিছুই করতে পিছ্‌পা নয়। জুন্টার কর্তারা অবশ্য ওকে প্রথম প্রথম খুবই সন্দেহের চোখে দেখতেন—অনেকেরই ধারণা ছিল, ছেলেটা বোধ হয় ডায়াজের গোপন নিরাপত্তা বাহিনীর-ই গুপ্তচর। ওদের বহু বিপ্লবী সহকর্মী এইভাবে ধরা পড়ে মারা গিয়েছে—তাই ওরা এখন সব আগন্তুককেই সন্দেহের চোখে দেখে।

ছেলেটার বয়স ছিল খুবই কম—আঠারো বছরের বেশি কিছুতেই নয়। জুন্টার নেতাদের কাছে এসে ও জানাল, ওর নাম ফিলিপ রিভেরো, এবং ও বিপ্লবের জন্য কাজ করতে চায়। কথা কটি বলেই ও চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—আর কোনো অনাবশ্যক কথাই ওর ভাবলেশহীন মুখ থেকে বেরোল না। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল জীবনে কখনো বোধহয় ও হাসেনি, এবং দয়ামায়া জাতীয় কোনোরকম মানবিক অনুভূতিই ওর মধ্যে নেই। ওর কঠিন, নিষ্ঠুর মুখখানার দিকে তাকিয়ে পলিন ভেরার মতো দুঃসাহসী লোকও ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন—তাঁর মনে হল, কোনো ভয়াবহ, রহস্যময় জীব যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সব চাইতে সাংঘাতিক ছিল ছেলেটার চোখদুটো—কালো দুই চোখের তারায় যেন বিষাক্ত সাপের হিংস্রতা খেলা করছিল, কি এক অসীম তিক্ততায় ভরা চাপা আগুনে যেন চোখদুটো জ্বলছিল। জুন্টার কর্তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন—কি করা উচিত, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, সন্দেহের দোলায় দুলছিলেন। আগন্তুক যে আর পাঁচটা সাধারণ বিপ্লবী ছেলের মতো নয়, এটা অবশ্য তাঁরা সকলেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত খামখেয়ালি, আবেগপ্রবণ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠলেন—'ঠিক আছে। তুমি তো বিপ্লবের জন্য কাজ করতে চাও? তাহলে গায়ের কোটটা খুলে ফেল। তোমাকে বালতি আর কাপড় দিচ্ছি, এই ঘরের নোংরা মেঝেটা পরিষ্কার করে ফেল। জানালা, পিকদানী—এগুলোও সাফ সুতরো করে দাও।

'এ কাজ কি বিপ্লবের জন্যই ?'—জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই'—উত্তর দিলেন ভেরা।

ছেলেটা সন্দেহের চোখে সবার দিকে তাকাল। তারপর কোটটা খুলতে খুলতে বলল—'ঠিক আছে।' ব্যাস আর কোনো কথাই তার মুখ থেকে বেরোল না। এবং এই কাজ নিয়ে আর কোনোদিন কাউকে কিছু বলতেও হয়নি। প্রত্যেকদিন পরিপাটি করে সমস্ত জায়গাটা সে পরিষ্কার করে রাখত। আর কোনো লোক ঘুম থেকে ওঠবার আগেই শুরু হয়ে যেত তার কাজ,—উনুনের ছাই পরিষ্কার করে, আগুন জ্বালিয়ে সে সব ঠিকঠাক করে রাখত নিখুঁতভাবে। একবারই মাত্র সে একটা অনুরোধ জানিয়েছিল—রাতে এই জায়গাতেই শুতে চেয়েছিল। কিন্তু তার এই অনুরোধ শুনেই জুণ্টার কর্তারা একেবারে আঁতকে উঠেছিলেন—তাঁরা ভাবলেন, ছেলেটা তাহলে নিশ্চয়ই ডায়াজ-এর গুপ্তচর। এই ঘরে শুতে চেয়ে হতভাগা ওঁদের সমস্ত গোপন খবর, ঠিকানা জেনে নিতে চাইছে। বলা বাহুল্য, ছেলেটার অনুরোধ ওঁরা রাখলেন না। ছেলেটাও দ্বিতীয়বার এই নিয়ে আর কিছু বলেনি। রিভেরো, অর্থাৎ এই ছেলেটা—রাতে যে কোথায় শুত, কোথায় খেত—তা কেউই জানত না। একবার ওকে দু ডলার করে পারিশ্রমিক দিতে চাওয়া হয়েছিল। রিভেরো খালি এই ক'টি কথা বলেই সে প্রস্তাব বাতিল করে দিল—'আমি বিপ্লবের জন্য কাজ করছি।'

জুণ্টার এই সময় পয়সাকড়ির দারুণ টানাটানি চলছিল। দু'মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়েছিল, বাড়িওয়ালা উচ্ছেদের ভয় দেখাচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ একদিন রিভেরো এসে মে শেথবির টেবিলের ওপর ষাটটা ডলার রেখে দিল। ডাক-টিকিট কেনার পয়সার অভাবে তিনশো চিঠি ছাড়া যাচ্ছিল না। চিঠিগুলো ছিল খুবই জরুরি,—বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা, আমেরিকার দূতাবাসের কাছে প্রতিবাদপত্র,—এ সবই চিঠিগুলোর মধ্যে ছিল। শেথবির আঙুলের আংটি, ভেরার ঘড়ি,—সবই ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ওরা একদিন এই নিয়ে আলোচনা করছে, এমন সময় রিভেরো হঠাৎ বেরিয়ে গেল। ফিরে এল হাজার খানেক দু'সেণ্টের ডাকটিকিট নিয়ে। এতেও জুণ্টার কয়েকজনের মনে নতুন করে সন্দেহ হল—ছেলেটা কি গুপ্তচর বলেই চিঠিগুলো পাঠানর জন্য আগ্রহী ? রিভেরো কিন্তু বারবার জুণ্টাকে টাকাপয়সা এনে সাহায্য করতে লাগল। তবে এত কিছু করা সত্ত্বেও রিভেরো জুণ্টার কর্তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারল না বা চাইল না। ওকে কেউ কোনো প্রশ্ন করুক এটা রিভেরো আদৌ পছন্দ করত না, এবং কর্তাদেরও ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হত না। ওর

সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্য মাঝেমাঝেই হত। শেথবি বলত, 'ছেলেটার মধ্যে কোনোরকম মানবিক অনুভূতিই নেই—হাসিঠাট্টা, আমোদ, এ সবই ওর জীবন থেকে যেন চিরতরে মুছে গিয়েছে। প্রাণহীন একটা শবের মতো ছেলেটা ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু খুব ভীতিপ্রদভাবেই জীবিত।' ভেরা অবশ্য প্রথম থেকেই রিভেরোর ওপর সহানুভূতি-শীল ছিল। সে মন্তব্য করত, 'বেচারি নিশ্চয়ই ওর জীবনে এমন অসহ্য নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে যে ওর জীবনের সুকুমার কোমল দিকগুলো চিরদিনের জন্য ও হারিয়ে ফেলেছে। তবে এটা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, রিভেরো কখনোই গুপ্তচর নয়, বরং আমাদের সকলের চাইতে বেশি দেশপ্রেমিক। ওর মধ্যে কোনো দয়ামায়া নেই। ওর দুচোখেও আমি দেখতে পাই বুনো জন্তুর হিংস্র চাউনি। আমি যদি কোনোরকম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করি, তবে আমাকে খুন করতে ও এক মুহূর্তও দ্বিধা করবে না। ও ইস্পাতের মতো কঠিন, বরফের মতো ঠাণ্ডা। আমি ডায়াজ আর তার খুনি বাহিনীকে ভয় করি না, কিন্তু এই ছেলেটাকে ভয় করি। ও যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত।'

শেষ পর্যন্ত ভেরাই রিভেরোকে একটা খুব গোপনীয়, গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিল। লস এঞ্জেলস ও ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে বিপ্লবীদের যে যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল, তা ভেঙে পড়েছিল। জুয়ান আলভারেডো বলে একজন কম্যাণ্ডার সব ঘাঁটিগুলো ভেঙে দিচ্ছিল। লোকটা ছিল অসাধরণ ধূর্ত, সাক্ষাৎ শয়তান। রিভেরোর ওপর ভার পড়ল পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার। কাজ শেষ করে রিভেরো যখন ফিরে এল, তখন দেখা গেল যে যোগাযোগের ব্যবস্থা আবার পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে। জুয়ান আলভারেডোর মৃতদেহটা বুকে আমূল ছোরা বেঁধা অবস্থায় পাওয়া গেল তার বিছানাতেই। এই নিয়ে কেউ কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও ভেরা বলল—'ডায়াজের সত্যিকারের আতঙ্কের কারণ যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে এই রিভেরো। ও হচ্ছে আপোষহীন, নিঃসঙ্গ এক বিপ্লবী, ভগবানের ন্যায়দণ্ডের মতোই অমোঘ।'

রিভেরো যে অত্যন্ত বদমেজাজি আর উগ্র স্বভাব, সেটা ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। প্রায়ই দেখা যেত, ওর সারা মুখে, গালে গাঢ় কালসিটে পড়েছে, ঠোঁট ফাটা, কান ফোলা। নিশ্চয়ই এগুলো যে যে জায়গায় রিভেরো থাকত, সেখানকারই মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামার চিহ্ন। মাঝে মাঝেই বেশ কিছুদিনের জন্য রিভেরো কোথায় যেন উধাও হয়ে যেত—যখন ফিরে আসত, তখন ওর কাছে অবধারিত ভাবেই বেশ কিছু টাকাকড়ি থাকত। এই পয়সার সবটাই রিভেরো

মে শেথবির হাতে তুলে দিত। র‍্যামোস আর আরেল্লা এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত ছিল যে, রিভেরো খুব নিচু জগতের এক সন্দেহজনক চরিত্রের জীব। ভেরা কিন্তু আশ্চর্য হয়ে বলত, এত টাকাপয়সা রিভেরো পায় কি করে? কোথায় যে রিভেরো এইভাবে চলে যেত, কেনই বা যেত,—সেটা ও কাউকেই বলত না, বা তা নিয়ে কোনো রকম কৈফিয়তও দিত না। ওকে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহসও কারো ছিল না। একবার র‍্যামোস বলেছিল, রিভেরোর গতিবিধি জানাবার জন্য ওর পেছনে গুপ্তচর লাগানো উচিত তাতে ভেরা উত্তর দিয়েছিল, সে নিজে অন্ততঃ সেই গুপ্তচর হওয়ার কাজটা করবে না, কারণ তাহলে তাকে নির্ঘাত প্রাণ দিতে হবে রিভেরোর হাতে। ভেরা আরো বলেছিল, স্বয়ং ভগবান এলেও রিভেরোকে তার গোঁ থেকে নড়াতে পারবে না। রিভেরো হল বিপ্লবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি, বিপ্লবের আগুন, বিপ্লবের আত্মা।

দুই

বিপ্লব এতদিনে খুব অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই বিপ্লবের সবটুকুই নির্ভর করেছিল জুন্টার ওপর। কিন্তু জুন্টা এখন চরম অর্থাভাবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এখনই অর্থের প্রয়োজন ছিল খুব বেশি। চারদিকে বিদ্রোহীরা তৈরি হয়ে আছে, অথচ তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে। কিন্তু সেই অস্ত্র জোগাড় করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। জুন্টার কর্তারা একদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে ভারাক্রান্ত মনে সেই আলোচনাই করেছিলেন—তাহলে কি শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে এত দিনের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে, আসন্ন বিপ্লব কি শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে? অত্যাচারী ডায়াজের হাত থেকে মেক্সিকোকে মুক্ত করা কি তাহলে স্বপ্নই থেকে যাবে? ওঁদের মধ্যে এই সব কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় ঘর মুছতে মুছতে হঠাৎ রিভেরো মুখ তুলে ওঁদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'পাঁচ হাজার ডলার পেলে আপনাদের কাজ হবে তো?' সবাই চমকে গিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকালেন। রিভেরো শান্তভাবে বলল—'অস্ত্রশস্ত্রের জন্য অর্ডার দিন, তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি আপনাদের পাঁচ হাজার ডলার এনে দেব।'

ভেরা বলে উঠল—'পাগল, তুমি সত্যিই বদ্ধ পাগল।' রিভেরো একই ভাবে উত্তর দিল—'হাতে একদম সময় নেই। তিন সপ্তাহের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবেন। বন্দুক কেনার অর্ডার দিয়ে দিন এখুনি।'

তিন

প্রোমোটার কেলির অফিসে সেদিন রাত পর্যন্ত খুব কর্মব্যস্ততা চলছিল। কেলি নিউইয়র্ক থেকে চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা ড্যানি ওয়ার্ডকে নিয়ে এসেছিল বিলি কার্থির সঙ্গে লড়াই করার জন্য। এদিকে বিলি কার্থি গুরুতর রকম জখম হয়ে দুদিন ধরে হাসপাতালে শুয়ে আছে, এবং অন্য কোনো মুষ্টিযোদ্ধাও পাওয়া যাচ্ছে না। কেলির মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এমন সময় রবার্টস্ রিভেরোকে নিয়ে এসে হাজির হল,—সে ড্যানি ওয়ার্ডের সঙ্গে লড়তে চায়। কেলি রিভেরোকে বলে উঠল—'তোমার তো দারুণ সাহস!' রিভেরো ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে খালি উত্তর দিল—'ওয়ার্ডকে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে।' কেলি এবার রবার্টস্-এর দিকে ফিরে বলল—'দেখ বাপু, খুব তো বড় বড় কথা বলছ, তুমি নাকি এই মেক্সিকান ছেলেটাকে আবিষ্কার করেছ। এই ছোক্‌রারও তো সাহস কম নয়, জোর দিয়ে বলছে যে কার্থির জায়গায় সে-ই লড়াই করবে। আসল ব্যাপার খানা কি বল তো? কে ছেলেটা?' রবার্টস্ উত্তর দিল—'আরে, সব ঠিক আছে। ছেলেটা দারুণ লড়ে। তোমাদের ওয়ার্ডকেও কি রকম বেগ দেবে দেখে নিও। রীতিমত লড়াই করতে হবে ওয়ার্ডকে, এই আমি বলে রাখলাম।'

'দেখা যাক্'—বলে কেলি ড্যানিকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠাল। ওয়ার্ড তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের চোখে একবার দেখে যাক্,এই তার ইচ্ছে। রবার্টস্ বলেই চলল—'ছেলেটা একদিন আমার 'জিমন্যাসিয়াম'-এর পাশে ঘোরাঘুরি করছিল। আমি তখন প্রেইনোকে ডিলানির সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি করছিলাম। কিন্তু প্রেইনো হতভাগা অনুশীলন করতে গিয়ে ওর পার্টনারকে এমন বেমক্কা মেরেছিল যে সে বেচারা আর সেদিন আসতেই পারেনি। অন্য কোনো পার্টনারও আমি জোগাড় করতে পারছিলাম না। অগত্যা আমি এই ছেলেটাকে ধরে এনে প্রেইনোর সঙ্গে লড়তে লাগিয়ে দিলাম। তোমাকে কি বলব, ছেলেটা পাক্কা দুটি রাউণ্ড সমানে প্রেইনোর সঙ্গে লড়ে গেল। লড়াই দেখেই বুঝতে পারছিলাম, ছেলেটা মুষ্টিযুদ্ধের বিন্দু-বিসর্গও জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরো দুরাউণ্ড টিকে রইল ছোকরা। তারপর দুর্বলতার জন্য পড়ে গেল। আমি দেখলাম, ছেলেটা দুর্বল বটে, কিন্তু দারুণ শক্ত। ছেলেটাকে পেট ভরে খাওয়ালাম, কিছু পয়সাও দিলাম। পরের দিন দেখি আবার এসেছে ছেলেটা। এদিন ও আরো ভাল লড়ল। এরপর থেকে আমি ওকে নিয়মিত লড়তে দিতাম। ছেলেটা ক্রমশই এমন উন্নতি করতে লাগল যে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। ছোকরা একেবারে জাত লড়িয়ে, আর অবিশ্বাস্য

রকমের শক্ত। ছেলেটার মন বা হৃদয় বলে কিছু নেই, কথাবার্তাও প্রায় বলে না বললেই চলে। আমি শত চেষ্টা করেও ওকে একসঙ্গে দশটার বেশি কথা বলাতে পারিনি। প্রত্যেকটা বড় বড় মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গেই ও পার্টনার হয়ে লড়েছে, এবং তাদের অনেককেই বেশ বেধড়ক পিটিয়েছে। কিন্তু লড়াই করবার বা ভাল মুষ্টি-যোদ্ধা হবার কোনোরকম ইচ্ছেই ওর নেই—ওর নজর খালি টাকা উপার্জন করার দিকে। ও যে কোথায় থাকে, কি করে, তাও কেউ জানে না। মাঝে মাঝে বহুদিনের জন্য ওর দেখা পাওয়া যায় নি। ছেলেটা যদি পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা হতে চায়, তাহলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই ও বহু ওপরে উঠে যেতে পারবে, প্রচুর টাকাও রোজগার করতে পারবে। কিন্তু ছেলেটার সেরকম কোনো ইচ্ছেই নেই। ওর হাবভাব দেখে মনে হয়, ও যেন স্রেফ হাতে নাতে কিছু নগদ টাকা পাওয়ার জন্যই লড়তে নামে—আর টাকাটা পাওয়া ওর কাছে খুবই জরুরি। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি, আমার জিমন্যাসিয়ামে পাকা চাক্‌রি দেওয়ার কথাও বলেছি, কিন্তু ছেলেটা কোনো কথা কানেই তোলে না। কোনোরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যেই ও যেতে রাজি নয়—নিজের দরকার মতো এসে সঙ্গে সঙ্গে কিছু নগদ টাকা উপার্জন করে আবার উধাও হয়ে যাওয়াই ওর স্বভাব।'

এই সময় হঠাৎ কেলির অফিসে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা ড্যানি ওয়ার্ড তার দলবল নিয়ে এসে পৌঁছেছে। ড্যানি ছিল একেবারে পাকা এক 'শো-ম্যান'—হাসিঠাট্টা করা, উদারতা দেখানো—এ সমস্তই ছিল ওর একটা মুখোশ। আদতে ড্যানি ছিল ঝানু হিসেবি এক ব্যবসাদার—ঠাণ্ডা মাথায় সবসময় সে নিজের লাভলোকসান, ভালমন্দ খতিয়ে দেখে নিত। এখানে এসে ঢুকেই সে প্রথমে খুব উদারভাবে রিভেরোকে ডেকে বলল—'কি হে ভায়া, কেমন আছ?' রিভেরো কোনো উত্তর দিল না—ওর চোখদুটি সীমাহীন এক ঘেন্নায় বিতৃষ্ণায় ঝলসে উঠল শুধু। সব আমেরিকান—অর্থাৎ 'গ্রিংগো'কেই ও অপছন্দ করত, কিন্তু এখনকার এই বচনবাগিশ 'গ্রিংগো'টাকে যেন ও সহ্যই করতে পারছিল না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ওয়ার্ড আবার দরাজ গলায় হেসে বলে উঠল—'কিহে, চুপ করে রইলে যে?' এবার উত্তর দিল রবার্টস্—'ওহে ড্যানি, এ কিন্তু দুর্দান্ত লড়ে। তোমাকে বেশ ভালমতনই বেগ দেবে, বুঝলে?' ড্যানি খুব নিশ্চিতভাবে বলল—'ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি সব। ১৬ রাউণ্ড লড়াই হবে। তারপর ছোকরাকে চিৎ হয়ে শুয়ে আসমানের তারা গুনতে হবে, এই তো ব্যাপার?' কেলি বলল—'দেখ বাপু, লড়াইটা যেন বেশ বিশ্বাসযোগ্য, জোরদার হয়,

সেটা খেয়াল রেখ। হলের অর্ধেক টিকিট এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।' ড্যানি এবার বলে উঠল—'আচ্ছা, এবার তাহলে কাজের কথা হোক্। আমাদের দুজনের জন্য যত টাকা দেওয়া হবে, তার শতকরা আশি ভাগ আমার, আর কুড়ি ভাগ এই ছোক্‌রার।' রবার্টস্ পুরো ব্যাপারটা রিভেরোকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল—'খুবই ভাল প্রস্তাব, কি বল? তোমাকে তো কেউ চেনেই না।' রিভেরো কিন্তু শান্তভাবে জানতে চাইল—'মোট কত টাকা আমাদের দুজনের জন্য দেওয়া হবে?' ড্যানি উত্তর দিল—'এই ধর, ৫০০০ থেকে ৮০০০ ডলারের মধ্যে। তোমার ভাগ্যে ১০০০ থেকে ১৬০০ ডলারের মতো পড়বে। আরে, আমার সঙ্গে লড়ছ, এটাই তোমার পক্ষে একটা দারুণ ব্যাপার।' কিন্তু এর উত্তরে রিভেরো যা বলল, তা শুনে অফিসের সমস্ত লোক তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল। রিভেরো বলল—'না, তা হবে না। যে জিতবে, সে-ই পুরো টাকাটা পাবে।' ড্যানি আর তার ম্যানেজার ওকে বোঝানর অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু রিভেরো তার গোঁ ছাড়ল না। ওর আস্পর্ধা দেখে ড্যানি এমনিতেই রেগে টং হয়ে ছিল, এবার সে একেবারে ফেটে পড়ে বলল—'ঠিক আছে, তাই হবে। তোর বদমায়েসি বার করছি আমি।' ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় তক্ষুণি রিভেরোকে মেরে বসবে। এবার কেলিও রিভেরোকে অনেক বোঝানর চেষ্টা করল—বলল, 'রিভেরো, রাজি হয়ে যাও। ড্যানি হল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। আর, তোমাকে তো কেউ চেনেও না।' রিভেরো আগের মতোই অবিচলিত ভাবে উত্তর দিল—'আজকের লড়াইয়ের পরেই তারা আমাকে চিনবে। আমি ড্যানি ওয়ার্ডকে হারাবার ক্ষমতা রাখি। আমি ঐ টাকার সবটাই নিতে চাই।' ড্যানি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল—'তুই এক হাজার বছর ধরে লড়লেও আমাকে হারাতে পারবি না।' রিভেরোও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'তাহলে আর তোমার আপত্তি কিসের? টাকাটা পাওয়া যখন তোমার কাছে অতই সোজা, তখন সেটা নিতে বারণ করছে কে?' ড্যানি চেঁচিয়ে উঠল—'ঠিক আছে, তাই হবে। ভগবানের দোহাই, রিং-য়ে তোকে আমি পিটিয়ে একেবারে তুলো-ধুনো করে দেব। আমার সঙ্গে বাঁদরামি করার ফলটা টের পাবি তখন। কেলি, তাহলে ঐ কথাই রইল—যে জিতবে সে-ই সব টাকা পাবে। আর, আমার ওজন নেওয়ার সময় হবে সকাল দশটায়।' রিভেরো এতে রাজি হয়ে যাওয়ায় ড্যানি খুব খুশি হয়ে উঠল—ঐ সময় ওজন নেওয়া হলে সে লড়াইয়ের সময় একেবারে পূর্ণ শক্তি নিয়ে রিং-য়ে নামতে পারবে। রবার্টস্ রিভেরোকে অনুযোগ করে বলল—'তার মানে, ও আরো পাঁচ পাউণ্ড বেশি ওজনের সুবিধা নিয়ে লড়তে নামবে। নাঃ,

তুমি সত্যিই একটা গাধা। লড়াইটা তো ওর হাতে একেবারে তুলেই দিলে তুমি।' রিভেরো কিন্তু রবার্টস্-এর কথার কোনো জবাবই দিল না—ঘৃণার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

চার

রিভেরো যখন রিং-য়ে ঢুকল, তখন ওকে কেউ লক্ষ্যই করল না। সবাই ড্যানি ওয়ার্ডের প্রতীক্ষাতেই উদ্‌গ্রীব। ড্যানি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে রিভেরোকে রিং-য়ে অপেক্ষা করিয়ে রাখল। এটাও ড্যানির একটা পুরনো কৌশল—এই সব মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ কষে ও প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দিত। কিন্তু রিভেরোর বেলায় ওর এই কৌশল কোনো কাজেই লাগল না—এসব মানসিক দুর্বলতার কোনোরকম বালাই রিভেরোর একেবারেই ছিল না। ওকে যে প্রথম থেকেই হেরে যাওয়ার খাতায় লিখে রাখা হয়েছে। এইসব হুল্লোড় যে চলছে ড্যানির আগমনের আশাতেই, এ সমস্ত নিয়ে চিন্তা করার কোনোরকম আগ্রহই ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল না। রিভেরোর প্রধান সহকারী বা 'সেকেণ্ড' ছিল 'স্পাইডার' হ্যাগার্টি। সে রিভেরোকে বলল—'শোন, সাবধানে লড়বে, বুঝলে। ড্যানি যেন তোমাকে নিয়ে একেবারে ছেলেখেলা না করতে পারে। যতক্ষণ পারবে, রিং-য়ে টিকে থাকবার চেষ্টা করবে। তা নইলেই দর্শকরা ঝামেলা পাকাবে—তারা ভাববে, পুরো লড়াইটাই গড়াপেটা করা হয়েছে।'

রিভেরো ওর কথার কোনো উত্তর দিল না। ওর লড়াই করার পেছনে প্রথম প্রথম একটাই উদ্দেশ্য থাকত—তা হল বেঁচে থাকার জন্য পয়সা রোজগার করা। ও মুষ্টিযুদ্ধ শুরু করেছিল স্রেফ নিজেকে অনাহার থেকে বাঁচানর জন্য। সে এই খেলার সূক্ষ্ম কৌশল নিয়ে মাথা ঘামাত না, কোনোরকম চিন্তা ভাবনাও করত না,—ও খালি জানত, ওকে জিততেই হবে কারণ তাছাড়া ওর পেটের খিদে মেটানোর আর কোনো পথ খোলা নেই। ড্যানি লড়ে আরো বেশি টাকা উপার্জন করে নিজের জীবনটাকে আরো বেশি উপভোগ্য, বিলাসবহুল করে তোলার জন্য। কিন্তু রিভেরোকে যে কারণে লড়াই করতে হয়, তা যেন সারাক্ষণ ওর মনের মধ্যে তুষের আগুন জ্বালিয়ে রেখে ওকে পোড়ায়। ওর চোখের সামনে একটার পর একটা অবর্ণনীয়, ভয়ঙ্করসব ছবি ফুটে ওঠে—ও যেন দেখতে পায়, রিও ব্লাংকোর কারখানা-গুলোতে হাজার হাজার শ্রমিক দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে ধুঁকছে, আর ছোট ছোট শিশুরা ১০ সেণ্টের বিনিময়ে সারাদিন পরিশ্রম করছে। ওর মনে পড়ে যায়,

ওর মা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও ওকে কত আদর করতেন। সবচাইতে বেশি মনে পড়ে বাবাকে—লম্বা চওড়া, স্বাস্থ্যবান, সদাহাস্যময় ওর বাবার মনটা ছিল আকাশের মতোই বড় আর উদার। রিভেরোর নাম তখন ছিল জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ। কিন্তু পুলিশের কাছে ফার্নাণ্ডেজ নামটা এত বেশি আপত্তিকর হয়ে উঠেছিল যে ও নিজেকে ফিলিপ রিভেরো-য় বদলে ফেলেছিল। ওর বাবা একটা ছাপাখানায় কাজ করতেন, আর প্রায়ই বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সংগে বহুক্ষণ ধরে গোপনে কি সব যেন পরামর্শ করতেন। ক্রমশ সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক বিক্ষোভ, অশান্তি, ধর্মঘট বেড়েই চলছিল। তারপর হঠাৎই একদিন নেমে এল সেই দুঃস্বপ্নের রাত—ওর বাবার কারখানার একহাজার শ্রমিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেনাধ্যক্ষ মার্টিনেজ ও ডায়াজ-এর সশস্ত্র বাহিনী। তাদের রাইফেল থেকে শুরু হল অবিরত অগ্নি উদ্‌গার—মনে হচ্ছিল, তাদের রাইফেলগুলো বোধহয় থামতে ভুলে গেছে। গভীর রাতে বড় বড় সব খোলা ট্রাকে মৃতদেহগুলো বোঝাই করে 'ভেরাক্রুজ' বন্দরে হাঙ্গরদের সামনে ফেলে দেওয়া হল। আড়াল থেকে জুয়ান অর্থাৎ এখনকার রিভেরো—সব কিছুই দেখেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সুখী সংসারের আদরের সন্তান থেকে সে রূপান্তরিত হয়েছে পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালকে। অন্ধকারে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে ওর বাবা মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। অনেকগুলো মড়ার তলায় ওর মায়ের দেহটা চাপা পড়ে গিয়েছিল, খালি মুখটা বেরিয়ে ছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারেনি জুয়ান। হঠাৎ আবার রাইফেল গর্জে উঠল, আর তাড়া খাওয়া বুনো জন্তুর মতো অন্ধকারে ওকে পালিয়ে যেতে হল।

হঠাৎ একটা সমবেত চিৎকারে চমক ভাঙল রিভেরোর—সে দেখল, ড্যানি রিং-য়ে ঢুকছে। জনতা তাদের প্রিয় নায়ককে স্বাগত জানাচ্ছে। ড্যানির চেহারা, পৌরুষব্যঞ্জক চালচলন, ভাবভঙ্গি—সব কিছুই সত্যিই নায়কোচিত। ওর প্রতিপক্ষ রিভেরোকে ওর কাছে খুবই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হচ্ছিল। দর্শকরা দেখল, ছোট-খাটো বাদামি রঙের ১৮ বছরের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ যদি রিভেরোকে খুঁটিয়ে দেখত, তাহলে বুঝতে পারত যে ওর শরীরের প্রতিটি পেশী একেবারে পেটানো লোহার মতো শক্ত। রবার্টস্ পেছন থেকে আস্তে আস্তে বলে গেল —'রিভেরো, ঘাবড়ে যেও না। আরে ড্যানি তো আর তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে না। ও প্রথমেই তোমার ওপর অবশ্য ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু তাতে ভয় পেও না। ওর ঘুষিগুলো যতটা পার আটকিয়ে দাও, এদিক ওদিক ঘুরে ওর নাগাল এড়িয়ে চল আর সুযোগ পেলেই ওর গায়ের সংগে লেগে থাক।' ওর কথাগুলো কিন্তু কানেই

গেল না—ওর চোখের সামনে তখন ভেসে উঠেছিল অসংখ্য রাইফেলের সারি। হলের প্রতিটি দর্শকের মুখকেই ওর রাইফেলের নল বলে মনে হচ্ছিল। আজকের লড়াই দেখবার জন্য যে ডলার আজ এখানে তারা ঢেলে দিচ্ছে, তাদের সেই ডলারই হয়ে উঠবে ঐ সব রাইফেল কেনার রসদ। রিভেরোর মন এবার চলে গেল মেক্সিকোর সুদীর্ঘ, রৌদ্রস্নাত রুক্ষ সীমান্তে—যেখানে অসংখ্য বিপ্লবীর দল হাতে রাইফেল পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ড্যানি। ঘূর্ণি ঝড়ের মতোই রিভেরোর সর্বাঙ্গে ঘুষির ঝড় বইয়ে দিল সে—মনে হল, ও যেন রিভেরোকে খেয়ে ফেলতে চায়। সমবেত দর্শকরা দারুণ উল্লাসে চেঁচাতে লাগল—তাদের প্রিয় নায়ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে একতরফা পিটিয়ে চলেছে। কিন্তু কেউই লক্ষ্য করল না যে ঐ মেক্সিকান ছেলেটা একবারের জন্যও মাটিতে পড়ে গেল না। শুধু তাই নয়, দমও ফুরিয়ে গেল না, বা তার ঘৃণাভরা জ্বলন্ত চাউনি ঘোলাটে হয়েও এল না। রিভেরো লড়াইয়ের শুরুতে এরকম প্রচণ্ড পিটুনি খেতে খুব ভালভাবেই অভ্যস্ত,—এসব তার সওয়া হয়ে গিয়েছে। এর পরেই হঠাৎ ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড—দেখা গেল, রিভেরো একলাই দাঁড়িয়ে আছে, আর ড্যানি রিং-য়ের মেঝেতে একেবারে সটান চিৎ হয়ে পড়ে আছে। রিভেরোর ডান হাতের প্রচন্ড 'হুক' একেবারে আকস্মিক মৃত্যুর মতোই ড্যানির মুখে আছড়ে পড়েছে। রেফারি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রিভেরোকে ধাক্কা মেরে পেছনে হটিয়ে দিয়ে নিজে ড্যানির ভূপতিত দেহের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'নয়' গোনার সঙ্গে সঙ্গে ড্যানি উঠে দাঁড়াল। রিভেরো ঠিক করেছিল, উঠে দাঁড়াবার মুখেই ড্যানিকে আর একটা মোক্ষম ঘুষি মেরে একেবারে 'নক আউট' করে দেবে। কিন্তু রেফারি সেই শেষ ঘুষিটা আর মারতে দিল না। যাই হোক, ড্যানি আবার উঠে দাঁড়াল বটে। কিন্তু আগের মতো বেপরোয়া লাফ ঝাঁপ অনেকটাই কমে গেল তার। এবার প্রতিদ্বন্দ্বীকে খেলিয়ে খেলিয়ে ক্লান্ত করে দিয়ে হঠাৎ ঘুষি মেরে কাবু করে ফেলার কৌশল নিল সে। তবে, রিভেরোও সমানে ড্যানির সর্বাঙ্গে বাঁহাতের ঘুষি চালিয়ে গেল। বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না দেখে ড্যানি এবার রিভেরোকে চোরা-গোপ্তা অন্যায় মার মারা শুরু করে দিল। রেফারি অবশ্য সেগুলো দেখেও না দেখার ভান করে গেল। তবে, সপ্তম রাউণ্ডে ড্যানির এক প্রচণ্ড 'আপার কাট'-ঘুষিতে রিভেরো একেবারে দড়ির ফাঁক দিয়ে গলে বাইরে গিয়ে পড়ল। অনেকেই ভাবল, বোধহয় লড়াই শেষ। কিন্তু আট গোনা শেষ হওয়ার আগেই রিভেরো আবার রিং-য়ের মধ্যে ফিরে এল। এবার রেফারি নির্লজ্জভাবে ড্যানির দিকে টেনে

খেলা চালাতে লাগল—তাকে যতরকম অন্যায় সুযোগ দেওয়া যায়, তার কোনোটাই রেফারি এখন আর দিতে দ্বিধাবোধ করল না। কিন্তু তা সত্ত্বে-ও রিভেরোকে দমানো গেল না—বরং ওর মাথা যেন এখন আরো পরিষ্কার ভাবে কাজ করতে লাগল। ও এতক্ষণে ভালভাবেই বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে, তাকে হারাবার জন্য সবাই জোট বেঁধেছে। এরা সবাই 'গ্রিংগো'—এক ঝাঁকের পাখি। কোনোরকম অন্যায় করতেই এরা পিছ্‌পা হবেনা। বিদ্যুৎ চমকের মতো আবার ওর চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠল—সীমান্তে ধূ ধূ প্রান্তরের বুক চিরে রেললাইন চলে গিয়েছে, আর 'গ্রিংগো'-আমেরিকানদের কমেন্ট বল বিপ্লবীদের নির্মমভাবে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর মনের মধ্যে আবার সেই দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ফিরে এল—বন্দুক, তার অনেক বন্দুক চাই। সেই বন্দুক তাকে এইখানে লড়ে জোগাড় করতে হবে। তার জেতা মানেই বিপ্লব টিকে থাকা।

দর্শকরা এতক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল—কি হল, এই হতভাগাটা এখনো মাটিতে শুয়ে খাবি খাচ্ছে না কেন? কিন্তু রিভেরো মাটিতে তো শুয়ে পড়লই না, বরং নবম রাউন্ডে আবার ড্যানিকে একবার ধরাশায়ী করল। দশম রাউন্ডে দু' দুবার। ড্যানির পাগলা ষাঁড়ের মতো তেড়ে যাওয়া এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—সে এখন বুদ্ধি খাটিয়ে লড়ছিল, অপেক্ষা করছিল একটা মোক্ষম ঘুষি মারার জন্য। রিং-য়ে রিভোরোর যে সহকারী বা 'সেকেন্ড' ছিল, সে ওর কোনোরকম দেখাশোনাই করছিল না। একাদশ রাউন্ডের প্রথমেই আবার ড্যানিকে মাটিতে ফেলে দিল সে। এবার কেলি আর রবার্টস্ পরামর্শ শুরু করে দিল কি করে রিভেরোকে হারানো যায়। কেলি রবার্টকে বলল—'ওহে, ড্যানিকে জিততেই হবে, নইলে আমি ফতুর হয়ে যাব। ওর ওপর বহু টাকা বাজি রেখেছি আমি। ১৫ রাউন্ডের মধ্যে রিভেরো হেরে না গেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।' এরপর কেলি রিভেরোকে ডেকে জানিয়ে দিল—'ওহে, এবার হেরে গিয়ে লড়াই ছেড়ে দাও।' স্পাইডার হ্যাগার্টি-ও বলে উঠল—'দেখ বাপু, হারতে তোমাকে হবেই। রেফারি তোমাকে কিছুতেই জিততে দেবে না। তার চাইতে বরং কেলি যা বলছে শোন, হার মেনে নাও।' কেলি এবার অনুনয় বিনয় শুরু করে দিল—'এই যে, সোনা ছেলে। আমার কথাটা শোন, তোমার ভাল হবে। আমি তোমাকে এই চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যাপারে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কথা দিচ্ছি।' কিন্তু রিভেরো ওদের কোনো কথায় কানই দিল না।

এবার নতুন রাউন্ড শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু রিভেরো আঁচ করল, কিছু

একটা ঘটতে চলেছে। ড্যানির চলাফেরায় আবার সেই প্রথম রাউণ্ডের নিশ্চয়তা ফিরে এসেছিল—আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দেখাচ্ছিল তাকে। রিভেরো একটু ঘাবড়ে গেল—প্রথমে সে ঠিক বুঝতে পারছিল না, তার প্রতিপক্ষ কি ফন্দি এঁটেছে। এমন সময় হঠাৎ ড্যানি ধেয়ে এল তার দিকে। ঠিক সময়টিতে তাকে এড়িয়ে গেল রিভেরো। রিভেরো এরপর লক্ষ্য করে দেখল, ড্যানি খালি এগিয়ে এসে ওর শরীরের সঙ্গে লেগে থেকে ধস্তাধস্তি করতে চাইছে। তার মানে, কোনো কৌশল এঁটেই এটা করা হচ্ছে। তাই যতবার ড্যানি এসে ওকে জড়িয়ে ধরে লড়াই করতে চাইছিল, ততবারই রিভেরো একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছলে ওর কবল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে একবার ওর বেরোতে একটু দেরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ড্যানির সহকারীরা রিভেরোর বিরুদ্ধে 'ফাউল' দাবি করে বসল। এবার রিভেরো ওদের মতলবটা পরিষ্কারভাবে বুঝে ফেলল—আর কিছুই নয়, দুই মুষ্টিযোদ্ধা ধস্তাধস্তি করবে, আর সেই সুযোগে রেফারি ওর বিরুদ্ধে 'ফাউল' ডেকে ওকে বাতিল করে ড্যানিকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করবে। বলা বাহুল্য, রিভেরো ড্যানিকে সে রকম কোনো সুযোগই দিল না। ও এখন আর ড্যানির কাছাকাছিই যাচ্ছিল না, দূর থেকেই লড়ছিল। মনে হচ্ছিল ড্যানির কাছ থেকে যেন ও পালিয়ে থাকতে চাইছে। ড্যানি এখন আবার আগের মতোই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল—মনে হচ্ছিল, সে যেন রিভেরোকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এদিকে কাছে গিয়ে না লড়ার জন্য রিভেরোকে ড্যানির অজস্র ঘুষির আঘাত সয়ে যেতে হচ্ছিল। দর্শকরাও আনন্দে যেন একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল—তাদের প্রিয় নায়ক এবার জিতে যাচ্ছে। তারা সমানে রিভেরোকে টিট্‌কিরি দিয়ে যেতে লাগল—'এই কুত্তার বাচ্চা, লড়ছিস না কেন? যা এগিয়ে গিয়ে লড়।' রিভেরোর কিন্তু এসব কথায় কোনো ভাবান্তরই হল না। পরের রাউণ্ডে ড্যানির একটা জোরালো ঘুষির আঘাতে যেন ঝুঁকে পড়ল রিভেরো,—মনে হল, সে যেন এবার পড়ে যাবে। ড্যানি ভাবল, এবার তার মোক্ষম সুযোগ এসে গিয়েছে। সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায় সে এগিয়ে গেল রিভেরোর দিকে। রিভেরো ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। তার অব্যর্থ, প্রচণ্ড ঘুষির আঘাতে ড্যানি ছিট্‌কে পড়ে গেল, কোনোরকমে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই রিভেরো বিদ্যুৎগতিতে ওর ঘাড়ে আর চোয়ালে পরপর তিনটে ঘুষি মেরে আবার শুইয়ে দিল ড্যানিকে। ঘুষিগুলো এত পরিষ্কার আর নিয়ম মাফিক ছিল যে, কোনো রেফারির পক্ষেই সেগুলোকে 'ফাউল' ডাকা সম্ভব ছিল না। কেলি কাতরভাবে রেফারিকে ডেকে বলল—'বিল, এই বিল। কিছু একটা কর।' রেফারি হতাশ হয়ে উত্তর

দিল—'আমার কিছু করার নেই। আমাকে এই ছোক্‌রা কিছু করার সুযোগই দিচ্ছে না।'

বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত ড্যানি অবশ্য বারবার উঠে পড়ছিল। কিন্তু এতক্ষণ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ও আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। কেলি আর তার সাকরেদরা লড়াই থামিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ অফিসারকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। হোঁৎকা মোটা পুলিশ অফিসারটি হাঁসফাঁস করতে করতে রিং-এর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল। রিভেরো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। তবে 'গ্রিংগো'-দের এই খেলাতে ঠকবাজি করার যে বহুরকম উপায় আছে—সেটা অবশ্য খুব ভালভাবেই রিভেরো জানত। সে আর অপেক্ষা করল না। ড্যানি ওর সামনেই দাঁড়িয়ে টলছিল, তার চোয়ালে শেষ ঘুষিটা বসাল সে। ঠিক এই সময়েই পুলিশ অফিসার আর রেফারি দুজনেই ওর কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু লড়াই থামিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগই তারা পেল না, কারণ অচেতন ড্যানি আর ওঠবার কোনোরকম চেষ্টাই করল না। রিভেরো কর্কশ গলায় রেফারিকে বলে উঠল—'গোনা শুরু করুন।' রেফারির দশ পর্যন্ত গোনা শেষ হলে রিভেরো আবার জিজ্ঞেস করল—'কে জিতেছে?' রেফারি খুব অনিচ্ছার সঙ্গে রিভেরোর গ্লাভ্‌স্‌ পরা হাতখানা ওপরে তুলে ধরলেন।

বিজয়ী রিভেরোকে কেউই অভিনন্দন জানাল না। ক্লান্ত, অবসন্ন রিভেরো ফিরে এল তার নিজের কোণটিতে—ওর সহকারীরা এখনো পর্যন্ত ওকে একটা তোয়ালেও এগিয়ে দেয়নি। রিং-য়ের দড়িতে হেলান দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল রিভেরো। ওর চোখের সামনে ঘৃণিত 'গ্রিংগো'-দের মুখগুলো দুলতে শুরু করে দিল—হঠাৎ মাথা ঘুরে সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল ওর। তার পরেই ওর মনে পড়ে গেল বন্দুকগুলোর কথা—পেরেছে, বন্দুকগুলো অবশেষে তার আয়ত্ত্বের মধ্যে আনতে পেরেছে সে। বিপ্লব চলছে, চলবে।

TO THE MAN ON THE TRAIL

বড়দিনের আগন্তুক

'ম্যালেমিউট্ কিড্'-এর 'লগ' কেবিনে বড়দিনের উৎসব খুব জমে উঠেছে। সোনা সন্ধানী ভাগ্যান্বেষী অভিযাত্রী, আশপাশের এলাকার খনির মালিক,—এরকম অনেকেই এসেছে। চারদিকের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কিড্-এর দরাজ গলা শোনা গেল,—'আরে ঢাল ঢাল, বাকি সবটুকুও ঢেলে দাও।'

'আচ্ছা কিড্, ব্যাপারখানা কি বল তো? সবাইকে মেরে ফেলবে নাকি?'—এক ছোক্‌রা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে বলল—'হুইস্কির সঙ্গে নির্জলা, খাঁটি অ্যালকোহল মিশিয়েছে, সেটাতে চুমুক দিয়েই তো আর মাথা সোজা রাখা যাচ্ছেনা;-তারপর আবার ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে এতখানি গোলমরিচের সস্? আরে বাস্ রে বাস্!'

'আরে, চুপ কর তো হে বাপু!'—কিড্ খোশমেজাজে ছেলেটাকে এক ধমক লাগাল—'ঢাল, সব সস্‌টুকু-ই আমার কথামতো ঢেলে দাও। আজকের 'ককটেল পাঞ্চ'টা পুরোপুরি আমাকেই তৈরি করতে দাও। এই মুল্লুকে আমার মতো এতদিন ধরে যখন বাস করবে, আর দিনের পর দিন খরগোসের বাসি মাংস আর স্যামন মাছের পেটি খেয়ে কাটাবে, তখন বুঝতে পারবে যে বড়দিন বছরে একবারই আসে। আরে, কড়া 'ককটেল পাঞ্চ' ছাড়া বড়দিন আর নুন ছাড়া তরকারী একই রকম বিস্বাদ,—বুঝলে হে ছোক্‌রা?'

'একেবারে খাঁটি কথা বলেছ ভায়া।' হোঁৎকা জিম বেলডেন পাশ থেকে সোৎসাহে কিড্-এর কথায় সায় দিল। ওর খনিটা বহুদূরে,—অতদূর থেকে বরফ কন্‌কনে শীত অগ্রাহ্য করে ও এসেছে বড়দিনের উৎসব করতে। গত দু'মাস ধরে বেচারির ভাগ্যে কাঁচা মাংস ছাড়া আর কোনো খাবারই জোটেনি। সে বলে চলল—'এই কিড্, মনে আছে, টানানাতে আমরা নিজেরা ক্যায়সা দেশী মদ তৈরি করেছিলাম?'

'মনে আবার নেই?'—পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল কিড্-এর—'এমন মাল তৈরি করেছিলাম যে টানানা গোষ্ঠীর সব কটা রেড ইণ্ডিয়ান একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে গেছিল। বুঝলে স্ট্যানলি, তুমি এখানে আসার বহুদিন আগে ব্যাপারটা ঘটেছিল—' কিড্ পাশের ইংরেজ ছোকরাটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌ল—'আমাদের বন্ধু ম্যাসন হতভাগা হঠাৎ বিয়ে-পাগ্‌লা হয়ে উঠল। এদিকে এ তল্লাটে তখন সাদা চামড়ার কোনো মেয়েমানুষই দেখা যেত না। ম্যাসনের তখন

ঝোঁক চাপল, 'টানানা' রেড ইণ্ডিয়ানদের দলপতির মেয়ে রুথকে-ই ও বিয়ে করবে। তা, মেয়েটার বাবা আর তার দলবল তো কিছুতেই এ বিয়ে হতে দেবে না। মেয়েটা অবিশ্যি ম্যাসনকে বেশ পছন্দই করত। অগত্যা ম্যাসন রুথকে নিয়ে পালিয়েই গেল। বলা বাহুল্য, আমরাও সদলবলে ছিলাম ওদের দুজনের সঙ্গে। ওঃ, রুথ-এর বাবা আর তার দলবল আমাদের কি তাড়াটাই না করেছিল। তবে, অনেক চেষ্টা করেও আমাদের ধরতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ওরা যখন আমাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে 'নুক্‌লু কিয়েবো' শহরে গিয়ে ঢুক্‌ল, ততক্ষণে আমরাও ওদের পাল্টা মার দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছি। যাক্, এর পরে অবশ্য দু'দলের মধ্যেই মিটমাট হয়ে গিয়ে বেশ খাতির জমে উঠল, বিয়েটাও হয়ে গেল। আ হাহা, ওদের বিয়েটা যা জমেছিল না! কত লোক যে এসেছিল, তার কোনো হিসেবই ছিল না। কনের বাড়ির চোদ্দগুষ্টি তো আমার তৈরি মদ খেয়ে সারাক্ষণ উল্টে পড়ে রইল। এই তো ফাদার রোবোঁ তো এখানেই আছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস কর না। উনিই তো বিয়েটা দিয়েছিলেন। কি গো পাদ্রীসাহেব, ঠিক বলেছি কি না?'

ফাদার রোবোঁ পাইপটা মুখ থেকে বার করে একটু সম্মতির হাসি হাসলেন। অতিথিদের মধ্যে লুই স্যাভয় নামে যে ভাবপ্রবণ ফরাসী ক্যানাডিয়ান যুবকটি ছিল, সে তো এরকম একটা দারুণ রোম্যাণ্টিক কাহিনী শুনে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল—তার উচ্ছ্বাস আর থামেই না! এর পরেই কিড্-এর তৈরি বিখ্যাত 'ককটেল পাঞ্চ' সকলকে টিনের কাপে দেওয়া শুরু হয়ে গেল। বেট্‌লস্ হেঁড়ে গলায় গান ধরল। এই 'ভয়াবহ পাঞ্চ'-এর ফলাফলও একেবারে হাতেনাতেই পাওয়া গেল। কেবিনে যত লোক ছিল, তারা নেশার ঝোঁকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরের খুব আপনজন হয়ে উঠ্‌ল—যদিও অনেকেই এই প্রথম আরেকজনের মুখ দেখছে। দেখা গেল, ইংরেজ স্ট্যানলি 'নতুন জগতের অকালপক্ক শিশু আমেরিকা'-র স্বাস্থ্যপান করছে। খাস ইয়াংকি বেট্‌লস্ প্রাণপণে ইংল্যাণ্ডের রানীর দীর্ঘ জীবন কামনা করছে। দুই জার্মান অভিযাত্রী, স্যাভয় আর মেয়ার্স তাদের এবং উপস্থিত সকলের 'পিতৃভূমি'র শুভকামনা করে কাপ ঠোকাঠুকি করছে। এভাবে খানিকক্ষণ কাটবার পর কিড্ তার কাপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কেবিনের জানালাটার দিকে তাকাল—সেখানে তিন ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। তারপর সে বলে উঠ্‌ল, 'আজকের এই রাতে যারা তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে চলেছে, তাদের জন্যে আন্তরিকতম শুভেচ্ছ জানাচ্ছি। তাদের খাবারের ভাঁড়ার যেন ফুরিয়ে

না যায়। কুকুরগুলো যেন সুস্থ সবল থেকে দৌড়তে পারে আর রাস্তায় আগুন জ্বালাতেও যেন কোনো অসুবিধে না হয়।'

কিড্-এর শুভেচ্ছাবাণী শেষ হতে-না-হতেই সামনের রাস্তায় স্লেজগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। স্লেজটা এই কেবিনের-ই বাইরের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল। সামনের চত্বরে স্লেজের কুকুরগুলোকে খুলে দেওয়ার আর খেতে দেওয়ার পরিচিত শব্দও পাওয়া গেল। তারপরেই কেবিনের দরজা ঠেলে যে আগন্তুক ভেতরে এসে ঢুক্‌ল, তার চেহারাখানা সত্যিই দেখবার মতো। নতুন অতিথির সর্বাঙ্গে পশম আর লোমওয়ালা চামড়ার পোশাক। প্রায় সওয়া ছ'ফুট সে লম্বা, চওড়া কাঁধ, চ্যাটালো বুক, সরু কোমর। দাড়ি গোঁফ কামানো, ধারালো ঝক্‌ঝকে মুখটা ঠাণ্ডায় গোলাপী হয়ে উঠেছে। চোখের বড় বড় পাতায়, ভুরুতে তুষারকণা লেগে আছে, কান আর ঘাড়ের কাছে চামড়ার টুপির ঢাক্‌নাটা একটুখানি খোলা। সব মিলিয়ে আগন্তুককে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছবির বই থেকে স্বয়ং তুষার দেশের রাজা নেমে এসেছে। চওড়া কোমরবন্ধনী থেকে দুটো 'কোল্ট' রিভলভার আর শিকারিদের একটা বড় ছোরা ঝুলছে। হাতে চাবুক ছাড়াও ধরা আছে একটা নতুন, ঝক্‌ঝকে বড় রাইফেল। বেশ দৃঢ়, হালকা পায়ে সে এগিয়ে এল বটে, কিন্তু তার চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ বেশ স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছিল। কেবিনের সবাই প্রথমটা একটু চুপ করে গেছিল। আগন্তুক কিন্তু ভেতরে ঢুকেই তাদের দেখে হাসিমুখে বলে উঠ্‌ল—'কিহে বন্ধুরা, সময়টা বেশ ভালই কাটছে দেখছি?' ওর সহজ, খোলামেলা ব্যবহারে ঘরের আবহাওয়াটা সঙ্গে সঙ্গেই হাল্‌কা হয়ে গেল। তারপর কিড্ এগিয়ে এসে আগন্তুকের সঙ্গে হাত মেলাল। দেখা গেল, সামনা-সামনি দেখাসাক্ষাৎ না হলেও দুজনেই পরস্পরের নাম ভালভাবেই জানে। অতএব আলাপ জমে উঠ্‌তে একেবারেই দেরি হল না। নতুন অতিথি বেশি কিছু বলার আগেই অবশ্য তার হাতে কিড্-এর তৈরি সেই বিখ্যাত 'ককটেল পাঞ্চ'-এর একটা ভর্তি মগ ধরিয়ে দেওয়া হল। হোঁৎকা বেলডেন ওকে জিজ্ঞেস করল—'তা, ডসন থেকে কখন বেরিয়েছ, কাল রাতে?'

'নাঃ, আজ দুপুর বারোটায়।'—আগন্তুক জবাব দিল।

আশপাশের লোকেরা ওর কথা শুনে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল! বলে কি লোকটা? এখন বাজে রাত বারোটা। তার মানে, মাত্র বারো ঘণ্টা সময়ে ও এই জঘন্য যাচ্ছেতাই পঁচাত্তর মাইল রাস্তা পেরিয়ে এসেছে? যাই হোক্, এরপরে সবাই মিলে আগন্তুকের সঙ্গে নানারকম গল্পগুজবে মেতে উঠ্‌ল। কিড্ খানিকটা

'বেকন' আর চমরী গাইয়ের মাংস ভেজে, আর এক কাপ কফি তৈরি করে, নতুন অতিথিকে খেতে দিল। ইতিমধ্যে সে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগন্তুকের মুখখানা দেখে নিয়েছে। লোকটার চেহারাখানা কিড্-এর খুব ভাল লাগল। ওর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই ও বুঝে গেল, লোকটা খুব সৎ, সরল আর খোলামেলা স্বভাবের মানুষ—মনে কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ বা কুটিলতা নেই। তবে অমায়িক আর ভদ্র হলেও, ভারী চোয়াল আর ধারালো চিবুক দেখে বোঝা যায় যে দরকার হলে এই লোকটাই খুব কঠোর, আর দৃঢ়-সংকল্পও হয়ে উঠ্‌তে পারে। ওর স্বপ্নালু, ভাবাচ্ছন্ন চোখেমুখে জেদ, কঠিন পরিশ্রম আর কষ্টসহিষ্ণুতার গভীর ছাপও ফুটে উঠেছে। এক কথায় কিড্-এর মনে হল যে লোকটা একই সঙ্গে সিংহের মতো তেজী, আবার মেয়েদের মতোই কোমল স্বভাব।

বেল্‌ডেন ইতিমধ্যে তার নিজের বিয়ের সরস কাহিনী ফেঁদে বসেছিল। ওর জাঁদরেল হবু শ্বশুর যে ওকে বিয়ের আগে কিরকম তাড়া লাগিয়েছিল, তা শুনে তো সবাই হেসে অস্থির। আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, 'তা, আপনার বাচ্চা-কাচ্চা কটি?' হাসিখুশি বেল্‌ডেন এবার হঠাৎ কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে মদের কাপটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'নাঃ, সে সব কিছু নেই। স্যাল, মানে আমার বউ, কোনো বাচ্চাকাচ্চা হওয়ার আগেই হঠাৎ মরে গেল কিনা! তাই তো আমিও এখানে চলে এলাম! তা, তোমার বিয়ে-থা হয়েছে তো ভায়া?'

আগন্তুক ওর গলায় ঝোলানো বড় লকেটটা খুলে ফেলে বেল্‌ডেনের সামনে মেলে ধরল। লকেটের মধ্যে ভারী সুন্দর চেহারার একটি যুবতীর ফটো। কোলে একটা ফুট্‌ফুটে বাচ্চা। আগন্তুক একটু ম্লান হেসে বলল, 'বাচ্চাটার বয়স এই দু'বছর হল—ছেলে। আমি অবশ্য এখনো ওকে চোখেই দেখিনি।' বেল্‌ডেনের কাছ থেকে আর সবাই কাড়াকাড়ি করে ফটোটা চেয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। এক নিমেষে তাদের সকলেরই মন চলে গেল বহু দূরে—তাদের ঘরের কোণটিতে। তাদের প্রিয়জনেরা এখন কে কেমন আছে কে জানে! তাদের এই কঠিন, দুঃসহ জীবনযাত্রার মধ্যে মেয়েটি আর তার বাচ্চাটার ফটোটা যেন বয়ে নিয়ে এল এক ঝলক বসন্তের হাওয়া, এক টুকরো সবুজ প্রান্তরের হাতছানি। তাদের তুষার কঠিন, রুক্ষ মনগুলোও যেন এক মুহূর্তের জন্য গলে জল হয়ে গেল। গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠ্‌ল।

আগন্তুক লকেটটা ফেরৎ নিয়ে বন্ধ করার আগে অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টে ফটোটার দিকে চেয়ে রইল। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার জলভরা চোখ কাউকেই

ফাঁকি দিতে পারল না। কিড্ এবার তাকে জানাল—'এবার শুয়ে পড়। আবার তো তোমাকে খুব ভোরেই বেরিয়ে পড়তে হবে, তাই না?' একটা ঝোলানো বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে আগন্তুক জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ভোর চারটের সময় বেরোব। ঠিক সেই সময়ে জাগিয়ে দেবেন কিন্তু—নইলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।' —কথাগুলো বলতে বলতেই গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল সে। কিড্‌কে এবার সবাই মিলে ঘিরে ধরল—'কে হে লোকটা, কিড্? দারুণ সাহসী আর কষ্টসহিষ্ণু, তা বলতেই হবে। তুমি ওকে আগে থাকতেই চিনতে বুঝি?' কিড্ উত্তর দিল—'ওর নাম জ্যাক ওয়েষ্টন্‌ডেল। ওকে চোখে না দেখলেও ওর সব কথাই সিট্‌কা চার্লির কাছ থেকে ভালভাবে শুনেছি। দারুণ জেদী আর একগুঁয়ে লোক—আর সেটাই ওর দোষ, গুণ—যা ইচ্ছে বল। প্রায় বছর তিনেক হতে চলল, লোকটা তেজী ঘোড়ার মতো অক্লান্তভাবে খেটে যাচ্ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ছাড়া এখনো পর্যন্ত ওর ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি। দু'দুবার ছপ্পর ফুঁড়ে অনেক টাকাকড়িও পেয়েছিল—কিন্তু রাখতে পারেনি।' কিড্-এর সরল হৃদয় শ্রোতারা ওর কথা শুনে খুব দুঃখ পেল— 'আহারে, বেচারা! ঘরে এরকম একটা মিষ্টি, ভাল বৌ, ফুট্‌ফুটে একটা বাচ্চা, আর সেসব ছেড়ে কিনা হতভাগাকে এরকম একটা অভিশপ্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, যেখানে যমে আসতেও ভয় পায়! এখানে এক বছর থাকা মানেই তো কম করেও দুটি বছর পরমায়ু কমে যাওয়া!'

এরপর খানিকক্ষণ ধরে সবাই মিলে ওয়েষ্টনডেলের কথা আলোচনা করল। তারপরেই আবার শুরু হয়ে গেল হৈ-হুল্লোড়, হাসি-ঠাট্টা, গান। হাড়ভাঙা খাটুনি আর প্রতিদিনের একঘেয়েমী থেকে আজকের দিনটা ওরা ছুটি পেয়েছে। তার প্রতিটি মুহূর্তই ওরা নিঃশেষে উপভোগ করে নিতে চায়। কিড্ কিন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল,—কি যেন সে ভাবছে। একবার সে চামড়ার টুপি আর দস্তানা পরে কেবিন থেকে বেরিয়ে ভাঁড়ার ঘরটাতে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন করল। ওয়েষ্টনডেলকে কিড্ চারটে বাজবার মিনিট পনেরো আগেই ঘুম থেকে উঠিয়ে দিল। বেচারীর সারা শরীর একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—জোরে জোরে সারা গায়ে মালিশ করে সাড় ফিরিয়ে আনতে হল। যাই হোক্, সুস্থ হয়ে উঠে ওয়েষ্টনডেল তার স্লেজ-এর কাছে গিয়ে দেখল যে, কিড্ ইতিমধ্যেই কুকুরগুলোকে গাড়িতে জুড়ে সব ঠিকঠাক তৈরি করে রেখেছে। কেবিনের সবাই গেট পর্যন্ত এসে খুব আন্তরিকভাবে ওয়েষ্টনডেলকে বিদায় জানাল। কিড্ অবশ্য স্লেজের সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত ওকে এগিয়ে দিতে গেল। ওয়েষ্টনডেলকে ও জানাল, 'বুঝলে

ওয়েষ্টনডেল, তোমার স্লেজে কুকুরগুলোর জন্য একশো পাউণ্ড 'স্যামন' মাছের ডিম দিয়ে দিয়েছি। তাতে দেড়শো পাউণ্ড মাছের সমান কাজ দেবে। তুমি নিশ্চয়ই ভেবেছিলে যে 'পেলি'-তে পৌঁছে খাবার দাবার পাবে। কিন্তু সেখানে এক দানাও খাবার মিলবে না। একেবারে 'ফাইভ ফিংগার্স' এ খাবার দাবার পেতে পার—তা সে জায়গাটা তো এখান থেকে পাক্কা দু'শ মাইলের রাস্তা। মাঝে তিরিশ মাইলের নদীটা খুব সাবধানে পেরবে—নদীর মধ্যে চোরা স্রোত আছে।'

কৃতজ্ঞতায় ওয়েষ্টনডেলের চোখদুটি ছলছল করে উঠ্‌ল। খুব অবাকও হয়ে গেল সে। কিড্‌কে সে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি আমার গতিবিধি সম্বন্ধে এত কিছু জানলেন কি করে? আমার সব খবর কি তাহলে আগেই সব জায়গায় পৌঁছে গেছে?' কিড্ উত্তর দিল—'আমি তোমার কোনো খবর রাখি না, রাখতেও চাই না। তবে সিট্‌কা চার্লির কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে সব কিছুই শুনেছি। চার্লি একথাও আমাকে বলেছে যে তুমি খুব খাঁটি লোক। চার্লিকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি। আমার নিজেরও তোমাকে দেখে ভাল লেগেছে। তাছাড়া, এত সুন্দর সংসার, বৌ-বাচ্চা ছেড়ে তোমাকে এ ভাবে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে—' কথাগুলো বলতে বলতে কিড্ জামার ভেতর থেকে ওর টাকার থলিটা বরে করে আনল। ওয়েষ্টনডেলের চোখে এবার জল এসে গেল। কিড্-এর হাতখানা সজোরে চেপে ধরে ধরা গলায় সে বলে উঠ্‌ল—'না না, এসবের দরকার নেই।

'তাহলে এবার বেরিয়ে পড়।' —কিড্ শেষবারের মতো ওয়েষ্টনডেলকে আরো কয়েকটা দরকারী পরামর্শ দিয়ে দিল। —'কুকুরগুলোকে যতটা পার খাটিয়ে নেবে। যেই দেখবে কোনো কুকুর আর ঠিকমতো চলতে পারছে না, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে স্লেজের দড়ি থেকে খুলে দিয়ে নতুন তাজা কুকুর জুড়ে দেবে। 'ফাইভ ফিংগার্স', 'লিট্‌ল স্যামন' আর 'লুটালিংকুয়া'—এ সব জায়গায় নতুন কুকুর কিনতে পারবে। আর হ্যাঁ, গা যেন ভিজে না যায়, সে দিকে একেবারে সবসময় নজর রাখবে। যদি দেখ যে তাপমাত্রা ক্রমশঃ হু হু করে নেমে যাচ্ছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই পথ চলা থামিয়ে দিয়ে বড় করে একটা আগুনের কুণ্ড তৈরী করবে, আর পায়ের মোজাগুলো পাল্‌টে নেবে। বিদায়, বন্ধু। শুভযাত্রা!'

ওয়েষ্টনডেল চলে যাওয়ার মিনিট পনেরো পরেই কেবিনের বাইরে আবার নতুন অতিথি এসে পৌঁছবার আওয়াজ পাওয়া গেল। এবার কেবিনে এসে ঢুক্‌ল উত্তর পশ্চিম এলাকার পুলিশ বাহিনীর এক ক্যাপ্টেন। সঙ্গে দুজন দো-আঁসলা স্লেজ-

চালক। ক্যাপ্টেনকে একেবারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে স্রেফ মনের জোরে সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকেই সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওয়েষ্টনডেল তো এখানে এসেছিল নিশ্চয়ই? কতক্ষণ আগে সে এখান থেকে বেরিয়েছে?' —কিড্-এর সঙ্গে ঘরের আর সকলের চোখে চোখে ইসারায় কথা হয়ে গেল। ফলে, কেউই আর ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিল না। একথা সেকথা বলে এড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল। ক্যাপ্টেন এবার বেশ রাগত ভাবেই বলে উঠ্‌ল—'কি হল কি? ঠিক কতক্ষণ আগে সে এখান থেকে বেরিয়েছে, সেটা কেউই জানেন না আপনারা?' এবার হোঁৎকা বেলডেন ওকে পাল্টা প্রশ্ন করল—'কি ব্যাপার বলুন তো? ওর দেখা পাওয়াটা যেন আপনার পক্ষে খুবই জরুরী বলে মনে হচ্ছে? কেন, ডসনে ও কিছু করে এসেছে নাকি?'

'কি করেছে জানতে চান? হ্যারি ম্যাক্‌ফারল্যাণ্ডের কাছ থেকে জোর করে চল্লিশ হাজার ডলার আদায় করেছে, তারপর সেই টাকাটা 'ক্রেডিট স্টোর'-এ জমা দিয়ে সিআট্‌ল-এর ব্যাঙ্কের ওপর একটা চেক লিখিয়ে নিয়েছে। যদি ওকে মাঝ-রাস্তায় ধরতে না পারি, তাহলে সিআট্‌ল পৌঁছেই তো ও চেক্‌টা জমা দিয়ে টাকাটা তুলে নেবে। তখন তো আর কিছুই করার থাকবে না। যাক্, এবার বলে ফেলুন তো, বাছাধন কতক্ষণ আগে এখান থেকে বেরিয়েছে?'

ক্যাপ্টেনের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে তো সবাই হতবাক্ হয়ে গেল! কিন্তু কিড্-এর কাছ থেকে আবার ইসারা পেয়ে কেউ কিছু বলল না। শেষ পর্যন্ত ফাদার রোবোঁর ওপর ক্যাপ্টেনের চোখ পড়ল। পাদ্রী মশাই তো আর মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। তাই তাঁকে অগত্যা জানাতে হল—'ওয়েষ্টনডেল পনেরো মিনিট আগে বেরিয়ে গেছে। তবে, তার আগে সে আর তার কুকুরগুলো পেট ভরে খেয়ে চার ঘণ্টা বিশ্রাম পেয়েছে।'

ফাদার রোবোঁর কথা শুনে ক্যাপ্টেন তো হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল, প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল তার। ডসন থেকে একটানা দারুণ জোরে দৌড়ে মাত্র দশ ঘণ্টায় সে এতখানি রাস্তা পেরিয়ে এসেছে—সে নিজে, স্লেজ-চালক, আর কুকুর—ক্লান্তি আর খিদেতে সকলেরই অবস্থা শোচনীয়। কারুরই আর দাঁড়ানর ক্ষমতা নেই। তারপরে এই হতাশা। ওর চোখমুখের অবস্থা দেখে কিড্ তাড়াতাড়ি ওর হাতে এক পাত্র 'কক্‌টেল পাঞ্চ' ধরিয়ে দিল। সেটা খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়েই কাপ্টেন তক্ষুণি আবার বেরিয়ে পড়তে চাইল। সঙ্গের দুজন স্লেজ-চালক কিন্তু একদম বেঁকে বসল। সারাদিন এই অমানুষিক পরিশ্রমের পর এই উষ্ণ আশ্রয় আর

বিশ্রামের আশ্বাস পেয়ে ওরা কিছুতেই আর সঙ্গে সঙ্গে বেরোতে রাজি হল না। তারা মনিবকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করল যে কুকুরগুলো এখুনি আর এক পা-ও চলতে পারবে না। ওদের সকলেরই বেশ খানিকটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। ক্যাপ্টেন কিড্-এর দিকে ফিরে বলল—'আমাকে গোটা পাঁচেক কুকুর ধার দেবেন?' কিড্ অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। 'আমি পাঁচ হাজার ডলারের চেক লিখে দিচ্ছি'—ক্যাপ্টেন আবার অনুরোধ করল—'আমার সে ক্ষমতা আছে। আপনি আমার কাগজপত্র সব খুঁটিয়ে দেখতে পারেন।' কিন্তু কিড্ আবার তার নিঃশব্দ অসম্মতি জানাল। ক্যাপ্টেন এবার ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তাহলে আমি আমাদের রানীর নামে তাঁর কাজের জন্য কুকুরগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছি।' ক্যাপ্টেনের কথায় কিড্ একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল শুধু। তারপর কেবিনের অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই তাকগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ইংরেজ নিজের অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পেরে আর কোনো কথা না বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর অনিচ্ছুক স্লেজ-চালক দুজনকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিতে দিতে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে বলল। চালক দুজনেও পাল্টা গালাগাল দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর হতভাগ্য ক্লান্ত কুকুরগুলোকে নির্দয়ভাবে চাবুক মেরে আবার স্লেজ গাড়িতে জুড়ল। তবে 'ব্যাবেট' নামের কুকুরটাকে ওরা কিছুতেই সঙ্গে নিতে পারল না—শেষ পর্যন্ত সেটাকে ফেলে রেখেই ক্যাপ্টেন বেরিয়ে পড়ল। ওরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেবিনের সব অতিথিরা ওয়েষ্টনডেলের ওপর রাগে ফেটে পড়ল। 'বদ্‌মাইস্, ঠকবাজ, মিথ্যেবাদী কোথাকার'—সবাই একসঙ্গে ওয়েষ্টন-ডেন সম্বন্ধে এইসব মন্তব্য করতে শুরু করে দিল। ওয়েষ্টনডেল যে ওদের এতগুলো লোককে বোকা বানিয়ে গেছে, এই চিন্তা ওদের ক্ষেপিয়ে তুলল। তাছাড়া, এই সুদূর উত্তরের তুষার রাজ্যে সততাকেই ওরা মানুষ চেনবার একমাত্র মাপকাঠি বলে জানত। ওয়েষ্টনডেল যে এরকম একটা অসৎ লোক, সেটা যেন ওরা সহ্য করতে পারছিল না। এবার সবাই কিড্-এর দিকে ফিরে তাকাল, সে দৃষ্টিতে অভিযোগ আর তিরস্কার। অনেকে বলে উঠ্‌ল, 'সবচাইতে দুঃখের ব্যাপার হল, ওয়েষ্টনডেল লোকটা সম্বন্ধে সব কিছু জেনেও তাকে পালিয়ে যেতে আমরা সাহায্য করলাম।'

কিড্ এতক্ষণ ঘরের এককোণে বসে ক্যাপ্টেন-এর ফেলে যাওয়া 'ব্যাবেট' নামে কুকুরটার শুশ্রূষা করছিল। এবার সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর সবার

পাত্রে শেষবারের মতো বাকি 'ককটেল পাঞ্চ' টুকু ঢেলে দিয়ে যেন নিজের মনেই বলে উঠ্‌ল—'ওঃ, কি দারুণ ঠাণ্ডাটাই না পড়েছে! পথ চলার পক্ষে কি সাংঘাতিক রাত! ওহে বন্ধুরা, ঠাণ্ডাটা কি রকম, তা বুঝতে পারছ? তোমরা সবাই তুষার প্রান্তরের পথে চলাফেরা কর,—তাই সে পথ যে কি জিনিস তা তোমরা খুব ভাল ভাবে জান। শোন, যে লোকটা মাটিতে পড়ে গেছে, তাকে কখনো আঘাত করতে নেই। ওয়েষ্টনডেলের বিষয়ে তো তোমরা একতরফা ভাবেই সব কথা শুনে গেছ এতক্ষণ। আমার কাছ থেকে এবার একটা কথা শোন। ওয়েষ্টনডেল-এর চাইতে বেশি খাঁটি আর সৎ লোক অন্ততঃ দেখিনি। গত বছরের শেষদিকে বেচারি ওর যথাসর্বস্ব চল্লিশ হাজার ডলার জো ক্যাস্‌ট্রেলের হাতে তুলে দিয়ে তাকে 'ডোমিনিয়ন' খনির শেয়ার কিনতে বলেছিল। আজকে ওয়েষ্টনডেলের নিযুতপতি হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হল? অকার্ডি রোগে শয্যাশায়ী ওর পার্টনার-এর দেখাশুনা করবার জন্য ওয়েষ্টনডেল 'সার্কেল সিটি'তে আট্‌কা পড়ে রইল। আর হতভাগা জো ক্যাস্‌ট্রেল ম্যাকফারল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগসাজশে জুয়া খেলে ওয়েষ্টনডেলের শেষ পাই পয়সাটি পর্যন্ত উড়িয়ে দিল। ক্যাস্‌ট্রেল হতচ্ছড়া তো পরের দিনই তুষারঝড়ের মধ্যে পড়ে মারা গিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। এদিকে ওয়েষ্টনডেল ঠিক করে ফেলেছিল যে এবছর শীতকালে অর্থাৎ এই সময়টাতে দেশে ওর বৌ আর বাচ্চার কাছে ফিরে যাবে। ওদের ফটোটা একটু আগেই তোমরা দেখেছ। বাচ্চার বয়স প্রায় দু'বছর হতে চলল, কিন্তু ওয়েষ্টনডেল এখনো পর্যন্ত তাকে চোখে দেখারও সুযোগ পায় নি। হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে, ওর যতটা টাকা মারা গেছিল, ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই ও নিয়ে নিয়েছে, চল্লিশ হাজার ডলার। এক পয়সাও কম নয়, বেশিও নয়। যাই হোক্‌, এই হল ওর কাহিনী, আর আমার, অর্থাৎ আমি, সব কিছু জেনেই ওকে যেতে দিয়েছি। তোমরাই এখন বল, তোমরা কি করতে চাও?'

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে কিড্‌ তার একাধারে অভিযোগকারী আর বিচারক বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে রইল। ও দেখতে পেল, আস্তে আস্তে ওদের মুখের কঠিন রেখাগুলো কোমল হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠ্‌ল স্বপ্নাতুর। এবার কিড্‌ তার পানপাত্রটা উঁচুতে তুলে ধরে বলল—'তাহলে বন্ধুরা, যে লোকটা এই কঠিন, কনকনে রাতে বাইরে তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করে চলেছে, এসো আমরা সবাই মিলে আবার তার স্বাস্থ্যপান করি। ওর খাবার দাবার যেন মাঝপথে

ফুরিয়ে না যায়, ওর স্লেজের কুকুরগলোর পা যেন ঠিক থাকে, সুস্থ সবল থাকে, ওর আগুন জ্বালাতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়, ভগবান যেন ওর ভাল করেন, ভাগ্য-দেবী যেন ওর সহায় হন ! আর, আর……'

'……সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন আর দলবল যেন গোলকধাঁধায় ঘুরে ওদের নাগাল না পায়।'—বেট্‌লস্‌ ও তার দলবল সজোরে পরস্পরের পানপাত্রে ঠোকাঠুকি করে একযোগে বাকি কথাগুলো চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল।

SOUTH OF THE SLOT

রূপান্তর

আচমকা বজ্রপাতের মতোই চকিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ফ্রেডি ড্রামণ্ড তার বিদুষী, সুন্দরী প্রেমিকা ক্যাথারিনের সঙ্গে গাড়িতে বসে সামনের রাস্তায় ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের প্রচণ্ড লড়াই দেখছিল। হঠাৎই যেন ফ্রেডি ড্রামণ্ডের ভেতরে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। একটা বন্য, জান্তব চিৎকার করে এক ঝট্‌কায় গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল সে, তারপরেই ঝড়ের বেগে ছুটে গেল ধর্মঘটীদের দিকে। এতক্ষণ গাড়িতে পাশে বসে থাকা প্রেমিকার কথা ওর মনেই রইল না। বিস্ফারিত চোখে সুন্দরী ক্যাথারিন দেখল, তার এতদিনকার পরিচিত সভ্য, ভদ্র, মার্জিত ফ্রেডি ড্রামণ্ড পলকে রূপান্তরিত হয়েছে উদ্দাম, চঞ্চল এক বেপরোয়া 'বিল টট্‌স্‌'-এ—সমবেত জনতা 'বিল, বিল টট্‌স্‌ এসে গেছে', বলে সোৎসাহে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এই রূপান্তরিত 'বিল টট্‌স্‌' সিংহ বিক্রমে গিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে দাঁড়াল এক তরুণ, বিশালদেহী ধর্মঘটী ট্রাক চালকের পাশে, এতক্ষণ ধরে যে একলাই একাধিক পুলিশের সঙ্গে এক অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। 'বিল'কে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে ধর্মঘটী সমবেত জনতার যে অংশটি এতক্ষণ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও এবার জলোচ্ছ্বাসের মতো পুলিশের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘটনাটা ঘটল সানফ্রান্সিসকো শহরের ঠিক মধ্যিখানে, তার বিখ্যাত 'স্লট'-এর একেবারে ওপরেই। সানফ্রান্সিসকো শহরটাকে আগে বেশ পরিষ্কার ভাবেই দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলা যেত। শহরের কেন্দ্রস্থলে যে মার্কেট স্ট্রীট, তাকে আবার ঠিক মাঝ বরাবর এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে একটা চওড়া ফাটা দাগ, যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'স্লট'। এই স্লট-এর উত্তর আর দক্ষিণ দিকের মধ্যে পার্থক্যটা চোখে পড়ে খুব সহজেই। স্লটের উত্তর দিকটা হল সম্ভ্রান্ত এলাকা, সেখানে আছে যত নামী দামি ব্যবসায়ীদের অফিস। কারখানা, সিনেমা-থিয়েটার আর হোটেলের সারি। দক্ষিণ দিকটায় সমাজের একেবারে নিচুতলার লোকেদের বাস। বস্তি আর কুলিদের ব্যারাকে ভর্তি। এছাড়া চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র কলকারখানা। স্লটের দুদিকের এই দুই আলাদা শ্রেণীর মধ্যে যাতায়াত বা মেলামেশা ছিল না

বললেই চলে। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র ফ্রেডি ড্রামণ্ড। দুদিকের এই দু ধরনের জীবনযাত্রাতেই সে ছিল পুরোপুরি অভ্যস্ত—কোনোরকম সামাজিক অসুবিধাই সে এতে বোধ করত না। পেশায় ফ্রেডি ছিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ-বিদ্যার অধ্যাপক। এবং এই অধ্যাপনার ব্যাপারে রিসার্চ করতে গিয়েই সে প্রথম দক্ষিণের বস্তিতে গিয়ে পাক্কা ছটি মাস কাটিয়ে এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'আর্দশ শ্রমিক' নামে যে বইখানা সে লিখেছিল, সেখানা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক--এই দুদিক থেকেই একটা অসাধারণ সৃষ্টি বলে রক্ষণশীল মহলে স্বীকৃত হয়েছিল। বইখানা পুরোপুরি মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা, স্বভাবতই মালিকমহল এই বইটিকে দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। বলা বাহুল্য, শ্রমিকদের মধ্যে বইখানাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টাও করেছিলেন তাঁরা। বইখানার মধ্যে অনেক ভুল তথ্যও দেওয়া হয়েছিল। কারণ ফ্রেডির সিদ্ধান্তগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অনুমানভিত্তিক আর একপেশে।

প্রথম প্রথম বস্তির কুলি মজুরদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে ফ্রেডির বেশ অসুবিধা হয়েছিল। কুলি মজুররাও ওকে প্রথম প্রথম বেশ একটু সন্দেহের চোখেই দেখত। ওর সভ্য ভদ্র, মার্জিত ব্যবহার ও কথাবার্তা তাদের দৈনন্দিন রুক্ষ জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খেত না একেবারেই। আস্তে আস্তে অবশ্য তারা ধরে নিল যে লোকটার অবস্থা এককালে খুব ভাল ছিল, ভাগ্য বিপর্যয়ে এখন এরকম অবস্থায় এসে নেমেছে।

ফ্রেডি প্রথমে কাজ পেয়েছিল 'উইলম্যাক্স ক্যালী' নামে একটা কারখানায়। কাজটা ছিল 'পিস রেট'-এর। সাধারণ শ্রমিকরা সেখানে দিনে রোজগার করত গড়ে পৌনে দু ডলারের মতো। ফ্রেডি বেশি খেটে, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে তিনদিনের মধ্যেই তার দৈনিক রোজগার তিন ডলারে নিয়ে গেল। কিন্তু তার অন্যান্য সহকর্মীদের এই বেশি খাটবার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হল না। তাদের আপত্তিতে অবশ্য ফ্রেডি প্রথমটায় কান দেয় নি। বরং 'কাজ করার স্বাধীনতা' নিয়ে বেশ জ্ঞান-গর্ভ কথাবার্তা ও তর্কাতর্কি জুড়ে দিয়েছিল। ফল হল এই যে, ওর সহকর্মীরা একদিন ওকে ধরে বেদম পেটাল। এর পরেই 'শ্রমে স্বেচ্ছাচারিতা' নামে ফ্রেডির যে বইখানা বেরোল, সেটা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা। তবে এই ঘটনার পর ফ্রেডি আর তার শ্রমের মাধ্যমে নতুন কিছু করার চেষ্টা করেনি। এখন তার ভূমিকা ছিল নিছক পর্যবেক্ষকের। কাজে ফাঁকি মারার বিভিন্ন উপায়গুলো সে এমনভাবে লক্ষ্য করেছিল যে এই বিষয়ের ওপর সে ঐ বইয়ে একটা বিশেষ অনুচ্ছেদই লিখে ফেলেছিল। প্রথম ছ মাসে ফ্রেডি ছবার চাকরি বদল করেছিল। শ্রমিকদের

মুখের কথ্য চালুভাষা বা 'আর্গো'ল' একেবারে নিখুঁত ভাবে শিখে নিয়েছিল ফ্রেডি। তার ফলে শ্রমিকদের মনের গতিপ্রকৃতি বোঝা ওর কাছে খুবই সহজ হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়াও ফ্রেডি ছিল খুব পাকা অভিনেতা, এবং সব রকম পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সিদ্ধহস্ত। ও একবার লিখেছিল যে, শ্রমিকদের ঠিকমতো জানতে বা বুঝতে গেলে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে যেতে হবে, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সুখ দুঃখ সমস্যার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে নিজেকে পুরোপুরি তাদেরই একজন হয়ে যেতে হবে। আর সত্যি সত্যিই ফ্রেডি যে কোনো স্তরের শ্রমিকের সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ ভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত।

যতই দিন যেতে লাগল, স্লটের দক্ষিণে ঢুকে পড়ে শ্রমিকের জীবন কাটানোও ততই বেড়ে চলল ফ্রেডির। দক্ষিণের এই জীবনযাত্রা যেন ওর কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে লাগল। দক্ষিণের এই শ্রমিক দুনিয়ায় ঢোকা মাত্র ও আর 'ফ্রেডি ড্রামন্ড' থাকত না, তখন সে হয়ে যেত 'বিগ বিল টট্‌স্‌'। 'ফ্রেডি' ও 'বিগ বিল'—শারীরিক দিক থেকে এরা দুজন আলাদা ছিল না বটে, কিন্তু মানসিক গঠনে এরা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুর বাসিন্দা। 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' ছিল খুব রক্ষণশীল, নিয়মানুগ এবং নিখুঁত আচার ব্যবহার মেনেচলা এক অধ্যাপক, অন্যদিকে 'বিগ বিল' ছিল বেপরোয়া। উদ্দাম ও স্ফূর্তিবাজ এক শ্রমিক। ফ্রেডির শীতলতা আর কঠিন নীতিবাগিশতার জন্য ওর পরিচিত মহল ওকে 'হিমঘর' বলে ঠাট্টা করত। মহিলাদের সঙ্গে মেশা, মদ খাওয়া, নাচা—এ সবই ফ্রেডি এড়িয়ে চলত। আর 'বিগ বিল' মদ ও সিগারেট খেতে, মেয়েদের সঙ্গে মিশতে আর সারারাত ধরে উদ্দাম নাচগান করতে তেমন-ই পটু এবং আগ্রহী ছিল। ফ্রেডি পোশাকটা পাল্টে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার আচার ব্যবহারচালচলন বদলে যেত নিজে থেকেই—একেবারে আমূল সে পরিবর্তন। ওদের চেহারাতেও কিরকম একটা সূক্ষ্ম তফাৎ এসে যেত। ফ্রেডি ড্রামণ্ডের মুখখানা ছিল গাম্ভীর্য আর কাঠিন্যে ভরা, কিন্তু বিগ বিল ছিল একেবারে সদাহাস্যময়, দিলখোলা এক পুরুষ। তবে সেই সঙ্গে বিল ছিল এক আপোশহীন সংগ্রামী, নিজের তথা মজদুর শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার আর দাবিদাওয়া সম্বন্ধে একেবারে সদা সচেতন। বিশেষ করে যে সব ভাড়াটে দালাল শ্রমিক বা 'স্ক্যাব'-দের ধর্মঘট ভাঙার কাজে লাগান হত, তাদের প্রতি বিগ বিল-এর ছিল এক সীমাহীন ঘৃনা। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো 'স্ক্যাব'-কে ধরে পেটাত সে। ফ্রেডি ড্রামন্ড চিন্তা করত আন্তর্জাতিক বাজার আর আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ

—এই সব উচ্চতম স্তরের বিষয় নিয়ে আর বিগ বিল-এর সবটুকু চিন্তা ভাবনা ঘুরপাক খেত দৈনন্দিন রুজি রুটির লড়াই আর মারপিটকে কেন্দ্র করেই।

'কর্মজগতে নারী'—এই বইখানার জন্য মালমশলা জোগাড় করতে গিয়েই কিন্তু ফ্রেডি প্রথম টের পেল যে, সে একটা বিরাট সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সংকটের কারণ হল ওর এই অদ্ভুত দ্বৈত সত্ত্বা। মালিক ও শ্রমিক এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতেই ফ্রেডি ছিল সমান ভাবে সফল। কিন্তু এরকম অবস্থা তো বেশি দিন চলতে দেওয়া যেতে পারে না, একটা জগত পাকাপাকি ভাবে তাকে বেছে নিতে হবেই। নিজের লেখা বিভিন্ন বইয়ের দিকে তাকিয়ে ফ্রেডি ঠিক করল, 'ফ্রেডি ড্রামন্ড'-এর জগতটাই সে বেছে নেবে। 'বিগ বিল'-কে এবার চিরতরে বিদায় নিতে হবে—তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ফ্রেডির ভীতির আসল কারণটা ছিল 'আন্তর্জাতিক গ্লাভ্‌স্‌ ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের মহিলা প্রেসিডেন্ট মেরী কংডন। মেরী কংডনকে ফ্রেডি দেখেছিল 'বিগ বিল'-এর চোখ দিয়ে, এবং দেখেই একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল মেরী কংডন এক অপূর্ব, অসাধারণ নারীরত্ন। রূপ ও গুণ দুদিক থেকেই মেরী কংডন 'বিল টট্‌স্‌'-এর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। আর সত্যি সত্যিই মেরী কংডন-এর চেহারায় ছিল এক রাজকীয় সৌন্দর্য—লাবণ্য ও শক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তার দেহে। তার দুটি কালো চোখে রাগ আর কৌতুক এই দুরকম অনুভূতিই সমান ভাবে খেলা করত। 'ফ্রেডি ড্রামন্ড' এত বেশি উচ্ছল বেপরোয়া, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা মেয়েদের একেবারেই পছন্দ করত না। সে নিজে যে রকম নিয়মনিষ্ট, শৃঙ্খলাপরায়ন ছিল ঠিক সেই রকম ধীরস্থির, সংযত স্বভাব, সুরুচিসম্পন্না মেয়েরাই ছিল তার কাছে আদর্শ নারীর রূপ।

বলা বাহুল্য, 'বিগ বিল'-এর চিন্তাভাবনা ছিল ঠিক এর বিপরীত। তাই, প্রথম দর্শনেই সে মেরী কংডনের প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। ওদের দুজনের প্রথম দেখাটাও হয়েছিল খুব আকস্মিকভাবে। যে অসুস্থ শ্রমিকের জায়গায় ও বদলী খাটতে গিয়েছিল, মেরী ছিল সেই শ্রমিকের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। মেরী প্রথমে ভেবেছিল যে 'বিগ বিল' বোধহয় ধর্মঘট ভেঙে বেড়ান ভাড়াটে বা 'স্ক্যাব' শ্রমিকদের একজন। যাইহোক, প্রথমে খুব একচোট ঝগড়াঝাঁটির পর মেরী বুঝতে পারল যে বিলও তারই ইউনিয়নের সদস্য। বিল টট্‌স্‌-এর সুগঠিত চেহারা, সপ্রতিভ কথাবার্তা, পৌরুষদীপ্ত হাবভাব মেরিরও খুব ভাল লেগেছিল।

এরপর ওদের দুজনের দেখা হল এক 'লণ্ড্রী' ধর্মঘটের সময়। বিল এই ধর্মঘটকে সফল করে তোলার জন্য মেরীর প্রধানতম সহকারী হয়ে প্রাণপণে খাটল। ধর্মঘট

শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিল আবার 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' হয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ফিরে গেল, আর বিল টট্‌স্‌ মেরির দিকে কেন ঝুঁকেছে তা ভাবতে থাকল। 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড'-এর মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি বটে, কিন্তু 'বিগ বিল টট্‌স্‌' যে মেরির প্রেমে পড়েছে, সেটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল। তাই 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' ঠিক করে ফেলল যে, 'বিল টট্‌স'-এর অস্তিত্বকে এবার মুছে ফেলতে হবে। কারণ 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' যদি শেষ পর্যন্ত বিয়ে টিয়ে না-ও করে, 'বিল টট্‌স্‌' কিন্তু করবেই। তাই ফ্রেডি এবার তার নিজস্ব সামাজিক মহলে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে শুরু করল। শিগ্‌গীরই ক্যাথারিন ড্যান ডষ্ট-এর সঙ্গে ফ্রেডির একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠল। উচ্চশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না ক্যাথারিন ছিল এক ধনী দার্শনিক অধ্যাপকের মেয়ে। ক্যাথারিনের চারিত্রিক ও মানসিক গঠনও ছিল একেবারে ফ্রেডির মতোই নিরুত্তাপ, গোঁড়া, অভিজাত, নিয়মনিষ্ট। ফ্রেডি দেখল, ক্যাথারিন নিঃসন্দেহে তার যোগ্য জীবন সঙ্গিনী হতে পারবে। অবিলম্বে ওদের বাগ্‌দান পর্বও চুকে গেল। কিন্তু ফ্রেডি স্লটের দক্ষিণে সমাজের নিচুতলার সেই স্বাধীন, বেপরোয়া জীবনযাত্রার কথা ভুলতে পারছিল না কিছুতেই। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল যে, শেষবারের মতো একবার সে ঐ জীবনটা উপভোগ করে নেবে, তারপর ফিরে এসে তার অধ্যাপনার পেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দেবে। অতএব 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' আর একবার 'বিল টট্‌স্‌' হয়ে স্লটের দক্ষিণে ঢুকে পড়ল—ভাবল, এই তার শেষ অভিযান।

এবার যখন 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' আবার ফিরে এল, তখন কিন্তু তার মন পেছনে ফেলে আসা স্মৃতিতে খুব ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। ভাগ্যের এক বিচিত্র পরিহাসে এবার ফ্রেডি 'বিগ বিল' হয়ে স্লটের দক্ষিণে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে মেরী কংডনের দেখা পেয়ে গিয়েছিল, আর বিল একেবারে দ্বিধাহীন ভাবে মেরীর সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই মেরীকে নিয়ে সে ঘুরতে বেরোত। একদিন ফিরে আসার পথে মেরীকে সে বারবার চুমুও খেয়েছে। মেরীও অকপটে স্বীকার করেছে যে, বিলকে সে ভালবাসে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে ফ্রেডি শিউরে উঠল—শেষ পর্যন্ত কি তাকে বহু বিবাহের পথে পা বাড়াতে হবে নাকি? যাই হোক, ফ্রেডি দৃঢ় সংকল্প হল যে এবার থেকে সে কেবলমাত্র 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' হয়েই থাকবে, এই দ্বৈত জীবনযাত্রার মধ্যে আর যাবে না।

ইতিমধ্যে সান্‌ফ্রান্সিসকোতে নিদারুণ শ্রমিক অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মালিকদের লড়াই ক্রমশই কঠিনতর হয়ে উঠছিল।

চারদিকে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ফ্রেডি আর এখন এইসব ঘটনায় মাথাই ঘামাচ্ছিল না। এমন কি বিখ্যাত 'মাংস ধর্মঘট'ও তাকে বিচলিত করতে পারল না। ফ্রেডি এতদিনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল—যাক্ 'বিল টট্স্'-এর ভূত এবার তাহলে পাকাপাকি ভাবে ঘাড় থেকে নেমেছে।

বিয়ে হওয়ার হপ্তা দুয়েক আগে ফ্রেডি আর ক্যাথারিন একদিন শহরের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ওদের সামনেই ছিল ছ খানা মাংসবাহী ওয়াগন। পুলিশের পাহারায় ভাড়াটে বা 'স্ক্যাব' চালক দিয়ে ওয়াগনগুলো চালানো হচ্ছিল, কারণ দীর্ঘ-স্থায়ী ও সফল 'মাংস ধর্মঘট' ভাঙার জন্য মালিকরা এতদিনে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল। বড় বড় হোটেলগুলোতে মাংসের যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সেখানকার ব্যবসাও মাটি হতে বসেছিল। বিশাল এক জনতা চিৎকার করতে করতে ওয়াগন-গুলোর পেছন পেছন ধাওয়া করে যাচ্ছিল। দৈত্যর মতো চেহারার এক যুবক ট্রাক ড্রাইভার তার কয়লার গাড়িটা ঠিক আড়াআড়ি ভাবে রাস্তার ওপর রেখে মাংসের ওয়াগনগুলো যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। অন্যান্য বেশ কিছু গাড়িও এই রাস্তা অবরোধে এসে যোগ দিচ্ছিল। পুলিশদের সঙ্গে ঐ তরুণ ট্রাক ড্রাইভারের এক তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল, জনতাও তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ফ্রেডি ও ক্যাথারিন ধর্মঘটীদের এই ব্যবহারের খুব নিন্দে করতে লাগল। ক্যাথারিন মন্তব্য করল যে এই ধর্মঘটীগুলো একেবারে বুনো অসভ্য। ফ্রেডিও ওর এই মন্তব্যে খুবই খুশি হয়ে উঠল—হ্যাঁ, এই মেয়েই তার জীবন সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্য নিঃসন্দেহে। ইতিমধ্যে পুলিশবাহিনীর ক্যাপ্টেন তরুণ ট্রাক ড্রাইভারটির ছোঁড়া একখণ্ড বড় কয়লার চাঁইয়ের আঘাতে বেশ ভালরকম জখম হয়েছে। ফ্রেডি ড্রামণ্ড এতক্ষণে আর সব কিছু ভুলে গিয়ে কয়লা গাড়ির লড়াই দেখছিল। ওর ভেতরে এখন একটা অন্য প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল—সেখানে বিল টট্স্ জেগে উঠতে চাইছিল প্রাণপণে। হঠাৎ ফ্রেডি ড্রামণ্ড বুঝতে পারল যে, তার ভেতরকার আসল প্রাণ শক্তিটা বিল টট্সের-ই। ক্যাথারিনের পাশে ফ্রেডি ড্রামণ্ড বলে যে লোকটি বসে আছে, তার মনটা ছিল টট্সের। এবং বিল টট্স্ দেখল যে, কয়লা গাড়ির তরুণ ড্রাইভারটি আর বেশিক্ষণ পুলিশবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না—তার ওপর সমানে পুলিশের লাঠির বাড়ি পড়ছে। তবে দুজন পুলিশকে তখনো সে তার লৌহ মুষ্ঠিতে ধরে রেখেছে। এত লড়াই, রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে ক্যাথারিনের গা গুলিয়ে উঠছিল। কিন্তু হঠাৎ একেবারে হতচকিত হয়ে সে দেখল, তার পাশে বসা ফ্রেডি ড্রামণ্ড নামে পরিচিত লোকটি একটা অপার্থিব, বন্য চিৎকার করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর এক

দৌড়ে কয়লার গাড়ির কাছে গিয়ে একেবারে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো পুলিশগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আশপাশের জনতা সহর্ষে চিৎকার করে উঠল—'বিল! বিল এসে গেছে!' এবার পেছন দিক থেকে ধর্মঘটের সমর্থকরা পুলিশের বাধা ভেঙে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল—গোটা পুলিশবাহিনী ও 'স্ক্যাব' ড্রাইভারদের টেনে সরিয়ে নিল তারা। সাময়িক ভাবে হলেও ধর্মঘটীদেরই জিত হল। হঠাৎ রাস্তার একপাশ থেকে একটা 'নারীকণ্ঠ' চেঁচিয়ে উঠল—'বিল সাবধান! সরে পড় এবার।' ক্যাথারিন সেদিকে তাকিয়ে দেখল, খুব উজ্জ্বল রং-এর পোশাক পরা এক দীর্ঘাঙ্গী, বেপরোয়া প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা তরুণী, যে লোকটির দিকে তাকিয়ে মনের সবটুকু আবেগ মিশিয়ে 'বিল, বিল' বলে চেঁচাচ্ছে, তাকে খানিকক্ষণ আগেও ক্যাথারিন 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' বলেই জানত। মেয়েটির দুই কালো আয়ত চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে। 'বিল টট্‌স্‌'-এ রূপান্তরিত লোকটিও লড়াই জিতে মেয়েটির কাছে দৌড়ে গেল। মেয়েটিও দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে পরম আবেগে চুমু খেল। এরপর দুজনে হাত ধরাধরি করে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলল। লোকটি এখন যেরকম খোলামেলা, বেপরোয়া ভাবে কথা বলছিল, তা ক্যাথারিনের ফ্রেডির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। এরপর দুজনে দুজনার সঙ্গে আত্মহারা হয়ে কথা বলতে বলতে 'স্লট' পেরিয়ে গিয়ে শ্রমিক-দের বস্তির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপরে 'ফ্রেডি ড্রামণ্ড' বলে কোনো অধ্যাপক আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বক্তৃতা দেয়নি। তবে 'উইলিয়াম টট্‌স্‌' নামে একজন নতুন শ্রমিক নেতার নাম এই সময় থেকে সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। 'উইলিয়াম টট্‌স্‌'-এর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মেরী কংডন নামে এক শ্রমিক নেত্রীর—এই মেরি কংডন ছিল ৯৭৪ নম্বর গ্লাভ্‌স্‌ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। বহু বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক ধর্মঘট এরা খুব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে শ্রমিকদের অনেক ন্যায়সঙ্গত দাবী মালিকদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন।

THE MARRIAGE OF LIT-LIT

লিট্ লিট্-এর বিয়ে

জন ফক্স্ লোকটা ছিল খুব সরল, কিন্তু কাজেকর্মে খুব দক্ষ, সৎ আর কষ্ট-সহিষ্ণু। তাই 'হাডসন বে' কোম্পানির একজন সামান্য মালবাহী কর্মচারী হয়ে কানাডায় এলেও খুব তাড়াতাড়ি সে তার কোম্পানির একটা দুর্গের প্রধান লোক বা 'ফ্যাকটর'- এর পদমর্যাদা পেয়ে গেল, আর 'ফোর্ট অ্যাঙ্গেলাস' -এ কোম্পানির মাল কেনাবেচার যে ছোট ব্যবসাকেন্দ্রটি ছিল, সেটা দেখাশোনা করার ভার নিল।

জনের জীবনদর্শনে কোনো জটিলতা ছিল না। তাই সে সোজাসুজি একটি স্থানীয় মেয়েকে বিয়ে করে একটা সুখী সংসার পেতে বসল। কিন্তু দুটি ছেলের জন্ম দেওয়ার পর ওর স্ত্রী হঠাৎ মারা গেল। ইতিমধ্যে জনের আরো পদোন্নতি হয়েছে। এবার সে কানাডার সুদূর উত্তর-পশ্চিমে 'সিন রক' নামে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 'ফার' ব্যবসার কেন্দ্রে কোম্পানির দুর্গের সর্বময় কর্তা হয়ে বসল। কিন্তু এখানে এসে জন খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। এখানকার রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সাদামাটা, জৌলুসহীন চেহারা ওর একদম ভাল লাগত না। কিন্তু ওর বাচ্চাদুটোর দেখাশোনা করবার জন্যও ওর সংসারে একজন নারীর খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সমস্যাটা হলো, কাকে জন জীবনসঙ্গিনী করবে? হঠাৎ জন-এর মনে হল, আরে, 'লিট্ লিট্' -এর কথা তো সে ভুলেই গিয়েছিল! স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মোড়ল 'স্নেটিশেন' -এর সপ্তদশী কন্যা লিট্ লিট্‌কে সবদিক থেকেই তার পছন্দসই বলে মনে হল। দো-আঁশলা মায়ের মেয়ে লিট্ লিট্ ছিল তন্বী, সুঠাম এক রূপসী—অন্যান্য মোটাসোটা, বৈচিত্র্যহীন গঠনের রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েদের মতো একেবারেই নয়। দূর দূরান্তর থেকে ভাল ভাল যুবকরা স্নেটিশেন-এর কাছে এসে ওর মেয়েকে বিয়ে করতে চাইত। কিন্তু স্নেটিশেন ছিল একটি বাস্তুঘুঘু, মহা ফিচেল ধরনের লোক। সে মনে করত, লিট্ লিট্ তার এমন এক মহামূল্যবান ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যাকে সে চড়াদামে যথাস্থানে বিক্রি করবে। তাই এই সব যুবকদের সে এককথায় হাঁকিয়ে দিত। জন ফক্স্-এর মতো উঁচুদরের কোনো নামীদামী

বড়লোক পাত্রের দিকেই তার নজর ছিল। তাই, ও তল্লাটের সবচাইতে প্রতিপত্তি-শালী পুরুষ জন ফক্‌স্‌ যখন একদিন তার সবচাইতে ভাল ঘোড়াটায় চেপে স্নেটিশেনের সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন সে জনের আসল মতলবটা বুঝতে পেরে উল্লসিত হয়ে উঠল। হাবভাবে অবশ্য স্নেটিশেন ঘুণাক্ষরেও তা প্রকাশ করল না। দুজনে মিলে সামনের দাওয়ায় তামাক খাওয়ার জায়গাটায় গিয়ে বসল। এরপর দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল বুদ্ধির লড়াই। কেউই আসল কথাটি আগে বলতে রাজি নয়। পৃথিবীর কতরকম বিষয় নিয়ে যে ওদের মধ্যে আলোচনা হল, তার ঠিক নেই। ইতিমধ্যে লিট্‌ লিট্‌ও তরুণীসুলভ কৌতূহলে আড়াল থেকে জনকে বেশ ভালভাবে দেখে নিয়েছে। বাবার কঠোর শাসনে বেড়ে ওঠা নিষ্পাপ সরল লিট্‌ লিট্‌-এর অনাত্মীয় পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। তবে, সহজাত নারীবুদ্ধিতে সে বুঝতে পেরেছিল যে জন তার জন্যেই এসেছে। জনের বলিষ্ঠ, পুরুষোচিত চেহারা ওর খুবই ভাল লাগল, কিন্তু লোকটার ঘন, কালো দাড়ি দেখে আবার একটু ভয়ও হল তার।

বেশ কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা বলার পর জন উঠে পড়ল। ওকে চলে যেতে উদ্যত দেখে লিট্‌ লিট্‌-এর মন হতাশায় ভরে উঠল। কিন্তু যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এইভাবে বলে উঠল জন—'ওহো! একটা কথা বলতে একদম ভুলে গেছি। আমার সংসার দেখাশোনা করার জন্যে একজন মহিলা চাই।'

মনে মনে নেচে উঠল স্নেটিশেন। কিন্তু ঝানু মোড়লটি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—'ও তাই নাকি? তা আমাদের গোষ্ঠীর কাট্রকে আপনার পছন্দ হয়?'

'কাট্র? দূর, ওর তো একটা চোখই নেই।'

'তাহালে—লাশ্‌কা?'

'ধ্যোৎ তেরি, লাশ্‌কা তো ঠিকমতো চলাফেরা করতেই জানে না। ও যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন ওর দুপায়ের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে একটা কুকুর গলে যেতে পারে।'

'ও। তাহলে—সিনেটি?' ঘোড়েল স্নেটিশেন প্যাঁচ কষেই চলল।

এবার দারুণ চটে গেল জন—'ব্যাপারটা কি বল তো? আমি কি অযোগ্য, বিকলাঙ্গ না নিঃস্ব যে যত্তো সব বস্তাপচা জিনিসের খোঁজ দিচ্ছ? আমি একটা উপযুক্ত মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, বুঝেছ?'—বলে সে আবার চলে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দু'-তিন পা গিয়েই আবার বলে উঠল জন—

'আরে, লিট্ লিট্-এর কথা তো আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। এ বিষয়ে তোমার মত কি ?'

মনে মনে অট্টহাস্য করতে করতে স্নেটিশেন ভাবল—যাক শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে সে। জন আর কয়েক পা এগিয়ে গেলে স্নেটিশেন নিজে থেকেই লিট্ লিট্-এর নামটা বলে ফেলত। এবার সে-ই ইচ্ছেমতো দর হাঁকতে পরাবে। তবে মুখে কোনো উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে চুপ করে রইল সে। এবার জন আসল কথায় এল—'শোন স্নেটিশেন, লিট্ লিট্-এর জন্য আমি তোমাকে দশখানা দামী কম্বল আর তিন পাউণ্ড খুব ভাল তামাক দেব। তাহলে হবে তো ?'

স্নেটিশেন মুখের এমন একটা ভঙ্গি করে উঠল, যার মানে দশখানা কেন, দুনিয়ার সমস্ত কম্বল আর তামাক এক জায়গায় জড়ো করলেও তার দাম লিট্ লিট্-এর সমান হবে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জনের পীড়াপীড়িতে সে খুব ঠাণ্ডা মাথায় দাবি করল, লিট্ লিট্-এর জন্যে জনকে পাঁচশো খানা কম্বল, দশটা বন্দুক, কুড়িটা লাল কাপড়ের টুক্‌রো, দশ বোতল রাম আর একটা কলের গান দিতে হবে। তাছাড়া জনের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করবার অধিকারও স্নেটিশেনকে দিতে হবে।

ওর দাবির বহর শুনে জনের তো মাথায় রক্ত চড়ে গেল—ওর মনে হল, ওর বোধহয় মাথার শিরাটা ছিঁড়েই যাবে। ওর চোখমুখের অবস্থা দেখে স্নেটিশেন পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে ওর দাবি অনেক কমিয়ে আনল। তিন ঘণ্টা ধরে দর কষাকষির পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জন স্নেটিশেনকে একশোখানা কম্বল, পাঁচ পাউণ্ড তামাক, তিনটে বন্ধুক আর এক বোতল রাম দেবে। তবে, জনের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে সমানভাবে মেলামেশা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এরপর জন সত্যি সত্যি বিদায় নিল। রণক্লান্ত যোদ্ধার মতো ঘরে ঢুকতে গিয়ে স্নেটিশেন দেখল লিট্ লিট্ ঠিক দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সব কথাবার্তাই শুনেছে সে। স্নেটিশেন বলে উঠল—'যাক, সবই তো শুনেছিস তাহলে। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তোর জন্য একটা কেমন চমৎকার ব্যবস্থা করেছি বল তো ? এবার খালি আমার কথা মতো কাজ করে যা। যখন চলে আসতে বলব তখন চলে আসবি, আবার যখন ফিরে যেতে বলব তখন ফিরে যাবি। দেখবি, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা এই বোকা-পাঁঠাটার টাকায় একেবারে লাল হয়ে যাব !'

পরের দিন জন ফক্‌স্-এর ব্যবসাপত্তর সব বন্ধ রইল। স্নেটিশেন-এর মহল্লায় সারাদিন ধরে চলল খাওয়াদাওয়া, পানভোজ। লিট্ লিট্ জনের দেওয়া একটা

চমৎকার ঝলমলে 'ক্যালিকো' পোশাক পরেছিল, মাথায় বেঁধেছিল সিল্কের একটা দামী রুমাল। এছাড়া তার গায়েও ছিল জনের দেওয়া নানা রকম সুন্দর গয়না। স্নেটিশেন এরই মধ্যে এক ফাঁকে লিট্ লিট্‌কে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—'শোন, কয়েকদিন যেতে দে! তারপর আমি একদিন রাত্রিবেলায় নদীর ধারে বসে দাঁড়কাকের ডাক ডাকব। ঐ ডাকটা শুনতে পেলেই তুই এই হাঁদাগঙ্গারামটার কাছ থেকে পালিয়ে আমার কাছে চলে আসবি, বুঝলি?'

বাবার কথা শুনে তো লিট্ লিট্-এর মুখ শুকিয়ে গেল। তাই দেখে স্নেটিশেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'আরে না না, চিন্তা করিস না। তুই চলে এলেই দেখবি যে তোর হোঁৎকা স্বামিটি তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে। তুই খালি তখন পাল্টা কান্নাকাটি শুরু করবি, ওর বিরুদ্ধে নানারকম নালিশ জানাবি। বলবি যে তুই ওখানে থাকতে পারছিস না। দেখবি, গাধাটা তখুনি তোর গরিব বাপের জন্যে আরো কত কম্বল, তামাক, আর অন্যান্য জিনিসপত্র এনে হাজির করবে। তুইও আবার কিছুদিনের জন্য ওর কাছে ফিরে যাবি। তাহলে এই কথাই রইল, কেমন? শিগগিরই আমি নদীর ধার থেকে রাত্তিরে কাকের ডাক ডাকব।'

লিট্ লিট্ অগত্যা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। বাবাকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। সে জানে, বাবার কথা অগ্রাহ্য করা মানেই বিপদ ডেকে আনা। তাছাড়া, স্বামীর সঙ্গে তো আর তার চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না—বরং তাকে ফিরে পেয়ে তার স্বামী নিশ্চয়ই আরো বেশি খুশি হয়ে উঠবে।

পরের দিন সকালে লিট্ লিট্ সলজ্জভাবে দুরু দুরু বুকে তার স্বামীর সঙ্গে গেল। স্বামীর দুর্গে গিয়ে কিন্তু সে দেখল বিবাহিত জীবনের এত সুখ যা তার ধারণার বাইরে ছিল। এত অঢেল সুস্বাদু খাবার, অফুরন্ত অবসর যে তা ভাগ্যে কোনোদিন জুটবে, বাবার কাছে হাড়ভাঙা খাটুনির সময় তা সে কখনো কল্পনাও করেনি। তাছাড়া, স্বামীর অধীনস্থ সব কর্মচারীরা তাকে খুবই সম্মান ও মর্যাদা দিত। জন তাদেরকে খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছিল, এখন থেকে লিট্ লিট্-এর কথামতোই সংসার চলবে। জনের আগের পক্ষের ছেলে দুটোও কয়েকদিনের মধ্যেই লিট্ লিট্-এর ন্যাওটা হয়ে পড়ল। আর এসব কিছুর ওপর বলিষ্ঠ, স্নেহময় স্বামীর আদর সোহাগ লিট্ লিট্‌কে এনে দিল এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনের স্বাদ।

লিট্ লিট্-এর ঘুম ছিল পাতলা। তাই দশ দিনের দিন রাতে কাক ডাকার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল তার। সে বুঝতে পারল স্নেটিশেন নদীর ধারে এসে

তাকে ডাকছে। কিন্তু পাশে ঘুমিয়ে থাকা শক্তিশালী স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোনোরকম চেষ্টাই করল না লিট্ লিট্। একটানা কাকের ডাক শুনতে শুনতে হাসতে লাগল সে, তারপর একসময় নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালেই সাক্ষাৎ দুর্গ্রহের মতো স্নেটিশেন এসে হাজির হল। সে অবশ্য ধারণাই করতে পারেনি যে লিট্ লিট্ ইচ্ছে করেই তার কাছে যায়নি। রান্নাঘরে লিট্ লিট্-এর সঙ্গে দেখা হতেই সে বলে উঠল—'কি রে, কাল ঘুম ভাঙেনি বুঝি? যাকগে, আজ কিন্তু তৈরি থাকিস—আমি আবার আসব।'

লিট্ লিট্ এবার সোজাসুজি বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—'না বাবা, আমার ঘুমও ভেঙেছিল, তোমার ডাকও শুনেছি। কিন্তু ইচ্ছে করেই যাইনি।' এরপর এতদিনের ভীরু লিট্ লিট্ নারীর অধিকার, কর্তব্য ও স্বাধীনতার ওপর একখানা সুদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে ফেলল। সুদূর উত্তরের মেরুবৃত্ত অঞ্চলে এটাই বোধহয় নারী-প্রগতির ওপর প্রথম ভাষণ। কিন্তু স্নেটিশেন এসব শোনার পাত্রই নয়। তার আদিম চিন্তাধারায় সে মনে করে, লিট্ লিট্ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এরপর তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল খোদ জন ফক্স-এর সঙ্গে। আর সঙ্গে সঙ্গেই জন ফক্স্-এর কাছে আরো কম্বল, বন্দুক ও অন্যান্য নানা জিনিস দাবি করে বসল স্নেটিশেন, নয়তো সে লিট্ লিট্‌কে ফেরৎ নিয়ে যাবে।

সে আরো জানাল, সে এখন খ্রীস্টান হয়েছে এবং এক পাদ্রী তাকে জানিয়েছেন যে এই বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। স্বর্গ থেকে স্নেটিশেনের পূর্বপুরুষরা এর জন্য হা-হুতাশ করছেন। জন অবশ্য ওর কোনো কথায় কানই দিল না। পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সে আর এক কুচি জিনিসও স্নেটিশেনকে দেবে না এবং স্নেটিশেন ইচ্ছে করলে এখুনি স্বর্গে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যেতে পারে। এই বলে সে স্নেটিশেনকে সোজা বাইরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিল। স্নেটিশেন অবশ্য এতেও টলে ছাড়ল না। সেদিন গভীর রাতে নদীর দিক থেকে আবার একটানা তীব্র, তীক্ষ্ণ কাকের ডাক ভেসে আসতে লাগল। একসময় জনেরও ঘুম ভেঙে গেল সেই ডাকে। 'নাঃ, কাকটা তো খুব জ্বালাচ্ছে'—এই বলে উঠে পড়ে একটা ছর্‌রা বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। নদীর ধারে গিয়ে অন্ধকারে ঠাহর করে দেখল, বেশ খানিকটা দূরে ঝোপের ধারে একটা কালোমতো কি বসে আছে, আওয়াজটা সেখান থেকেই হচ্ছে। সেদিকে টিপ করে বন্দুকটা দেগে দিল জন। আর সঙ্গে সঙ্গেই কাকের ডাক বন্ধ হয়ে গিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। জন

ছুটে গিয়ে দেখল, স্নেটিশেন চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দূর থেকে ছোঁড়া ছর্‌রার গুলিতে অবশ্য ওর চোট কিছুই লাগেনি, তবে সারা পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জ্বালা করছিল। জন যখন ওকে জিজ্ঞেস করল—'এখানে এখন কি করছিলে হে?' স্নেটিশেন তখন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—'আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলাম।' জনও সঙ্গে সঙ্গে হিমশীতল গলায় ওকে জানিয়ে দিল—'এরপর থেকে এইসব যোগাযোগগুলো আমার কানে না যায় এমন জায়গা থেকে করবে, বুঝেছ?'

এরপর থেকে আর কোনোদিন রাত্রিবেলায় নদীর ধার থেকে কাকের ডাক ভেসে আসেনি। স্নেটিশেন এরপর থেকে নিজের দাওয়ায় বসেই ছেলেমেয়েদের অকৃতজ্ঞতা নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত। লিট্‌ লিট্‌-ও তার সুখী সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে শান্তিতে দিন কাটাত।

THE LAW OF LIFE

জীবন প্রবাহ

বুড়ো কোশ্‌কুশ একমনে কান পেতে কি যেন শুনছিল। চোখের দৃষ্টি বহুদিন আগেই ঝাপ্‌সা হয়ে গেলেও ওর কানদুটি এখনো খুবই সজাগ ছিল। খুব হাল্‌কা শব্দও বুড়ো শুনতে পেত ঠিক, আর সেই শব্দের উৎস কি, তা বোঝার ক্ষমতাও ওর অতি বৃদ্ধ, দুর্বল মগজ থেকে হারিয়ে যায়নি। ও চট্‌ করে বুঝে নিল যে ওর নাতনি সিট্‌-কাম-টুহা কুকুরগুলোকে ধমকে, ভয় দেখিয়ে স্লেজ গাড়িতে জুড়ছে। ঠাকুরদা যে অসহায়ভাবে বরফের মধ্যে একলাটি বসে আছে, তার জন্য মেয়েটার কোনো মাথাব্যথা নেই। তাঁবু গুটিয়ে ফেলে এখুনি যাত্রা শুরু করতে হবে। সুদীর্ঘ পথ সামনে অপেক্ষা করে আছে—দিনও দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। চারিদিকে চলন্ত, কর্মব্যস্ত জীবনের স্রোতে বয়ে যাচ্ছে। সিট-কাম-টুহা-ও জীবনের সেই কর্মযজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত আছে, মরণের দরজায় বসে থাকা বুড়োর দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় তার নেই।

আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে বুড়ো হঠাৎ যেন এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি কাঁপা কাঁপা শীর্ণ হাতে নিজের চারপাশ হাতড়ে কি যেন দেখল। নাঃ, পাশে রাখা শুক্‌নো জ্বালানি কাঠের বোঝাটা ঠিকই আছে। বুড়ো হাতদুটোকে গরম জামার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে আবার কান পেতে চারপাশের চলমান জীবনের ভেসে আসা শব্দ তরঙ্গের মধ্যে ডুবে গেল। এই যে এবার তাদের গোষ্ঠী প্রধানের দলপতির চামড়ার তাঁবুটা গুটিয়ে ফেলে ভাঁজ করা হচ্ছে—ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া চামড়ায় চড়্‌বড় করে একটা আওয়াজ উঠ্‌ছে। এই দলপতি আর কেউ নয়, তার নিজের ছেলে। হট্টাকট্টা জোয়ান আর দারুণ পাকা শিকারি সে। ঢিমেতালে কাজ করার জন্য সে দলের মেয়েগুলোকে খুব ধমকাচ্ছে। বুড়ো একমনে শেষ বারের মতো তার ছেলের গলার আওয়াজ শুনতে লাগল। গীহাউ, টুসকেন, শামান এদের তাঁবুগুলোও এবার একটার পর একটা খুলে ফেলা হল। বুড়ো গুনে দেখল, আর কোনো তাঁবুই খুলতে বাকি নেই। কোথায় যেন একটা বাচ্চা ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল—বুড়োর মনে পড়ে গেল, এটা 'কু-টি'র গলা। বাচ্চাটা দুর্বল আর চিররুগ্ন

বোধহয় বাঁচবে না বেশিদিন। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না বরং একটা খাওয়ার পেট কমবে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তো চরম পরিণতি—দুদিন আগ আর পরে। মৃত্যুর খিদে কখনো মেটে না।

বুড়োর কানে এবার অন্য ধরনের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। স্লেজগুলোর মালপত্র শক্ত করে বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। স্লেজটানা কুকুরগুলো চাবুকের বাড়ি খেয়ে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে আর গজরাচ্ছে—ওদের এখন এই আদি অন্তহীন তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে দৌড়তে মোটেই ইচ্ছে করছে না। এইবার—এইবার স্লেজগুলো চলতে আরম্ভ করেছে। একটার পর একটা স্লেজগাড়ি বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে চলে যাচ্ছে—আর কিছু শোনা যাবে না। বুড়োর জীবন থেকে তারা সরে গেল —এখন বুড়ো একা, একেবারে একা। শেষ মুহূর্তের সময় এসে গেছে। নাঃ, বরফের ওপর কার যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল—কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাল্‌কা ভাবে হাত রাখল। ছেলে এসেছে বাবার সঙ্গে শেষ দেখা করতে। বুড়োর মন ছেলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ আর ভালবাসায় ভরে গেল—তার মনে পড়ে গেল, বহু ছেলেরাই শেষ সময় তার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করে না। ভাবতে ভাবতে বুড়ো কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ছেলের গলার আওয়াজে তার হুঁশ ফিরে এল। ছেলে জিজ্ঞেস করল—'সব ঠিক আছে তো বাবা ?' বুড়ো কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল—'হ্যাঁ বাবা, সব ঠিক আছে।' ছেলে বলে চলল—'তোমার পাশে অনেকটা জ্বালানি কাঠ রাখা আছে, আগুনেরও বেশ তেজ আছে। বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দলবল আর দেরি করতে চাইছে না—সঙ্গে আছে খুব ভারী মালপত্তরের বোঝা, যেতে হবে অনেক দূর। না খেতে পেয়ে সবারই পেট একেবারে শুকিয়ে গেছে। তাই তারা যত তাড়াতাড়ি পারে এগিয়ে যেতে চাইছে। তাহলে আমি যাই এবার ?'

'হ্যাঁ বাবা, যাও। আমি তো এখন একটা শুক্‌নো পাতা ছাড়া আর কিছু নই। একটু বাতাস লাগলেই বোঁটা থেকে ঝরে পড়ব। ঠিক মতো কথাও বলতে পারি না, চোখে কিছু দেখতেও পাই না। আমি ক্লান্ত, দুর্বল—হাঁটার ক্ষমতাও চলে গেছে। তাই যা হওয়া উচিত, তাই হয়েছে।'—এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে বুড়ো আবার মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইল। আস্তে আস্তে তার ছেলের পায়ের শব্দ বরফের ওপর দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। ডাকলেও আর তার সাড়া পাওয়া যাবে না। বুড়ো তাড়াতাড়ি আর একবার পাশে রাখা কাঠের বোঝাটা ঠাহর করে

দেখল। কয়েক টুক্‌রো জ্বালানি কাঠই এখন জীবনের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র। একটার পর একটা কাঠের টুক্‌রো আগুনে পুড়ে শেষ হবে, মৃত্যুও এক পা এক পা করে এগিয়ে আসবে। শেষ টুক্‌রোটি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর তুষার আর ঠাণ্ডা তাকে ঘিরে ধরবে। প্রথমে তার পা দুটো অসাড় হয়ে যাবে, তার পর সারা শরীরে আস্তে আস্তে তা ছড়িয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত তার মাথা হাঁটুতে গিয়ে ঠেকবে, সে চিরবিশ্রামের কোলে ঢলে পড়বে। এতো খুব সহজ, স্বাভাবিক ব্যাপার। সব মানুষকেই তো মরতে হবে একদিন না একদিন, যে ভাবেই হোক্‌।

বুড়োর মনে সত্যিই কারুর বিরুদ্ধে কোনো নালিশ বা ক্ষোভ ছিল না। সে জানে, এটাই জীবনের নিয়ম, আর এটাই ঠিক নিয়ম। সারা জীবন সে মাটির খুব কাছাকাছি মুক্ত, অবাধ প্রকৃতির কোলে কাটিয়েছে। কাজেই এই নিয়মটাই তার কাছে স্বাভাবিক। প্রকৃতি কোনো সময়েই রক্ত মাংসের জীবের ওপর দয়া দেখান না। কোনো বিশেষ একজন মানুষ বা জীবকে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। সমষ্টি বা জীবজগতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাতেই তাঁর যত আগ্রহ। কোশ্‌কুশের আদিম মনের চিন্তা এর থেকে আর বেশি দূরে যায় নি, আর এই বিশ্বাসকেই সে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সারাজীবন। নতুন গজিয়ে ওঠা গাছের চারা, সদ্য ফোটা ফুলের কুঁড়ি, কাঁচা ফল, ঝরাপাতা, মরা ফুল,—প্রকৃতির এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়েই সে তার বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পেয়েছে। কোশ্‌কুশের গোষ্ঠী বহুদিন ধরেই এই পৃথিবীর বুকে বাস করে চলেছে। তারা কবে কে কোথায় ছিল, কোথায় কে মাটির নিচে শুয়ে আছে, তা কেউ জানেও না, জানবার দরকারও নেই। বংশরক্ষার প্রাকৃতিক ধারাবাহিকতায় তারা একটা ঘটনা মাত্র। আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘের মতো তারা কোথায় চলে গেছে, কোশ্‌কুশ-ও শিগ্‌গিরই সে ভাবে চলে যাবে। তাতে প্রকৃতির কিছুই যায় আসে না। জীবজগৎ এবং উদ্ভীদ্‌ জগতের জন্যও সে একটাই নিয়ম, একটাই আইন ঠিক করে দিয়েছে,—তার নিয়ম হল, সৃষ্টির স্রোত, উৎপাদনের ধারাবাহিকতা অন্তহীন ভাবে বজায় রাখতে হবে, আর তার আইন হল সবাইকেই মরতে হবে। মানুষই হোক্‌ বা জীবজন্তু, গাছপালাই হোক্‌,—সবার জন্য তার একই আইন। তুষারপাত শুরু হলেই মশাগুলো সব মরে যায়। নতুন পাতায় গাছ ভরে যায়, পুরনো পাতা খসে পড়ে যায়। বার্ধক্য মানেই নিঃসঙ্গতা। বার্ধক্য মানেই মৃত্যু। খরগোস বুড়ো হয়ে গেলেই শিকারির হাতে মারা পড়ে। ছোট মেয়ে আস্তে আস্তে রূপসী তরুণী হয়ে ওঠে। তার চোখের কটাক্ষ, ভরন্ত বুক, চলাফেরার চটক যুবকদের মনে তোলে কামনার ঝড়। শেষে তাদেরই কেউ একজন

তরুণীকে নিয়ে ঘর বাঁধে। যুবতী গৃহিনী হয়। তারপর যখন সে অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মা, দিদিমা, ঠাকুমা হয়, তখন ছোট ছোট নাতি নাতনি ছাড়া আর কারো কাছেই তার কোনো আকর্ষণ থাকে না—জীবনের প্রতি তার কর্তব্য ততদিনে শেষ হয়ে গেছে। তারপর একদিন যখন খাবারের ভাঁড়ারে টান পড়বে, বুড়ির গোষ্ঠীর লোকজনেরা তাঁবু গুটিয়ে ফেলে বহুদূরের পথে পাড়ি দেবে, তখনই তারা বুড়িকে বরফের মধ্যে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে, তার কাছে রেখে যাবে খালি এক বোঝা জ্বালানী কাঠ। সেই কাঠ জ্বালিয়ে নিঃসঙ্গ বুড়ি ঠিক বুড়ো কোশ্‌কুশের মতোই শেষের প্রহর গুণবে। এটাই জীবনের নিয়ম, প্রকৃতির আইন।

জ্বালানী কাঠের বোঝা থেকে দু'টুকরো বড় কাঠ তুলে নিয়ে আগুনের কুণ্ডের মধ্যে গুঁজে দিল বুড়ো। আস্তে আস্তে বহু পেছনে ফেলে আসা অতীতের স্মৃতির মধ্যে ডুবে যেতে লাগল সে। ওর মনে পড়ে গেল, সে-ও তার বাবাকে ঠিক এমনি করেই এক শীতকালে 'ক্লনডাইকের' প্রান্তরে বরফের মধ্যে রেখে দিয়ে চলে গেছিল। আর একবার ওরা দারুণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছিল,—সেবার ওর মা মারা যায়। ওদের গোষ্ঠীর প্রায় সবাই সেবার মরতে বসেছিল। ওর মনে আরো ভিড় করে আসতে লাগল কৈশোর আর যৌবনের যত ঘটনা। বর্তমানে প্রতিদিন যা ঘটে যাচ্ছে, তা আর বুড়ো কোশ্‌কুশের কিছুই মনে থাকত না, কিন্তু সেই সুদূর অতীতের কথা এখন অতি পরিষ্কার ভাবে তার মনে খেলা করে যেতে লাগল। কিশোর বয়সে সে আর তার বন্ধু জিংহো একবার লুকিয়ে লুকিয়ে একটা নেকড়ের পালকে বহুদূর অনুসরণ করে গিয়েছিল। একটা বিশালদেহী চমরী গাইয়ের সঙ্গে সেই নেকড়ের পালের লড়াই চলেছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। চমরী গাইটা আপ্রাণ লড়েছিল। বার বার পড়ে গিয়েও সে হাল ছাড়েনি। অনেকগুলো নেক্‌ড়েও তার হাতে মরেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত একলা, নিঃসঙ্গ বুড়ো চমরী দলপতিকে নেকড়েগুলোর হাতে মরতেই হয়েছিল। কোশ্‌কুশের আরো মনে পড়ে গেল, ছেলের মতো সে-ও একসময় তার গোষ্ঠীর দলপতি ছিল। বহু যুদ্ধের সে ছিল বীর নায়ক—তাদের পরম শত্রু 'পেলি' গোষ্ঠীর কাছে তার নাম এক সময় বিভীষিকা ছিল। হাতাহাতি লড়াইয়ে একটা সাদা চামড়ার লোককেও সে মেরে ফেলেছিল একবার। তার বুদ্ধি, পরামর্শ নেওয়ার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত সেই সময়।

অতীত দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একসময় কোশ্‌কুশ টের পেল যে আগুনটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে,—কন্‌কনে ঠাণ্ডা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। তাড়াতাড়ি আবার দু'খানা কাঠের টুক্‌রো আগুনের মধ্যে ফেলে দিল

সে। তারপর কতটা কাঠ আর বাকি আছে, তা একবার পরখ করে দেখল। যতটুকু কাঠ আছে, ততটুকুই তার জীবনের মেয়াদ।'

সিট্-কাম-টুহা যদি বুড়ো ঠাকুরদার কথা খেয়াল রেখে বেশি করে জ্বালানি কাঠ রেখে যেত, তাহলে সে আরো কিছুক্ষণ বেশি বেঁচে থাকতে পারত, শেষ সময়টুকুও অনেক বেশি সহনীয় হয়ে উঠ্‌ত। কিন্তু জিং-হার নাতিটার সঙ্গে ভাব ভালবাসা হওয়ার পর থেকেই মেয়েটা একেবারে পাল্টে গেছে। যাক্‌গে, বুড়ো ভাবল,—সে নিজেও কি তার অস্থির যৌবনের সময় এরকম অবুঝের মতো কাজ করেনি? এই সব ভাবতে ভাবতে বুড়ো আবার কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল। তার মনে হঠাৎ একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠল—হয়ত তার কথা ভেবে ছেলের মনে কষ্ট হবে। কুকুরগুলোকে নিয়ে সে হয়ত তার বাবাকে দলের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসবে। তাদের সঙ্গে বুড়ো এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে আছে অফুরন্ত আগুন। অজস্র খাবার দাবার। চারিদিকে নধর 'বলগা' হরিণের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে কান পেতে রইল বুড়ো। নাঃ, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। খালি তার নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজ। কিন্তু,- ঐ যে কিসের একটা আওয়াজ বাতাসে ভেসে এল না? এক নিমেষে বুড়ো অতীত থেকে বর্তমানের বাস্তব জীবনে ফিরে এল। তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। এই আওয়াজ, নেক্‌ড়েদের এই চীৎকার বুড়ো খুব চেনে। হঠাৎ তার গালে ঠাণ্ডা মতো কি যেন একটা ছুঁয়ে গেল। বুড়ো আগুনের কুণ্ড থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল। যে নেক্‌ড়েটা এগিয়ে এসেছিল, সে একটু দূরে সরে গিয়ে একটানা চীৎকার শুরু করে দিল। তার সাথীরা উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে এল। বুড়োর চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসল তারা, আর হামাগুড়ি দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল। বুড়ো জ্বলন্ত কাঠখানাকে পাগলের মতো চারিদিকে ঘোরাতে লাগল। নেকড়েগুলো কিন্তু বসেই রইল, একটুও পেছনে সরে গেল না। হঠাৎ বুড়োর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ো চমরী দলপতির শেষ লড়াই-এর কথা—রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে সে-ও এই ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করে গেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। বুড়ো কোশ্‌কুশ যেন সেই দলপতির মধ্যে নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। এবার তার মনে নেমে এল একটা অদ্ভুত প্রশান্তির ভাব,—সে-ই বা কেন জোর করে জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করছে? জ্বলন্ত কাঠখানাকে বরফের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, আর সেটা আস্তে আস্তে নিভে গেল। নেক্‌ড়েগুলো চাপা গর্জন করে উঠল। বুড়ো এবার ক্লান্তভাবে দুই হাঁটুর মধ্যে তার মাথাটা গুঁজে দিল। জীবনের যা স্বাভাবিক আর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তারই জন্য সে এখন শান্তভাবে অপেক্ষা করে রইল।

THE WHITE FANG

শেষ দন্তের কাহিনী

প্রথম পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেই মাদী নেকড়েটা

বেলা পড়ে এসেছে। বরফ ঢাকা ধূ ধূ প্রান্তরে কোথাও কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই। জমে যাওয়া নদীটাও স্তব্ধ, গতিহীন। চারিদিকে যেন একটা জমাট বাঁধা নীরব বিষণ্ণতা। এই প্রাণহীন, নির্জন বন্য প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে জমাট বরফের বুক চিরে দুটি লোক একটা স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। স্লেজগাড়িতে একটা বড় সড় কফিন। তারা চলেছে 'ফোর্ট ম্যাকগাড়ি'র দিকে। দিনের পর দিন তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে একপাল ক্ষুধার্ত কংকালসার নেকড়ে,—মাঝে মাঝেই তাদের তীব্র চিৎকার নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুক যেন চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে। এর মধ্যেই স্লেজগাড়ির ছটা কুকুরের মধ্যে তিনটে তাদের পেটে চলে গেছে। কুকুরগুলো রাতের বেলায় আগুনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কেন যে নেক্‌ড়েগুলোর খপ্পরে গিয়ে পড়েছে, সেটা দুই অভিযাত্রী, হেনরি আর বিল, প্রথমে বুঝতেই পারেনি। তারপর একদিন রাত্রে ওরা লক্ষ্য করে দেখল, একটা প্রকাণ্ড মাদী নেক্‌ড়ে ওদের আগুনের কুণ্ডের একেবারে কাছে এসে ঘোরাঘুরি করছে আর কুকুরগুলো তার কাছে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে। এখন ওরা রাতের বেলা কুকুরগুলোকে শক্ত করে বেঁধে রাখছিল। মাদী নেক্‌ড়েটার হাবভাব, চালচলন দেখে ওরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। জানোয়ারটা নির্ভয়ে ওদের রাতের শোবার জায়গার একেবারে কাছে এসে আগুনের ধার ঘেঁসেই শুয়ে থাকত,—ঠিক যেন কোনো স্লেজটানা পোষা কুকুর। এমন কি ওরা যখন কুকুরগুলোকে রাত্রিবেলা খেতে দিত, তখন সেটাও মাঝে মাঝে কুকুরগুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের খাবার চুরি করে খেয়ে নিত। ওর দিকে বন্দুক তাগ্‌ করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আড়ালে লুকিয়ে পড়ত। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে বিল একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছিল যে নেক্‌ড়েটা আসলে কোনো সময়ে কুকুরই ছিল, আর মানুষের সাহচর্য পাওয়া তার ভালভাবেই অভ্যেস আছে।

এদিন রাতটা কোনোরকমে কেটে গেল ওদের। আগুনের বৃত্তের বাইরে ক্ষুধার্ত নেক্‌ড়ের পাল, ভেতরে ওরা,—দুটি মানুষ আর তিনটে কুকুর। পরের দিন সকালে

আবার যাত্রা শুরু হল ওদের। ঠিক দুপুর বেলায় ওরা স্লেজের দড়ি খুলে কুকুর-গুলোকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ বিল-এর চোখে পড়ল যে ওদের কানকাটা কুকুরটা আস্তে আস্তে পালিয়ে যাচ্ছে,—দূরে অপেক্ষমাণ মাদী নেক্‌ড়েটার কাছে যাওয়াই তার ইচ্ছে। হেন্‌রি আর বিল ওকে অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু প্রভুদের ডাক এখন আর ওর কানে গেল না। হঠাৎ বিল-এর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। এক ঝট্‌কায় রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে পাশের ঝোপঝাড়-গুলোর মধ্যে ঢুকে গেল সে,—তার মতলব, ঝোপের আড়ালে গিয়ে ঠিক মাদী নেক্‌ড়েটার মুখোমুখি হয়ে সেটাকে গুলি করে মারবে। শিগ্‌গিরই হেনরি দেখতে পেল, একপাল নেক্‌ড়ে কানকাটাটাকে ঘিরে ফেলবার জন্য তাড়া করে আসছে। নিমেষের মধ্যে তারা হেন্‌রির চোখের আড়ালে চলে গেল। একটু পরেই বিলের বন্দুক পরপর তিনবার গর্জে উঠ্‌ল,—রাইফেলে তিনটে টোটাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নেক্‌ড়ের চীৎকার, কানকাটাটার আর্তনাদ,—সব মিলিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য তুষার প্রান্তরের বুকে যেন একটা পৈশাচিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। তারপরেই চারিদিকে আবার নেমে এল আগেকার নীরবতা।

অনেকক্ষণ চুপ করে স্লেজটার ওপর বসে রইল হেন্‌রি। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল কি ঘটেছে। তারপর ক্লান্ত, বিধ্বস্তভাবে উঠে দাঁড়ল সে। কফিনটাতে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে একটা গাছের মগডালে ঝুলিয়ে দিল, আর বাকি দুটো কুকুরকে স্লেজে জুড়ে বেরিয়ে পড়ল আবার। এরপরে নিঃসঙ্গ হেন্‌রির সঙ্গে ক্ষুধার্ত নেক্‌ড়ের পালের শুরু হল এক অদ্ভুত লড়াই। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই খুব বড় করে আগুন জ্বালিয়ে বসে থাকত সে, আর কুকুরদুটো ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে একেবারে ওর গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকত। সারারাত জেগে থেকে সকাল হলেই আবার যাত্রা শুরু হত তার। এক মুহূর্তের জন্যও হেন্‌রি দুচোখের পাতা এক করতে পারত না, ঘুম মানেই ভয়াবহ মৃত্যু।

বেশ কয়েকদিন এভাবে কেটে গেল। হেন্‌রি এতদিনে একেবারে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। আর একপা-ও হাঁটবার শক্তি ছিল না তার। যে করেই হোক, তাকে ঘুমতেই হবে। শেষবারের মতো একটা বড় করে আগুন জ্বালল সে, তারপর কুকুরগুলোকে পেটের কাছে টেনে নিয়ে চরম মুহূর্তটির জন্য তৈরি হল। আস্তে আস্তে গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে সে টের পেল, আগুন নিভে আসছে—নেক্‌ড়েগুলো আগুনের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে আর ধীরে, অতি ধীরে তার কাছে এগিয়ে আসছে। মাদী নেক্‌ড়েটার হিংস্র, সতর্ক মুখটা একেবারে সামনেই দেখতে

পেল সে। আর তার পরেই গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেল। কিন্তু একটু পরেই হঠাৎ হেন্‌রি আবার চমকে জেগে উঠে অবাক হয়ে দেখল, কোন ভোজবাজিতে যেন নেক্‌ড়ের পাল অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর চারিদিকে স্লেজগাড়ী, মানুষের ভীড়। দুটো গাঁট্টাগোট্টা লোক ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করছে—'কি ব্যাপার? স্যার অ্যালফ্রেড কোথায়?' হেন্‌রি জড়ান গলায় অসংলগ্ন ভাবে উত্তর দিল—'পেছনে কফিনে, গাছের ওপরে···নেক্‌ড়েরা·····ওকে আর আমাকেই খেতে পারেনি·····যাক্‌গে। আর কথা বলতে পারছি না——আমি এখন ঘুমব।'—কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হেন্‌রির মাথা ঝুলে পড়ল, নাক ডকেতে শুরু করে দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নেক্‌ড়ের সংসার

একেবারে শেষ সময়ে মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে নেক্‌ড়ের পালটাকে সরে আসতে হল। সীমাহীন তুষার প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল তারা। সেই মাদী নেক্‌ড়েটা আর একটা এক চোখ কানা বুড়ো নেক্‌ড়েই দলটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্চিল। বহুদিন ধরে প্রায় কিছুই না খেতে পেয়ে ওদের চেহারাগুলো ঠিক জীবন্ত কংকালের মতো হাড় সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল, মেজাজও হয়ে উঠেছিল খিট্‌খিটে। তাই প্রায়ই ওদের নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি, ঝগড়াঝাঁটি লেগে যাচ্ছিল। তবে অসহায়ের তীব্র জ্বালা, আর খাবার খুঁজে বার করবার অভিন্ন তাগিদ ওদেরকে এক করে রেখেছিল। প্রায় দুদিন ধরে সমানে দৌড়ানর পর অবশেষে ওদের ভাগ্যে শিকার জুট্‌ল। একটা নিচু সমতল জায়গায় পৌঁছে প্রকাণ্ড একটা চমরী গাইয়ের দেখা পেল ওরা। জন্তুটা অবশ্য প্রাণপণে লড়াই করে গেল। শিং আর ক্ষুর দিয়ে বেশ কয়েকটা নেক্‌ড়েকে ঘায়েলও করল। কিন্তু এতগুলো উপোষী, ক্ষুধার্ত নেক্‌ড়ের হাত থেকে বাঁচবার কোনো রকম উপায়ই ওর ছিল না। গোটা চল্লিশেক নেক্‌ড়ে একসঙ্গে হতভাগ্য জীবটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় জীবন্ত অবস্থাতেই তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্‌চকে সাদা আর বড় বড় কয়েকটা হাড় ছাড়া অতবড় জীবটার আর কোনো চিহ্নই রইল না।

এতদিন পরে শেষ পর্যন্ত নেক্‌ড়েগুলোর অনাহারের পালা শেষ হল। যে জায়গাটায় ওরা এখন এসে পৌঁছল, সেখানে অজস্র শিকার। পেটের ক্ষিধে মেট্‌বার সঙ্গে সঙ্গে

কিন্তু ওদের মনে এবার জেগে উঠ্‌ল আর এক স্বতঃস্ফূর্ত আদিম অনুভূতি—তীব্র যৌনলিপ্সা। দুদিন আগেও যারা বাঁচবার তাগিদে একসঙ্গে লড়াই করেছে, তারাই এখন পরস্পরের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। বিরাট নেক্‌ড়ের পালটা এবার যে যার সঙ্গিনী বেছে নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—প্রেমের লড়াই-য়ে পরাজিত নায়করা হয় প্রাণ দিল, নয়তো নিঃসঙ্গ অবস্থায় পালিয়ে গেল। মাদী নেক্‌ড়েটার জন্য একচোখ কানা বুড়ো নেক্‌ড়েটা আর দুই যুবক প্রতিদ্বন্দ্বী মরণপণ লড়াইয়ে মেতে উঠ্‌ল। যতক্ষণ তাদের এই লড়াই চলল, ততক্ষণ মাদী নেক্‌ড়েটা নিরাসক্ত ভাবে অদূরে বসে বেশ খুশি মনেই লড়াইটা উপভোগ করল। শেষ পর্যন্ত জয়ী হল বুড়ো কানা নেক্‌ড়েটাই। এরপর বিজয়ী বীর তার প্রেমিকাকে নিয়ে খেলা করতে করতে ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে। কিছুদিন পরে মাদী নেক্‌ড়েটার হাবভাবে দেখা দিল কিরকম একটা অস্থিরতা,—গাছের গুঁড়ির ফোকর, ছোট ছোট পাহাড়ী গুহা,—এ সবের প্রতি তার আগ্রহ খুব বেশি বেড়ে গেল হঠাৎ। এই সময় এক জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ ওদের দুজনেরই নাকে একটা চেনা গন্ধ ভেসে এল—সঙ্গে সঙ্গে একটা চেনা শব্দও। মানুষের গন্ধ, মানুষের শব্দ। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটু এগিয়েই রেড ইণ্ডিয়ানদের একটা বড় বসতি চোখে পড়ল ওদের। মাদী নেক্‌ড়েটা চুপ করে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। ওর হাবভাবে যেন কিরকম একটা আকুলতা ফুটে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, ও যেন এখুনি বসতির মধ্যে ঢুকে গিয়ে আগুনের কুণ্ডের পাশটিতে শুয়ে পড়তে চাইছে। ওর সঙ্গীর অবশ্য ওর এই ভাবান্তরটা মোটেই ভাল লাগছিল না। সে সঙ্গিনীকে নিয়ে বারবার গভীর জঙ্গলের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে আসতে চাইছিল। কিন্তু প্রায় দিন দুয়েক মাদী নেক্‌ড়েটা রেড ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর আশে পাশে ঘোরাঘুরি করল। তবে, তৃতীয় দিনের দিন রেড ইণ্ডিয়ানদের বন্দুক থেকে খুব অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়ার পর দুজনেই জায়গাটা ছেড়ে পালিয়ে গেল। মাদী নেক্‌ড়েটা এখন আর একটানা বেশিক্ষণ চলতে বা দৌড়তে পারছিল না ওর শরীর ক্রমশই ভারী হয়ে যাচ্ছিল। আরো দিন দুয়েক চলবার পর শেষ পর্যন্ত মাদী নেক্‌ড়েটা একটা পছন্দসই জায়গা খুঁজে পেল,—জমে যাওয়া একটা ছোট্ট নদীর উঁচু পাড়ের মধ্যে বেশ বড়সড় একটা গুহা। বেশ ভালভাবে খুঁটিয়ে গুহাটার চারপাশ দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকে মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে জিভ বার করে হাঁফাতে লাগল সে। ওর একচোখো সঙ্গী গুহার মুখের কাছেই বসে রইল। ইদানীং ওর সঙ্গিনীর মেজাজটা খুবই খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছিল,—একচোখো ওর বেশি কাছাকাছি ঘেঁষতে গেলেই ধমক

আর কামড় খাচ্ছিল। তাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিল একচোখো। ঘুম থেকে উঠে সে আবার বেরিয়ে পড়তে চাইল। সঙ্গিনীকে অনেক ডাকাডাকি করল, এমন কি সাহস করে দু চারবার ঠেলাও মারল। কিন্তু মাদী নেক্‌ড়েটা এমন ভয়ানক ভাবে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওকে শাসিয়ে উঠ্‌ল যে, অগত্যা একচোখোটা একলাই একটু ঘুরতে বেরিয়ে গেল। এতদিনে শীতকাল প্রায় শেষ হয়ে বসন্তকাল আসি আসি করছে—চারিদিকে প্রাণের স্পন্দন, বরফ গলার আওয়াজ। কয়েক ঘণ্টা বাদে গুহার মুখে ফিরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল একচোখো,—গুহার ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে। একটু ভালভাবে লক্ষ্য করে সে দেখতে পেল, তার সঙ্গিনীর শরীরের সঙ্গে অতি ছোট ছোট পাঁচটা জীবন্ত পুঁট্‌লি লেগে আছে, নড়াচড়া করছে,—আওয়াজটা আসছে সেখান থেকেই। তাকে দেখেই মাদী নেক্‌ড়ে একটা তীব্র, চাপা গর্জন করে সঙ্গীকে সাবধান করে দিল,—নিজের সহজাত অনুভূতিতে সে জানে, পুরুষ নেক্‌ড়েরা সুবিধে পেলেই নিজের বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, একচোখোটার মনে সে রকম কোনো ইচ্ছে বা চিন্তাও আসেনি। বরং এই নতুন আগন্তুকদেরকে ও বেশ সহজ ভাবেই মেনে নিল। আবার গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন ধরে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত একটা মরা শজারু মুখে করে নিয়ে ফিরল সে। শজারুটাকে অবশ্য সে নিজে মারেনি,—একটা বনবিড়ালের ফেলে যাওয়া মুখের গ্রাস বরাতজোরে জুটে গেছিল তার। একচোখো অবশ্য একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একটা 'টারমিগান' পাখি মেরেছিল, সেটা খেয়েই পেট ভরিয়েছিল। মাদী নেক্‌ড়েটা এবার খুব খুশি হয়ে ওর গাল চেটে দিল। এতক্ষণে সে-ও বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে, তার সঙ্গীর নিজের বাচ্চা খেয়ে ফেলবার কোনোরকম ইচ্ছে নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ধূসর বাচ্চাটা

প্রথম থেকেই বাচ্চাটা ওর ভাইবোনদের থেকে একটু অন্যরকমের ছিল। অন্যান্য বাচ্চাগুলোর গায়ে ওদের মায়ের মতো একটু লালচে ছোপ ছিল, কিন্তু এই বাচ্চাটা ছিল একেবারে ওর নেক্‌ড়ে বাবার মতো ধূসর রং-এর,—চেহারাটাও ছিল একেবারে খাঁটি নেক্‌ড়ের মতো। স্বভাবেও বাচ্চাটা ছিল সবচাইতে ছট্‌ফটে আর দুরন্ত।

চোখ ফোটার আগেই ও অন্যান্য ভাই বোন গুলোকে শুঁকে, চেটে, ছুঁয়ে ভালভাবে চিনে গেছিল। সব চাইতে বেশি অবশ্য চিনেছিল মাকে,—মা মানেই আরাম, নিরাপদ আশ্রয়, অফুরন্ত গরম দুধ, আর আদর। মা জিভ দিয়ে ওর সারা গা চেটে দিত। আর সে-ও মায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে থেকে ঘুমিয়ে পড়ত। ওর ছোট্ট শরীরে রাগও ছিল যথেষ্ট—আর রেগে গেলেই গলার মধ্যে অস্ফুট গজ্‌রাতেও শিখে গেছিল সে নিজে থেকেই।

জন্মের পর প্রথম মাসটা বাচ্চাটা প্রায় সব সময়েই ঘুমিয়ে থাকত। কিন্তু একটু বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সে যতক্ষণ পারা যায় জেগে থেকে ওর চারপাশের দুনিয়াটাকে চিনে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। যে গুহাটায় ওরা থাকত, সেটা আলো আঁধারিতে ভরা। তিনদিকেই কঠিন, অন্ধকার দেওয়াল,—খালি গুহার মুখটার কাছে উজ্জ্বল আলো। আলো কি জিনিস, তা অবশ্য বাচ্চাটা বুঝত না,—সে মনে করত, ঐ আলোটাও বুঝি আর একটা শক্ত দেওয়াল। কিন্তু অন্ধকার ঘরে রাখা লতা যেমন কি এক অজানা রহস্যে আলোর দিকে মুখ ফেরায়, ঠিক সেই রকম ভাবেই বাচ্চাটাও অনবরত ঐ আলোর উৎসমুখের দিকে এগিয়ে যেতে চাইত, আর ওর মা নাক দিয়ে গুঁতো মেরে, ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলে ওকে সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে আসত। এই গোঁয়ার, জেদী বাচ্চাটাকে সামলাতে গিয়ে ওর মা একেবারে হিমসিম খেয়ে যেত,—অন্যান্য ভাইবোনগুলিও কামড়াকাম্‌ড়ি বা লড়াইয়ে কোনো সময়েই ওর সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারত না।

ওদের বয়স যখন মাত্র কয়েক মাস তখন ওদের জঙ্গলে খাবারের দারুণ অভাব দেখা দিল। ওদের বাবা মা সারাদিন হন্যে হয়ে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু ভাগ্যে প্রায় কিছুই জুট্‌ত না। খেতে না পাওয়ার জন্য মাদী নেক্‌ড়েটার বুকের দুধও শুকিয়ে গেছিল। প্রথম প্রথম বাচ্চাগুলো খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌, কান্নাকাটি করত, তারপর সবাই যেন কিরকম একটা আচ্ছন্নতার ঘোরের মধ্যে তলিয়ে গেল। ধূসর বাচ্চাটা যখন এই ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠ্‌ল, তখন সে দেখল যে ওর আর সব কটা ভাইবোন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে গেছে। ওর বাবা একচোখোকেও আর দেখতে পেলনা বাচ্চাটা,—খিদের জ্বালায় বেপরোয়া হয়ে কাছাকাছি একটা বনবিড়ালের গর্তে হানা দিয়েছিল বুড়ো নেকড়েটা, প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি। ওর মা সঙ্গীকে খুঁজতে বেরিয়ে সবই বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তখন আর বনবেড়ালটার সঙ্গে লড়াই করার মতো সাহস তার ছিল না। বনবেড়ালটারও তখন সবে বাচ্চা হয়েছে, আর সদ্য বাচ্চা হওয়া বনবেড়ালের

চাইতে বেশি হিংস্র প্রাণী জঙ্গলের দুনিয়াতেও বেশি নেই।

মাদী নেকড়েটা এখন নিঃসঙ্গ ভাবেই শিকার ধরবার জন্য বাইরে ঘুরে বেড়াত। ধূসর বাচ্চাটাও গুহাটার মধ্যে একলাটি ঘুমিয়ে থাকত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ততই ওর সাহস বেড়ে যেতে থাকল। একদিন মা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও টলোমলো পায়ে গুহার মুখের দিকে এগোল। অবাক্ হয়ে সে দেখত যে, সে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল আলোর দেওয়ালটা যেন পেছনে হটে যাচ্ছে। অবশেষে গুহার মুখে এসে পেঁছিল সে আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝক্‌ঝকে্ তীব্র আলোয় অনভ্যস্ত চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। এরপর বাচ্চাটা গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল—তার ছোট্ট মনে একদিকে অচেনার আতঙ্ক, আর অন্যদিকে নতুনকে জানার অদম্য আগ্রহ। প্রথমটায় অজানা এক আতঙ্কে বাচ্চাটা দিশাহারা হয়ে গেল,—ওর ঘাড়ের সব রোঁয়া শক্ত হয়ে উঠ্‌ল, মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল একটা চাপা গর্জন। কিন্তু আস্তে আস্তে আতঙ্ক কেটে গিয়ে সেখানে ওর মনে জেগে উঠল তীব্র কৌতূহল। অবাক চোখে চারদিকের নতুন পৃথিবীটা দেখতে লাগল। উঁচু নিচু অসমতল জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে প্রথম প্রথম ও খালি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ওর পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। গুহা থেকে বেরিয়েই ঢালু জমি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল বাচ্চাটা—ওর কচি নাকটায় লাগলও বেশ। উঠে বসে নিজের মনে বেশ খানিকটা কান্নাকাটি করে আবার এগোতে লাগল সে, আর কয়েক পা এগিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল কতগুলো সদ্য জন্মানো 'টারমিগান' পাখির ছানার ওপর,—একটা ঘন ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া করছিল। প্রথমে ছানাগুলোর কিঁচকিঁচানিতে ও বেশ ঘাবড়েই গেছিল। তারপর একটা ছানাকে থাবা দিয়ে উল্টে শুঁকে সে দেখল, গন্ধটা বেশ ভালই লাগছে। কিছু না ভেবেই ছানাটাকে মুখে তুলে নিয়ে কামড় বসাল সে, নরম মাংস আর টাট্‌কা রক্তের স্বাদে মুখ ভরে গেল ওর। এই স্বাদ, এই রক্ত সে চেনে,—মা এরকম খাবারই তাকে এনে দেয়। তার ওপর এই মাংসের টুকরোটা গরম, জীবন্ত—আরো অনেক বেশি সুস্বাদু। দারুণ তৃপ্তির সঙ্গে একে একে সাতটা ছানাকেই খেয়ে ফেলল সে। কিন্তু তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পড়ে গেল একেবারে মা-পাখিটার মুখোমুখি। পাখিটা একেবারে ঝড়ের গতিতে সমানে ঠোক্কর মেরে পাখার ঝাপটা দিয়ে এই ক্ষুদে শত্রুকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলল। খানিকক্ষণ মার খাওয়ার পর বাচ্চাটাও রেগে উঠল—নিজের ছোট্ট দাঁতের পাটি দিয়ে পাখিটার একটা ডানা কামড়ে ধরল। তারপর দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল এক তুমুল লড়াই। বাচ্চাটার মন থেকে সব ভয় মুছে গিয়ে লড়াই করবার, মারবার একটা

সহজাত অনুভূতি জেগে উঠল। গোটা ব্যাপারটাই এখন বাচ্চাটার কাছে বেশ একটা উত্তেজনা আর আনন্দের ঘটনা বলে মনে হচ্ছিল। মা-পাখিটা এবার ওকে টানতে টানতে ঝোপের পুরোপুরি বাইরে নিয়ে এল। তারপর ওর সারা গায়ে অবিশ্রান্ত ঠোক্কর মেরে যেতে লাগল। বাচ্চাটার মনে হতে লাগল, ওর নাকের ডগাটা বোধহয় ছিঁড়েই পড়ে যাবে। এই বেধড়ক মার সহ্য করতে না পেরে বাচ্চাটা পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় লাগাল। কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হল, কি যেন একটা মারাত্মক ভয়ানক বিপদ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। একটা অন্ধ অনভূতির তাগিদে কিছু না ভেবেই ও চোখের নিমেষে পাশের ঝোপটার মধ্যে ঢুকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে, ওকে কাঁপিয়ে দিয়ে একটা বিরাট ছায়ামূর্তি হুস করে উড়ে বেরিয়ে গেল। একটা বাজপাখির ছোঁ থেকে একচুলের জন্য বেঁচে গেল ও। পরের বারই কিন্তু বাজটা আর একবার ছোঁ মেরে মা-পাখিটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

বাচ্চাটা ঝোপের মধ্যে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে সে। জীবন্ত জিনিস মানেই দারুণ খাবার,—তবে, নিজের চাইতে বড় জীবন্ত জিনিস খেতে চেষ্টা না করাই ভাল। অবশ্য মা-পাখিটার সঙ্গে লড়াইয়ের কথা মনে পড়ায় ওর বেশ ভালই লাগল,—এরকম লড়াই আরো করতে রাজি আছে সে। আস্তে আস্তে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে নদীর ধারে চলে এল বাচ্চাটা। জল কি জিনিস, তা ও জানে না। তাই নিঃসংকোচে নদীর জলের ওপর পা রাখল সে,—আর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল। নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁ করতেই ফুসফুস্ ভরে গেল ঠাণ্ডা জলে,—দমবন্ধ হয়ে এল। এই প্রথম মৃত্যুভয়ের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হল তার। অজানা মৃত্যুভয়ের আদিম, সহজাত অনুভূতিতেও অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। তবে জলের ওপর ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকেই সাঁতার কাটতে লাগল সে,—এটা তো তার অবচেতন অনুভূতিরই শিক্ষা। আর ও ডুবে গেল না—পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে, ঘূর্ণিজলে নাকানিচোপানি খেয়ে কোনোরকমে সাঁতরে নদীর তীরে এসে উঠল। এতক্ষণ পরে মায়ের কথা মনে পড়ে, ক্ষিদে তেষ্টায় অস্থির হয়ে, নিজেকে খুব অসহায় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল ওর,—যে করেই হোক নিজের ছোট্ট গুহাটিতে ফেরবার জন্য ও মরিয়া হয়ে উঠ্‌ল। কতগুলো ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগোনর সময় একটা বেঁজির বাচ্চা ওর নজরে পড়ল। সেটাকেও উল্টে-পাল্টে দেখছে, এমন সময় মা-বেঁজিটা ঠিক একটা হলদে বিদ্যুতের মতোই হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুঁটি কামড়ে ধরল। ও প্রাণপণে লড়াই করল, নিজেকে ছাড়িয়ে

নিতে চেষ্টা করতে লাগল,—কিন্তু মা-বেঁজিটার মরণ-কামড় থেকে বিজেকে কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। আস্তে আস্তে দমবন্ধ হয়ে ও যখন প্রায় মরতে বসেছে ঠিক তখনই ঝোপঝাড় ভেঙে বেঁজিটার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর মা। এক ঝট্‌কায় বেঁজিটাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়ে এক কামড়ে সেটাকে মেরে ফেলল সে। তারপর দুজনে মিলে মরা বেঁজিটাকে খেয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেল। সেখানে মা-নেক্‌ড়েটা বাচ্চাটাকে আদর করে চেটে, একেবারে অস্থির করে দিল—তার দুধের বাচ্ছা মরতে মরতে বেঁচে ফিরে এসেছে। তারপর একসময় দুজনেই নিশ্চিন্ত আরামে গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের আইন

দিন দুয়েক চুপচাপ থেকেই বাচ্চাটা আবার ওর গুহা ছেড়ে বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে দিল। এখন অবশ্য ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি আর আত্মবিশ্বাসও অনেক বেড়ে গেছিল। বেরিয়ে প্রথমেই সেই বেঁজির বাচ্চাটাকে পেটে পুরল সে। ছোট পাখি, কাঠবেড়ালি এসব দেখলেই ও এখন তাদের তাড়া করত। আবার দূরের আকাশে বাজপাখির দেখা পাওয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ত। যত দিন যেতে লাগল, ততই ওর মধ্যে জীবন্ত প্রাণী শিকার করে খাবার ইচ্ছে বেড়েই চলল। প্রথম প্রথম এই শিকার করাটা ওর কাছে ছিল একটা খেলার মতো। কিন্তু কিছুদিন বাদে যখন খাবারের দারুণ অভাব দেখা দিল, তখন ও প্রাণ বাঁচানর, পেট ভরানর তাগিদেই প্রাণপণে শিকার ধরবার চেষ্টায় মেতে উঠ্‌ল। কিন্তু কোনোরকম শিকারই বেচারার ভাগ্যে জুটত না। পেটের জ্বালায় ও এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে উড়ন্ত বাজপাখিকেও এখন ও আর ভয় পেত না, বরং সেটাকে লোভ দেখানর জন্য ঝোপের বাইরে ওৎ পেতে বসে থাকত—যদি পাখিটা নিচে নেমে আসে, তবে তাকেই ধরবে সে। ওর মা-ও সারাদিন খাবার জোগাড় করবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেশ কয়েকদিন একদম উপোষ করে থাকবার পর ওর মা একটা নতুন ধরনের ছোট্ট প্রাণী এনে ওকে খেতে দিল। খিদের জ্বালায় প্রাণের মায়া ছেড়ে মা-নেক্‌ড়েটা বনবেড়ালের গর্তে হানা দিয়েছিল, যার চাইতে বেশি হিংস্র জীব জঙ্গলের জগতে খুব কমই আছে। অন্যান্য ছানাপোনা গুলোকে নিজে খেয়ে একটা নিয়ে এসেছিল নিজের উপোষী বাচ্চাকে খাওয়ানর জন্য। খাওয়া

শেষ করে দুজনে ঘুমোচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ মায়ের প্রচণ্ড গজ্‌রানিতে জেগে উঠল বাচ্চাটা। মাকে এরকম ভয়ানক ভাবে গজ্‌রাতে ও আর কখনো শোনেনি। মাদী বনবেড়ালটা এসে হানা দিয়েছে ওদের গুহায়, ওর ছানাপোনাদের মারবার বদ্‌লা নিতে। এবার দুই মা-য়ে শুরু হয়ে গেল এক মরণপণ লড়াই। বাচ্চাটাও গিয়ে মায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে যোগ দিল। বারবার সে গিয়ে বনবেড়ালটার পা প্রাণপণে কামড়ে ধরতে লাগল আর প্রচণ্ড থাবা খেয়ে ছিট্‌কে গিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তবুও সমানে লড়াই চালিয়ে গেল ও, থামল না। শেষ পর্যন্ত বনবেড়ালটাই মারা পড়ে ওদের পেটেই গেল। প্রচণ্ড লড়াইয়ে ওরা দুজনেও এমন জখম হয়েছিল যে আর নড়াচড়াই করতে পারে'নি। এরপর থেকে বাচ্চাটাও মা-র সঙ্গে সঙ্গেই বেরোতে লাগল খাবারের সন্ধানে। আস্তে আস্তে ও বুঝে নিল, নিজে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল অন্য কাউকে মেরে তার মাংস খাওয়া,—নিজের প্রাণ রাখার একমাত্র আইন হল, অন্যের প্রাণ নেওয়া। আবার, সে যেমন অন্য জীবকে মেরে খেতে চাইছে, তাকেও ঠিক তেমনি অন্য কোনো জীব মেরে খেতে চায়। 'হয় খাও নয় খাবার হও'—এই হল জীবনের নিয়ম, শিকারের আইন। খিদের জ্বালা মেটানই একমাত্র পরম সত্য। আর এই যে গতিময় জীবন, শিকারের পেছনে ছোটা,—এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে বেঁচে থাকার যত আনন্দ আর সার্থকতা। ভয়, অচেনার রহস্য—এগুলোই দৈনন্দিন জীবনের মশলা। পেট ভরে খেয়ে রোদে আরামে গা এলিয়ে দিয়ে ঝিমোনো—এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সমস্ত খাটাখাট্‌নি, দৌড়ঝাঁপ, শিকার ধরার পরিশ্রমের চরম পরিতৃপ্তি।

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

দু-পেয়ে ভগবান

বাচ্চাটা একেবারে আচমকাই ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। আসলে সারারাত ধরে শিকার খুঁজে বেরিয়েছে বলে ঘুমের ঘোরটা কাটেনি ওর, তাই ও একটু অসাবধান হয়েই চলাফেরা করছিল। তাছাড়া হরদমই ও ছোট্ট নদীটাতে জল খেতে যায়, তাই কোনোদিকে নজর রাখবারও দরকার মনে করেনি। কিন্তু এদিন নদীর ধারে গিয়েই ও দেখতে পেল, ঠিক ওর সামনেই কয়েটা অদ্ভুত, অচেনা প্রাণী বসে আছে। এই ও জীবনে প্রথম কোনো মানুষ দেখল। প্রাণীগুলো কিন্তু ওকে দেখে গজ্‌রেও উঠ্‌লনা, লাফিয়ে উঠে দাঁতও খিঁচোল না। চুপচাপ যেমন উবু হয়ে বসে ছিল, তেমন ভাবেই ওর দিকে তাকিয়ে বসে রইল। অন্য সময় হলে বাচ্চাটা নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেত। কিন্তু এখন হঠাৎই ওর মনে কিরকম যেন একটা অন্য ধরনের অনুভূতি খেলে গেল, কিরকম একটা সম্ভ্রম মেশান ভয় ওর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। বহুদিন আগে যে ওর পূর্বপুরুষরা মানুষের কাছে পোষ মেনেছিল, বহু শতাব্দীর পুরনো সেই অনুভূতি যেন এখন ওর মনের কোনো লুকনো জায়গা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ওর আর ছুটে পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রইল না,—সম্মোহিতের মতো ও এই সদ্য দেখা প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে গুটিসুটি মেরে বসে রইল।

যে রেড ইণ্ডিয়ান দলটার মধ্যে বাচ্চাটা গিয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে খুব লম্বা চওড়া একটা লোক ছিল। সে এবার উঠে এসে বাচ্চাটার কাছে দাঁড়াল। ভয়ে ওর গায়ের সমস্ত রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল। ছোট ছোট সাদা দাঁতগুলো বার করে প্রাণপণে মুখ খিঁচিয়ে উঠল সে। লোকটা সঙ্গীদের ডেকে বলে উঠল—'আরে দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌! বাচ্চাটার দাঁতগুলো কেমন ধবধবে সাদা!' এরপর লোকটা হেঁট হয়ে ওকে ছুঁতে গেল। আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলল বাচ্চাটা—তারপর একেবারে শেষ মুহূর্তে আর থাকতে না পেরে লোকটার হাতে দাঁত বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় একটা প্রচণ্ড চড় খেয়ে উল্টে পড়ে বেচারি তারস্বরে কান্না জুড়ে দিল। রেড ইণ্ডিয়ান-গুলো ওর অবস্থা দেখে একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু হঠাৎ একটা পরিচিত শব্দ বাচ্চাটার কানে গেল,—আসছে, এবার ওকে বাঁচাবার জন্য ছুটে আসছে ওর অসম-

সাহসী, দুর্দমনীয় মা। গলার মধ্যে একটা লম্বা আওয়াজ করে থেমে গেল বাচ্চাটা —আর ওর মা ভয়ংকর মূর্তিতে, রাগে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে ঝড়ের বেগে দৌড়ে এসে ওর কাছে দাঁড়াল। মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মুখ বিকৃত করে একটা হিংস্র গর্জন করল সে। লোকগুলো প্রথমে একটু হক্‌চকিয়ে গেছিল। তারপর লম্বা চওড়া লোকটা খুব আশ্চর্য হয়ে ডেকে উঠল—'আরে, কিচে! এই কিচে! এই কিচে!' ডাকটা শুনেই মাদী নেক্‌ড়েটা যেন মন্ত্রপড়া সাপের মতো চুপ করে গেল। লোকটা আবার বেশ জোর গলায় ডাক দিল—'কিচে!' এবার বাচ্চাটা অবাক বিস্ময়ে দেখল, ওর মা,—ওর মহাশক্তিশালী, নির্ভীক মা গলার মধ্যে একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ করতে করতে আর লেজ নাড়তেনাড়তে মাটির সঙ্গেপেট ঠেকিয়ে বসে পড়ল। এই দু-পেয়ে প্রাণীগুলোই যে অন্যান্য আর সব প্রাণীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ,—বাচ্চাটার ছোট্ট মস্তিষ্কে এই ধারণাটা এবার বেশ ভালভাবেই গেঁথে গেল।

লম্বা চওড়া লোকটার নাম 'গ্রে বিভার'। সে এবার এগিয়ে এসে মাদী নেক্‌ড়েটার মাথায় হাত রাখল। ওর অন্যান্য সঙ্গীরাও এসে মা-নেকড়ে আর তার বাচ্চাকে ঘিরে দাঁড়াল। মা-নেকড়েটার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতে ওরা নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে আলোচনা জুড়ে দিল। বাচ্চাটা মায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে সব দেখে যাচ্ছিল—মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই ওর ঘাড়ের রোঁয়াগুলো শক্ত হয়ে উঠছিল। গ্রে বিভার সঙ্গীদের বলছিল—'কিচের মা অবশ্য কুকুরই ছিল। কিন্তু তোমাদের মনে নেই, আমার ভাই একবার কিচের মাকে তিনদিন জঙ্গলের মধ্যে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। তাই, কিচের বাবা নিশ্চয়ই নেকড়ে। এক বছর আগে সেই যে খুব দুর্ভিক্ষ হল, তখনই কিচেটা খেতে না পেয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেছিল। সেখানে যে ও নেকড়ের পালের সঙ্গেই ঘুরে বেড়িয়েছে, এই সাদা দাঁতওয়ালার বাচ্চাটাই তার প্রমাণ—এটা তো একেবারে খাঁটি নেকড়ের বাচ্চা। ওর সাদা দাঁতগুলো জন্যে ওর নাম রাখলাম 'হোয়াইট ফ্যাঙ'। আমার ভাই তো আর এখন বেঁচে নেই, কাজে কাজেই 'কিচে' আর তার বাচ্চা এখন আমারই সম্পত্তি হল, তাই না?'

রেড ইণ্ডিয়ানগুলো আরো কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করল। তারপর গ্রে বিভার মাদী নেকড়েটার গলায় একটা চামড়ার ফিতে বেঁধে একটা পাইন গাছের ডালে সেটাকে বেঁধে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙও অগত্যা ওর মায়ের কাছ ঘেঁষে বসে রইল। গ্রে বিভারের একজন বন্ধু এসে খেলাচ্ছলে হোয়াইট ফ্যাঙকে উল্‌টে ফেলে ওর পেটে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, ওকে এপাশে ওপাশে দোলাতে লাগল। প্রথমটা

হোয়াইট ফ্যাঙের এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না—নিজেকে খুব অক্ষম, অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। যে অবস্থায় ওকে উল্টে শুয়ে থাকতে হচ্ছিল, তাতে ওর নিজের কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু একটু পরে অবাক হয়ে ও দেখল—সুড়সুড়িটা পেতে ওর বেশ ভালই লাগছে। খানিক পরে লোকটা যখন ওকে ছেড়ে দিল, তখন আর ওর মনে ভয় বা আতঙ্কের লেশমাত্রও ছিল না। মানুষের সঙ্গে নিঃসংকোচ বন্ধুত্বের শুরু হল ওর এভাবেই।

একটু পরে অনেক মানুষের কথাবার্তা, হাঁটাচলার আওয়াজ কানে এল ওর। রেড ইণ্ডিয়ানদের বাকি দলটা এসে পৌঁছল এবার। জনা চল্লিশেক বাচ্চাকাচ্চা, নারী-পুরুষ, কাঁধে তাদের জিনিসপত্রের বোঝা। সঙ্গে একপাল কুকুর, তাদের পিঠেও ভারী বস্তা চাপানো। হোয়াইট ফ্যাঙ আর কিচেকে দেখতে পাওয়া মাত্রই কুকুরগুলো ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'পক্ষে লেগে গেল দারুণ লড়াই। কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানরা লাঠির বাড়ি মেরে আর পাথর ছুঁড়ে কুকুরগুলোকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে দিল। ওর নিজস্ব বুদ্ধি দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝতে পারল যে, এই নতুন, দু'পেয়ে প্রাণীদের ন্যায় অন্যায় বোধ আছে, নিজেদের আইন আর নিয়ম আছে। আর সব চাইতে বড় কথা হল, সেই সব নিয়ম কানুন খাটানর মতো তাদের আছে সীমাহীন ক্ষমতা। এই জীবগুলো অন্যান্য জানোয়ারদের মতো দাঁত বা নখ দিয়ে যুদ্ধ করে না। কিন্তু লাঠি বা পাথর—এই সব অচেতন জিনিসকে তারা নিজেদের শক্তি দিয়ে কাজে লাগায়। এদের হাতে ঐ সমস্ত জিনিস জীবন্ত হয়ে ওঠে, ছুটে গিয়ে, লাফিয়ে উঠে, শত্রুদের মোক্ষম ঘা দেয়। এরকম ক্ষমতার কথা হোয়াইট ফ্যাঙ আগে কখনো ভাবতেও পারেনি।

রেড ইণ্ডিয়ানদের পুরো দলটা এবার একসঙ্গে এগিয়ে চলল। গ্রে বিভার যে ওর মাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে—এটা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মোটেই ভাল লাগছিল না। জন্মের পর থেকে এতদিন পর্যন্ত ও সবসময় মায়ের সঙ্গে স্বাধীনভাবে খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়িয়েছে—তাই মায়ের গলায় বাঁধা ঐ চামড়ার ফিতেটা ওর অবচেতন মনে যেন একটা ফাঁদে আটকা পড়ার অজানা ভয় জাগিয়ে তুলছিল। অনেকক্ষণ চলার পর ওরা 'ম্যাকেঞ্জি' নদীর ধারে এসে পৌঁছল। এখানেই রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের ডেরা ফেলবার কাজে লেগে গেল। ওদের বাঁশ পোঁতা, বিরাট বিরাট তাঁবু বা 'টেপী' খাটানো দেখে এই দু-পেয়ে প্রভুদের অসীম ক্ষমতার কথা ভেবে হোয়াইট ফ্যাঙ বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে আরো বেশি অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। একটু পরে মায়ের পাশটি ছেড়ে ও একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর চাইতে বয়সে বেশ একটু

বড় একটা কুকুরের বাচ্চার মুখোমুখি হল সে। এই বাচ্চাটাকে সবাই ডাকত 'লিপ্ লিপ্' বলে। হোয়াইট ফ্যাঙ প্রথমটায় ওর সঙ্গে ভাব করবার জন্যই এগিয়ে গেছিল। কিন্তু আগন্তুকের চালচলন আর দাঁত মুখ খিঁচোন দেখে ও বুঝে গেছিল যে গতিক সুবিধের নয়। আচম্কা লিপ্ লিপ্ লাফিয়ে এসে ওর কাঁধে এক প্রচণ্ড কামড় বসিয়েই আবার লাফিয়ে সরে গেল। এরপরে দুজনের মধ্যে লেগে গেল তুমুল লড়াই। কিন্তু লিপ্ লিপ্ জন্ম থেকে মানুষদের ডেরাতেই বাস করছে—পোষা কুকুরের বাচ্চাদের লড়াইয়ে সে ছিল একনম্বর ওস্তাদ। তাছাড়া বয়সেও সে বেশ খানিকটা বড়, ওজনেও বেশি। অতএব হোয়াইট ফ্যাঙ অল্পক্ষণের মধ্যেই বেধড়ক মার খেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ওর মায়ের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। তবে একটু পরেই সব ভুলে গিয়ে আবার ও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবার ওর দেখা হয়ে গেল প্রভু গ্রে বিভার-এর সঙ্গে। কতগুলো সরু কাঠি আর শুক্নো পাতা নিয়ে কি যেন করছে সে। এক সময় ঐ কাঠি আর পাতার মধ্যে থেকে কি যেন একটা লিক্লিকে জীবন্ত জিনিস লাফিয়ে উঠে নড়াচড়া করতে লাগল—সেটার রং আবার হোয়াইট ফ্যাঙ্-এর দেখা সূর্যের আলোর মতো। হোয়াইট ফ্যাঙ জীবনে কখনো আগুন দেখেনি। তাই সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে জিনিসটাতে নাক ঠেকাল। জিভ দিয়ে চাট্তে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র, অসহ্য যন্ত্রণায় ও একেবারে লাফিয়ে উঠল। ওর মনে হল, অচেনা ঐ জীবন্ত জিনিসটা যেন প্রচণ্ড জোরে ওর নাক আর জিভ কামড়ে দিল। এ রকম অহস্য যন্ত্রণা ও জীবনে কখনো পায়নি। গলা ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এক লাফে পেছনে হটে এল হোয়াইট ফ্যাঙ। তারপর মাটিতে বসে পড়ে একটানা চিৎকার করে যেতে লাগল। ওর নাক আর জিভ—দুটোই একদম ঝলসে গিয়েছিল, তাই জিভ দিয়ে নাক চাটবে তারও কোনো উপায় ছিল না। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে গ্রে বিভার আর উপস্থিত সব লোকেরা প্রাণভরে হাসতে লাগল। ও যতই কাঁদে লোকগুলো ততই হাসে। আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে ওর যত না কষ্ট হচ্ছিল, দু-পেয়ে প্রভুদের হাসি ঠাট্টা আর রং-তামাশায় তার চাইতে বেশি লজ্জা হচ্ছিল ওর। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে ফিরে গেল সে। মা-ই একমাত্র প্রাণী যে ওর দুর্দশা দেখে ঠাট্টা করেনি, বরং ওর কান্না শুনে বাঁধা অবস্থাতেই পাগলের মতো দাপাদাপি করে যাচ্ছিল। সেদিন নিস্তব্ধ মাঝ রাতে মার কাছে শুয়ে ওর নির্জন সেই গুহা, ছোট্ট নদী, জঙ্গল এবং শৈশবের আরো সব স্মৃতি ভীড় করে এসে মনে খেলা করে যেতে লাগল। ওর ভেতর থেকে কিরকম একটা চাপা কান্না যেন গুম্রে উঠতে লাগল। এই দু-পেয়ে প্রভু মানুষদের

জীবনে সব সময়েই লেগে আছে অসম্ভব ভীড় আর হৈ-হট্টগোল। কথাবার্তা, ঝগড়া-ঝাঁটি আর চেঁচামেচি এখানে লেগেই আছে। জঙ্গলের সেই স্বাধীন নিশ্চিন্ত জীবন কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গেই অবশ্য এই দু'-পেয়ে মানুষদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভয় মেশানো ভক্তিতে ওর সারা মন ভরে উঠল। ভগবান যে কি জিনিস তা অবশ্যই ও জানে না। কিন্তু ভগবান বা কোনো দেবতা যদি কোন মানুষের সামনে সশরীরে দেখা দিতেন, তাহলে সেই মানুষের মনোভাব যেমন হত, হোয়াইট ফ্যাঙ-এর এইসব মানুষ প্রভুদের প্রতি মনোভাবও ঠিক সেই রকমই হল। পাথর, লাঠি, বাঁশ সব জড় পদার্থদের দিয়ে এরা ইচ্ছেমতো কাজ করাতে পারে। কাঠকুটো, শুক্‌নো পাতা দিয়ে 'আগুনে'র মতো ভয়ঙ্কর জীবন্ত জিনিস তৈরি করতে পারে। এরা তো সর্বশক্তিমান ভগবান, নিঃসন্দেহে প্রাণী জগতের একচ্ছত্র প্রভু!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধন

যতই দিন যেতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর অভিজ্ঞতাও তত বেড়ে চলল। দু' পেয়ে মানুষ প্রভুদের চলাফেরা, স্বভাব, মেজাজ সব কিছুর খুঁটিনাটিই সে আস্তে আস্তে বুঝে ফেলল। ও জেনে গেল যে, অন্যান্য সব কুকুরের মতো সে আর তার মা-ও এই প্রভুদের সম্পত্তি—প্রভুরা তাদেরকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। এমনকি তার অসমসাহসী মা, যাকে সে পৃথিবীর সব ক্ষমতার উৎস বলে এতদিন জেনে এসেছে—সে-ও এই দু-পেয়ে মনিবদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। প্রভুদের সব ইচ্ছে তাকে মেনে নিতেই হবে, সহ্য করতেই হবে। একদিনেই অবশ্য হোয়াইট ফ্যাঙ মানুষের কাছে এইভাবে দাসত্ব স্বীকার করেনি—ওর স্বাধীন, বন্য জীবনের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতি ভুলে যেতে ওর অনেকদিন লেগেছিল। মাঝে মাঝেই ও জঙ্গলের ধারে চলে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত অনেকক্ষণ,—ওর মনে হত ঘন বনের মধ্যে থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। প্রতিবারই অবশ্য শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছে ফিরে আসত সে। আর আগ্রহ ভরে মায়ের মুখ চেটে, অস্ফুট আওয়াজ করে যেন জানতে চাইত ওর মা আবার জঙ্গলের মুক্ত জীবনে ফিরে যাবে কিনা।

আস্তে আস্তে অবশ্য মানুষদের এই জীবনযাত্রা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গা সওয়া হয়ে

উঠ্‌তে লাগল। কিন্তু লিপ্‌ লিপ্‌ হয়ে উঠল ওর জীবনের বিভীষিকা। যখনই সুযোগ পেত তখনই লিপ্‌ লিপ্‌ ওর ওপর লাফিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে ওকে একেবারে অতিষ্ট করে তুলত। সমবয়সী অন্যান্য কুকুরের বাচ্চাদের সঙ্গে কোনো সময় একটু খেলা করার সুযোগও পেত না বেচারি হোয়াইট ফ্যাঙ। এর ফলে ওর বয়সী বাচ্চাদের স্বভাবে যে ছট্‌ফটে, আমুদে ভাবটা থাকে, সেটা আর ওর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে ফুটে উঠতে পারল না—এই বয়সেই সে হয়ে উঠ্‌ল খিট্‌খিটে, আত্মকেন্দ্রিক, সন্দিগ্ধমনা। বয়স্কদের মতো নানারকম ছলচাতুরিতেও সে পাকা হয়ে উঠ্‌ল। একদিন লিপ্‌ লিপ্‌-এর কাছ থেকে পালাতে পালাতে হোয়াইট ফ্যাঙ তার এই মহাশত্রুকে নিয়ে এসে ফেলল একেবারে ওর মায়ের নাগালের মধ্যে। আর ওর মা-ও বাগে পেয়ে লিপ্‌ লিপ্‌কে আচ্ছা করে কামড়ে একেবারে ফালা ফালা করে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙ-ও এই সুযোগে তার এই প্রতিদ্বন্দ্বীর একখানা পা চিবিয়ে একেবারে ছিব্‌ড়ে করে দিল। লিপ্‌ লিপ্‌-এর সব বীরত্ব এতক্ষণে উবে গেছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে প্রাণপণে পালিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল সে। পেছন পেছন তাড়া করে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। এর কয়েকদিন বাদেই গ্রে বিভার কিচের গলার বাঁধন খুলে দিল। সে বুঝতে পেরে গেছিল যে নেকড়েটা এবার একদম পোষ মেনে গেছে, আর পালিয়ে যাবে না। সেদিন সন্ধ্যেবেলা হোয়াইট ফ্যাঙ ওর মা-কে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ যেন ওর শৈশবের বন্য জীবনের কথা মনে পড়ে গেল,—সেই মুক্ত, স্বাধীন জীবন যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। বারবার ও জঙ্গলের মধ্যে ছুটে চলে গেল। আর ফিরে এসে মাকে চেটে গলার মধ্যে আয়ওাজ করে, মাকে ডাক্‌তে লাগল। কিন্তু ওর মায়ের কাছে এতদিনে জঙ্গলের আকর্ষণের চাইতে মানুষের সাহচর্য, নিরাপদ আশ্রয় আর আগুনের উষ্ণ আরাম অনেক বেশি লোভনীয় হয়ে উঠেছিল, তাই সে ছেলের ডাকে সাড়া দিল না। খানিকক্ষণ জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার আস্তে আস্তে নিজেদের তাঁবুর দিকেই ফিরে চলল। অগত্যা হোয়াইট ফ্যাঙ-ও হতাশভাবে জঙ্গলের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে তাকাতে মায়ের সঙ্গেই ফিরে গেল। সে যে এখনো নেহাৎ ছোট, মায়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার মতো বুদ্ধি বা সাহস—কোনোটাই এখনো তার হয়নি।

খুব শিগ্‌গিরই কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে তার মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। 'থ্রি ঈগ্‌ল্‌স' নামে এক রেড ইণ্ডিয়ান ছিল গ্রে বিভার-এর পাওনাদার। সে অন্যখানে চলে গেল বলে গ্রে বিভারকে তার সব পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিতে হল।

এক টুক্‌রো লাল কাপড়, একটা ভালুকের চামড়া, কুড়িটা টোটা আর 'কিচে'—সব লটবহর নিয়ে নদীতে নৌকা ভাসাল থ্রি ঈগ্‌ল্‌স। মাকে নৌকা করে চলে যেতে দেখে আতঙ্কে আর দুঃখে দিশাহারা হয়ে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। পাগলের মতো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকার পেছনে সাঁতরাতে লাগল সে। এমনকি মনিব গ্রে বিভার-এর নিষেধ পর্যন্ত ওর কানে গেল না। ফলে গ্রে বিভার তো চটে আগুন হয়ে উঠ্‌ল—একটা নৌকা বেয়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে ঘাড় ধরে জল থেকে তুলে বেদম ঠ্যাঙানি দিল সে। তারপর ছুঁড়ে ওকে নৌকার মধ্যে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে একপাশে ঠেলে দিতে গেল। এবার হঠাৎ ওর আদিম স্বাধীন চেতনা যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মধ্যে ঝল্‌সে উঠল—মরীয়া হয়ে প্রাণপণে গ্রে বিভার-এর পায়ে দাঁত বসিয়ে দিল সে। ফলে এবার যে মারটা ও খেল, তা এতক্ষণের মারের তুলনায় কিছুই নয়। নৌকার দাঁড় দিয়ে পিটিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ছোট্ট শরীরখানাকে প্রায় থেঁত্‌লে দিল সে। আর পা দিয়ে বারবার ওকে সজোরে লাথি মারল। হোয়াইট ফ্যাঙ চিরদিনের মতো এই শিক্ষা পেয়ে গেল যে, মানুষ প্রভুর গায়ে দাঁত বসানর মতো মারাত্মক অপরাধ আর নেই। এবং এই অপরাধ কখনো কোনো অবস্থাতেই করতে নেই। মারের পালা শেষ হলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ক্ষতবিক্ষত দেহে গ্রে বিভারের তাঁবুতে ফিরে এল সে। গভীর রাতে মায়ের কথা মনে পড়ে। গলা ছেড়ে কাঁদতে গিয়ে আবার ও গ্রে বিভারের কাছে ঠ্যাঙানি খেল। এরপর থেকে মায়ের কথা মনে পড়লে ও গুম্‌রে গুম্‌রে খুব নিচু গলায় কাঁদত। মা শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে—এই আশায় দিনগুলো কাটতে লাগল তার। তাছাড়া, এই দু-পেয়ে মনিবদের সঙ্গে নিজের অজান্তেই তার যেন একটা বন্ধন গড়ে উঠ্‌ছিল। গ্রে বিভারকেও এতদিনে অনেকটা চিনে গেছিল সে—বুঝতে পেরেছিল যে বশ্যতা—নিঃসর্ত, সম্পূর্ণ বশ্যতাই গ্রে বিভার তার কাছ থেকে চায়। বিনিময়ে সে পাবে নিরাপদ আশ্রয়, শাস্তিহীন দিনযাপনের শান্তি আর অনায়াসলভ্য পেটভরা খাবার। গ্রে বিভার ছিল কঠোর, নির্মম মনিব—হোয়াইট ফ্যাঙকে ডেকে কখনো সে আদরের কথা বলত না। গায়ে হাত বুলিয়ে দিত না। কিন্তু তার এই কঠোরতা, দৈহিক শক্তি এগুলোই যেন আস্তে আস্তে হোয়াইট ফ্যাঙকে তার দিকে আকৃষ্ট করে তুলল। মানুষের সাহচর্য, তাদের অগ্নিকুণ্ডের উষ্ণতা ওর পূর্বপুরুষদের মতোই ওকেও আবিষ্ট করে ফেলতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙ অবশ্য চট্‌ করে নিজের এই পরিবর্তন বুঝতে পারেনি—মায়ের কথা, আর ওর প্রথম শৈশবের স্বাধীন জীবনের স্মৃতিতেই ওর মন সব সময়ে আকুল হয়ে থাকত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একঘরে

মনিবের কাছ থেকে আশ্রয় আর খাবার পেলেও রেড ইণ্ডিয়ানদের বসতির অন্যান্য কোনো পরিবার বা তাদের কুকুরের সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কোনোরকম সদ্ভাব গড়ে ওঠেনি। বসতির সমস্ত কুকুরেরই সে ছিল পয়লা নম্বরের দুশমন—আর তাদের দলপতি ছিল লিপ্ লিপ্। আসলে এই অবস্থাটার জন্য লিপ্ লিপ্ই দায়ী। সে যেই হোয়াইট ফ্যাঙকে তাড়া করত, সঙ্গে সঙ্গে এলাকার সমস্ত কমবয়সী কুকুরের পাল এসে তার সঙ্গে যোগ দিত। হোয়াইট ফ্যাঙ যে আসলে একটা নেক্ড়ে—এটা বোধহয় ওদের অবচেতন মনে সাড়া দিয়েছিল। হরদম এই ঝগড়াঝাঁটি, কামড়াকামড়ির ফলে হোয়াইট ফ্যাঙের ভেতর যে স্বাভাবিক বন্যতা আর হিংস্রতা ছিল, তা বেড়ে গেল বহুগুণ,—সে হয়ে উঠ্ল পয়লা নম্বরের ঝগড়াটে, চোর আর মারকুটে। বসতির যেখানেই কুকুরের দলে লড়াই বাধত, বা যে কোনো তাঁবুর রান্নাঘর থেকেই মাংসের টুক্রো চুরি যেত, সেখানেই অবধারিত ভাবে দেখা যেত যে, তার মূলে আছে হোয়াইট ফ্যাঙ। রেড ইণ্ডিয়ান গিন্নীরাও ওর ওপর হাড়ে চটা ছিল। ওকে দেখলেই তারা ওকে তাড়া করত, গালাগালি দিত। তবে দলবেঁধে আক্রমণ করেও লিপ্ লিপ্-এর দলবল একা হোয়াইট ফ্যাঙের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। চোখের পলক ফেলার আগেই কি করে শত্রুকে ঘায়েল করতে হয়, সেটা এতদিনে হোয়াইট ফ্যাঙ শিখে ফেলেছিল নিখুঁতভাবে। বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতায় ও ঠিক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত,—ওকে চিৎ করে ফেলা কারো সাধ্য হত না। ও জানত, শত্রুদলের মধ্যে মাটিতে পড়ে গেলেই নিশ্চিত মৃত্যু। তাছাড়া, অন্যান্য কুকুরদের মতো ও লড়াই আরম্ভ করার আগে অযথা তর্জন গর্জন করে সময় নষ্ট করত না। দেরি করা মানেই শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা। ওর দরকার তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে সরে পড়া। তাই মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে এসে, প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে কাম্ড়ে ফালা করে দিয়ে ও লাফিয়ে আবার সরে যেত। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, বসতির প্রায় প্রত্যেকটা কুকুরের বাচ্চার শরীরেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দাঁতের গভীর চিহ্ন ফুটে উঠ্ল। তাছাড়া, কুকুরগুলোকে সবসময়েই দলবেঁধে ঘুরে বেড়াতে হত, কারণ দলছুট হওয়া মানেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাছে মোক্ষম কামড় খাওয়া। গাছপালা, ঝোপঝাড়ের মধ্যে

দিয়ে চলমান ছায়ার মতো নিঃশব্দে দৌড়ত সে। অন্যান্য কুকুরগুলো তার চলাফেরা টেরই পেত না। তাছাড়া আড়ালে লুকিয়ে হঠাৎ কোনো দলছুট কুকুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে সবার আগের কুকুরটাকে ঘায়েল করা—এ সব ফন্দিতেও সে একেবারে ওস্তাদ হয়ে উঠল। এইভাবে একঘরে হয়ে সারাক্ষণ লড়াই করে, মার খেয়ে আর পাল্টা মার দিয়ে, কি বুদ্ধিতে আর কি শক্তিতে ওর সমবয়সীদের চাইতে অনেক বেশি বেড়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ। যে বয়সে কুকুর-ছানারা খেলা করে বেড়ায়, সেই বয়সেই বেঁচে থাকার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বেড়ে উঠতে লাগল সে। তার স্বভাব থেকেও সব মায়ামমতা আর হাল্‌কা ভাব মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠ্‌ল হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা আর ধূর্ততা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানুষের আশ্রয়

বছর শেষ হয়ে শীতকাল এসে গেল। হোয়াইট ফ্যাঙ ইতিমধ্যে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। গ্রে বিভার আর তার দলবল একদিন সকালে তাদের এই ডেরা গুটিয়ে ফেলে নতুন জায়গার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। হোয়াইট ফ্যাঙ কয়েকদিন ধরেই ওদের ব্যস্ততা, উদ্যোগ আয়োজন লক্ষ্য করে যাচ্ছিল—ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে, তা সে বুঝতে পেরেছিল ভালভাবেই। যেদিন গ্রে বিভার দলবল নিয়ে যাত্রা শুরু করল, সেদিন সে একসময় চুপি চুপি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল। যাওয়ার সময় গ্রে বিভার, তার স্ত্রী, আর ছেলে 'মিত্‌সা' ওর নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি, খোঁজাখুজি করল, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ কোনোরকম সাড়া দিল না, চুপ করে বসে রইল। ডাকাডাকি করে ক্লান্ত হয়ে এক-সময় গ্রে বিভার সপরিবারে আর সবার সঙ্গে চলে গেল। ওদের বসতির জায়গাটা একেবারে খালি হয়ে গেল—পড়ে রইল শুধু ফেলে যাওয়া কিছু বাতিল জিনিসপত্র। আস্তে আস্তে মাটির বুকে সন্ধ্যা নেমে এল। হোয়াইট ফ্যাঙ-ও ওর লুকনো জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমটায় ও এই হঠাৎ মুক্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিল, কিন্তু হঠাৎই কিরকম যেন একটা নিঃসঙ্গতাবোধ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অন্ধকার, নিস্তব্ধ, গমথমে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এখন আর ও কোনোরকম আকর্ষণ বোধ করছিল না বরং ওর মনে হচ্ছিল, ঐ ঘন জঙ্গলের কালো, গভীর ছায়ার মধ্যে কি যেন এক অজানা বিপদ ওর জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। তারপর ও টের পেল, দারুণ

শীতে ও কাঁপছে। তাঁবুর নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আগুনের কুণ্ডের উষ্ণতা—কিছুই এখানে নেই। নেই মানুষ প্রভুদের হাত থেকে বিনা পরিশ্রমে পাওয়া মাংসের টুক্‌রো, তাদের গলার কলরব। গাছের ছায়া, ডালপালা নড়ার আওয়াজে ও ভয়ে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগল। শেষ পর্যন্ত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গ্রে বিভার-এর তাঁবুটা যেখানে ছিল, সেখানে এসে সারারাত বসে রইল সে। ওর এখন মনে হচ্ছিল, এই সীমাহীন নিঃসঙ্গতার চাইতে গ্রে বিভারের শক্ত হাতের চড়-চাপড়, লিপ্‌ লিপ্‌ আর তার দলবলের অত্যাচারও অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়। খোলা প্রান্তরে বসে চাঁদের দিকে নাক তুলে তাকাল ও। আর ওর এতদিনকার জমে থাকা দুঃখ, বেদনা, মায়ের জন্য শোক, ভবিষ্যতের জন্য অনিশ্চয়তা সব মিলিয়ে কি একটা প্রচণ্ড অন্ধ আবেগ যেন ওর মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। ওর গলা থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘ একটানা একটা মর্মভেদী চিৎকার—নেক্‌ড়েরা যেভাবে চেঁচায়, জীবনে এই প্রথম ঠিক সেইরকম চিৎকার করে উঠ্‌ল হোয়াইট ফ্যাঙ।

দিনের আলো ফুট্‌লে ওর মনে আবার সাহস ফিরে এল। কিন্তু চারদিকের ধূ ধূ করা নিঃসঙ্গতা যেন ওর কাছে আরো বেশি অসহ্য হয়ে উঠল। এর পরে কি করবে তা ঠিক করে ফেলতে আর ওর দেরি হল না একটুও। নদীর তীর ধরে যেদিকে ওর মানুষ-মনিবরা চলে গেছে, সেদিকে দৌড় শুরু করে দিল ও। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে একটানা তিরিশ ঘণ্টা দৌড়ে চলল হোয়াইট ফ্যাঙ। স্রেফ মনের জোর আর লৌহ-কঠিন মাংসপেশী ওকে এগিয়ে নিয়ে চলল। এইভাবে অবশ্য আর বেশিক্ষণ ও দৌড়তে পারত না—হয় খিদে তেষ্টায় মারা পড়ত, কিংবা কোনো নেকড়ের পালের সঙ্গে মিশে গিয়ে গভীর জঙ্গলে ফিরে যেত। কিন্তু হঠাৎ ওর নাকে ভেসে এল একটা চেনা গন্ধ—তার প্রভু দু-পেয়ে ভগবানদের পরিচিত গন্ধ। এতক্ষণে আকাশ থেকে বরফ পড়া শুরু হয়েছিল। বরফের ওপর টাট্‌কা মানুষের পায়ের ছাপও ওর নজরে এল। এখন আর ও ঠিকমতো চলতে পারছিল না—ওর পা কেটে একেবারে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছিল। অধীর আগ্রহে গলার মধ্যে একটা চাপা আওয়াজ করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল হোয়াইট ফ্যাঙ—আর শিগ্‌গিরই গাছপালার ফাঁক দিয়ে গ্রে বিভার-এর তাঁবুটা চোখে পড়ল ওর। আরো একটু সামনে এসে ও দেখতে পেল, বড় করে একটা আগুনের কুণ্ড তৈরি করা হয়েছে। আর গ্রে বিভার তার সামনে বসে বসে এক টুক্‌রো কাঁচা চর্বি চিবোচ্ছে—তার মানে টাট্‌কা মাংসও ওর ঘরে নিশ্চয়ই আছে। হোয়াইট ফ্যাঙ ধরেই নিয়েছিল যে, ফিরে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই ওর মনিবের কাছে ও আচ্ছারকম মার খাবে। এই অপ্রিয়

কথাটা চিন্তা করে ওর সারা শরীরটা শক্ত হয়ে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু ও থামল না—এগিয়েই চলল। মার খাওয়ার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ওর মনে খেলে গেল যে, আর খানিকক্ষণের মধ্যেই ওর জুট্‌বে আগুনের উষ্ণতা, নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়, আর অন্যান্য কুকুরদের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ। গুটি গুটি পায়ে, আস্তে আস্তে আগুনের কুণ্ডের সামনে এসে দাঁড়াল ও। গ্রে বিভার ওকে দেখতে পেয়ে খাওয়া থামিয়ে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর যেন আর পা চলতে চাইছিল না—প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এসে সে মনিবের পায়ের তলায় শুয়ে পড়ল। নিঃশর্ত ভাবে মানুষ-প্রভুর কাছে নিজের থেকে আত্মসমর্পণ করেছে সে। এবার তার প্রভু তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করুক। গ্রে বিভারের হাত নড়ে উঠ্‌ল—হোয়াইট ফ্যাঙ-ও প্রত্যাশিত আঘাতের আশঙ্কায় কম্পিত দেহে অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু কোনোরকম আঘাতই ওর ওপর নেমে এল না। বরং আড়চোখে তাকিয়ে ও দেখ্‌ল, গ্রে বিভার এক টুকরো চর্বি ওর সামনে মেলে ধরেছে। খুব সন্দেহভরে প্রথমে ও চর্বির টুকরোটাকে শুঁক্‌ল, পরে খেয়ে ফেলল। এবার গ্রে বিভার ওকে অনেকখানি মাংস খেতে দিল। পেট ভরে খেয়ে আরাম করে আগুনের পাশে বসে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ। আবেশে চোখ বুজে এল তার। এখন আর ওর মনে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। আর তাকে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্গভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে না,—মানুষ-প্রভুর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাদের মধ্যেই সে পেয়ে গেছে নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চুক্তি

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি গ্রে বিভার নিজের পরিবারের লোকজনকে নিয়ে ম্যাকেঞ্জি নদী বরাবর একটা লম্বা পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়ল। দুটো স্লেজ গাড়ি নিয়ে বেরোল ওরা,—বড়টা গ্রে বিভার নিজে চালাতে লাগল, আর ছোট্ট স্লেজটা চালাতে দিল ওর ছেলে মিত্‌সাকে। এই ছোট্ট স্লেজটা চালাবার জন্য ঠিক করা হল সাতটা কুকুরের বাচ্চা। মিত্‌সা বয়সে ছোট হলেও ওর বাবার মতই শক্তসমর্থ আর বুদ্ধিমান হয়ে উঠ্‌ছিল। কুকুরের বাচ্চাগুলোকে স্লেজের সঙ্গে জোড়া হল অর্ধ-চন্দ্রাকারে—ঠিক একটা খোলা হাতপাখার মতো করে। মধ্যিখানে যে কুকুরটা দলপতির কাজ করবে, তার দড়িটা সবচাইতে বড়। তার দুপাশের কুকুরের দড়ি-গুলো আস্তে আস্তে দৈর্ঘ্যে ছোট হয়ে এসেছে। এর ফলে কোনো কুকুরেরই অন্য

কুকুরের পা মাড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রইল না ; তাছাড়া এর ফলে স্লেজের সব জায়গাতেই সমান রকম ওজনের ভার রইল। কুকুরের ঝগড়াঝাঁটি, কামড়াকামড়ি করারও উপায় রইল না। কাউকে কামড়াতে গেলে পেছন ফিরতে হবে, আর তাহলেই সজোরে স্লেজচালকের হাতের লম্বা চাবুকের বাড়ি এসে শরীরের ওপর আছড়ে পড়বে। সামনের কুকুরটাকে কামড়ানোর কোনও উপায়ই রইল না, কারণ পেছনের কুকুরটা যত জোরে দৌড়বে, স্লেজগাড়িটা ততই বেশি ছুটবে, আর সামনের কুকুরটার দৌড়নোর গতিও তাই আপনা থেকেই বেড়ে যাবে। ফলে তাকে ধরা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

আরো একটা ফন্দি মিত্‌সা এবার কাজে লাগাল। লিপ্‌লিপ্‌ যে সুযোগ পেলেই হোয়াইট ফ্যাঙকে কামড়ায়, এটা সে বহুদিন আগেই লক্ষ্য করেছিল। তবে, লিপ্‌লিপ্‌ তখন অন্যের কুকুর ছিল বলে ও বিশেষ কিছু করতে পারত না। কিন্তু লিপ্‌লিপ্‌ হয়ে গেছিল ওর নিজস্ব সম্পত্তি। লিপ্‌লিপ্‌কে ও ওর স্লেজের দলপতি বানিয়ে সব চাইতে লম্বা দড়িটার সঙ্গে জুতে দিল। ফলে স্লেজের অন্য কুকুরগুলো সব সময়েই দেখতে পেত, লিপ্‌লিপ্‌ যেন ওদের আগে আগে পালিয়ে যাচ্ছে,—লিপ্‌লিপ্‌-এর পেছনের ছুটন্ত পা দুটোই খালি ওদের নজরে পড়ত। ওরা সব সময়েই দৌড়ে লিপ্‌লিপ্‌কে ধরে ফেলবার চেষ্টা করত। লিপ্‌লিপ্‌-এর পক্ষে ঘুরে গিয়ে কাউকে কামড়ানোর জো ছিল না, কারণ তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মিত্‌সার হাতের চর্বি দিয়ে পাকানো তিরিশ ফুট লম্বা চাবুক এসে ওর মুখের ওপর আছড়ে পড়বে। এর ফল হল এই, অন্য কুকুরগুলোর মন থেকে লিপ্‌লিপ্‌ সম্পর্কে সব ভীতি একদম মুছে গেল।

হোয়াইট ফ্যাঙ তার এই নতুন স্লেজ টানার কাজটা অবশ্য বেশ মনের আনন্দেই করে যাচ্ছিল। কোনও কুকুরের সঙ্গেই ওর কোনও রকম সদ্ভাব ছিল না, মায়ের কথাও আর ওর প্রায় মনেই পড়ত না। ফলে ওর এখনকার আপনজন দুপেয়ে মনিবদের কাজেই ও সব মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল। নেক্‌ড়ে আর বুনো কুকুর যখন পোষ মানে, তখন তাদের মতো বিশ্বাসী আর পরিশ্রমী জানোয়ারের কোনও তুলনাই খুঁজে পাওয়া যায়না। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মধ্যেও এই গুণগুলো খুব বেশি ছিল। তবে, এই গুণগুলোর সঙ্গে তার মধ্যে আর একটা বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছিল—তা হল স্বজন-বিদ্বেষ। প্রতিটি কুকুরকেই ও নিজের শত্রু বলে মনে করত। ওর চাইতে বড়, শক্তিশালী কুকুরদের সঙ্গে ও অবশ্য কখনো লড়াই করতে যেত না। কিন্তু ওর সমবয়সী অন্যান্য কুকুরদের কাছে কিন্তু সে হয়ে উঠেছিল অত্যাচারের সাক্ষাৎ

প্রতিমূর্তি। 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'—এটাই হয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর জীবনের মূলমন্ত্র। আর যেহেতু কঠোর, কঠিন পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে ওকে বেঁচে থাকতে হয়েছিল, তাই ওর বন্যতা, হিংস্রতা আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অন্যান্য সমবয়সী কুকুরগুলো কোনরকমেই এঁটে উঠতে পারত না। ফলে ওর দলের মধ্যে হোয়াইট ফ্যাঙ-ই হয়ে উঠল সর্বেসর্বা—ওকে ভুলেও কেউ ঘাঁটাতে যেত না।

কয়েকমাস ধরে সমানে গ্রে বিভার এগিয়ে চলল। দিনের পর দিন কঠিন পরিশ্রম করে, স্লেজ টেনে হোয়াইট ফ্যাঙ-ও ক্রমেই বেশি শক্তসমর্থ হয়ে উঠতে লাগল। তবে, ওর পারিপার্শ্বিক জগৎটা খুব কঠোর আর নিষ্করুণ হয়েই রইল, সেখানে দয়ামায়া বা স্নেহভালবাসার কোনও স্থান রইল না। গ্রে বিভার-এর প্রভুত্ব সে মেনে নিয়েছিল ঠিকই ; কিন্তু গ্রে বিভারের প্রতি কোনরকম ভালবাসা বা টান ও কখনো নিজের মধ্যে অনুভব করেনি। গ্রে বিভার ছিল নিষ্ঠুর, কঠোর হৃদয় মনিব—হোয়াইট ফ্যাঙকে ভালবাসতে সে কখনো চেষ্টা করেনি। তাই মানুষের ভালবাসা যে কি জিনিস সেটা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাছে অজানাই হয়ে রইল। গ্রে বিভারের কাছে সে যে বশ্যতা স্বীকার করেছিল, সেটার মূল কারণ ভয়-ভক্তি নয়। মানুষ জাতটাকে সে মেনে চলতে শিখল বটে, কিন্তু তাকে ভালবাসতে শিখল না। তবে, অনেক নতুন আইন-কানুনও ওর জানা হয়ে গেল,—যেমন ও বুঝতে শিখল যে, দরকার পড়লে ওর নিজের মনিব ছাড়া অন্য মানুষকে কামড়ানো চলতে পারে। একবার একটা গ্রামে ওর ছোট মনিব মিত্‌সাকে অন্য কয়েকটা রেড ইণ্ডিয়ানের ছেলে ধরে মারছিল। হোয়াইট ফ্যাঙ প্রথমটায় চুপ করেই ছিল,—কারণ এটা মনিবজাতের নিজেদের মধ্যে লড়াই। কিন্তু একটু পরে যখন একলা মিত্‌সা শত্রুদলের কাছে বেধড়ক মার খেতে লাগল, তখন হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে শত্রুদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কামড়ে ফালা ফালা করে দিল সে। মিত্‌সা তাঁবুতে ফিরে এসে যখন ব্যাপারটা বলল, তখন গ্রে বিভার খুব খুশি হয়ে ওকে অনেকখানি মাংস খেতে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝতে পারল যে, সে ঠিক কাজই করেছে। আস্তে আস্তে মনিবদের প্রতি তার কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ছবি ওর মনের মধ্যে গেঁথে গেল। ও খুব ভালভাবে জেনে গেল যে, ওর নিজের যে প্রভু, সেই দুপেয়ে ভগবানের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখাই তার প্রথম কাজ—সেই ভগবানের যদি কোনও বিপদ হয় তাহলে নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে বাঁচাতে হবে, তার জিনিসপত্র, ধনসম্পত্তি সামলাতে হবে। এর জন্য দরকার হলে অন্য মানুষকে কামড়ানোও যেতে পারে। এতে হয়ত তার নিজের জীবনও বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু নিজের বিপদের কথা ভাবলে

চলবে না,—প্রভুর প্রতি কর্তব্যই সব কিছুর শেষ কথা। অবশ্য তার সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙ এটাও বুঝতে পারল যে, অন্য কোনও মানুষ যদি অন্যায়ভাবে তাকে মারতে আসে, আর আত্মরক্ষার তাগিদে যদি তখন সে ঐ মানুষটাকে কামড়াতে যায়, তাহলে তার নিজের প্রভুই এগিয়ে আসবে তাকে বাঁচাতে, তার হয়ে লড়তে। যে কোনও মানুষের গায়ে দাঁত বসানো সব সময়েই ক্ষমাহীন অপরাধ—এই ধারণাটা এতদিনে ওর মন থেকে মুছে গেল। এছাড়া রাতের অন্ধকারে চুপিসাড়ে যে সব দু পেয়ে মানুষরা ওর মনিবের তাঁবুতে ঢুকতে আসে, সেই সব চোর ছ্যাঁচোড় তাড়াতেও হোয়াইট ফ্যাঙ একেবারে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ হয়ে উঠল। অল্প দিনের মধ্যেই সে বুঝে গেল যে, এই সব দুপেয়েরা খুব ভীতু হয়, তার সাড়া পেলেই উর্ধ্বশ্বাসে পালায়। যে ভাবে নিঃশব্দে গিয়ে ও চোরেদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাতে চোরেদের কাছে ও হয়ে উঠল একটা বিভীষিকার মতো—কেউই আর ঘুণাক্ষরেও গ্রে-বিভার-এর তাঁবুতে রাতে উঁকি দিতে সাহস পেত না। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে কোনও কুকুরেরই সদ্ভাব ছিল না—নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ ভাবেই সে বেড়ে উঠেছে। তাই এই পাহারাদারের কাজে ও একেবারে অতুলনীয় হয়ে উঠল—ওর হিংস্রতা, অদম্যতাও বেড়ে গেল বহুগুণ।

আস্তে আস্তে মানুষের সঙ্গে কুকুরের যেন একটা পাকাপোক্ত চুক্তি হয়ে গেল—হোয়াইট ফ্যাঙ-এর যে সব পূর্ব-পুরুষরা বন্যজীবন থেকে এসে মানুষের পোষ মেনেছিল, তারাও তাদের মনিবদের সঙ্গে এই একইরকম সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। শর্তগুলো খুবই সোজা। মানুষ প্রভুর কাছে তাকে নিজের স্বাধীনতা বিলিয়ে দিতে হল। মানুষ তাকে দিল খাবার, সাহচর্য, আগুনের উষ্ণতা, নিরাপদ আশ্রয়। তার পরিবর্তে হোয়াইট ফ্যাঙ হয়ে উঠল মানুষ প্রভুর জান মালের পাহারাদার, তার আজ্ঞাবহ, পোষমানা এক সেবক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেশ কয়েকমাস একটানা পথ চলার পর শেষ পর্যন্ত যখন গ্রে বিভার তার নিজের গ্রামে এসে ঢুকল, তখন এপ্রিল মাস এসে গেছে। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর বয়স এখন এক বছর। এতদিনে ও অনেক বড়সড় হয়ে উঠেছিল, আর সমানে বেড়েই চলছিল। ওর ধূসর রং, চালচলন দেখলে ওকে ঠিক একটা নেকড়ে বলেই মনে হত। মায়ের দিক থেকে যে কুকুরের রক্ত ওর শরীরে বইছিল, তার কোনও ছাপই ওর চেহারায় ফুটে ওঠেনি।

গ্রামে পৌঁছেই হোয়াইট ফ্যাঙ চারপাশটা একবার দেখে নেবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। যে সব বড় বড় কুকুরগুলোকে ও আগে খুব ভয় করে দূরে দূরে পালিয়ে থাকত, এখন আর তাদেরকে ওর মোটেই ততটা ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল না। বিশেষতঃ 'বাসিক' বলে একটা বুড়ো কুকুরকে দেখলে আগে ও ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যেত। এবার এখানে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে বাসিক-এর একেবারে মুখোমুখি লড়াই বেধে গেল। বেশ বড় এক টুক্‌রো মাংস লেগে থাকা হাড় পেয়ে সবে ও একটা ঝোপের আড়ালে বসে সেটাকে খেতে শুরু করেছে, এমন সময় বাসিক সেটা কেড়ে নেওয়ার জন্য হঠাৎ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তার পরের মুহূর্তেই দেখা গেল, বাসিকের কাঁধের দু'জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। হোয়াইট ফ্যাঙ তার নিজস্ব ধরনে বিদ্যুতের গতিতে দুবার প্রতিপক্ষের গায়ে কামড় বসিয়েই লাফিয়ে সরে গেছে। বাসিক বার কয়েক হোয়াইট ফ্যাঙকে ধরবার, কামড়াবার চেষ্টা করল,—কিন্তু তাতে কোনও ফলই হল না। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাছাকাছিই ও যেতে পারছিল না। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ বারবার লাফিয়ে এসে ওর কান, নাক, গলা ফালাফালা করে দিল। দু'একবার মাটিতে গড়াগড়িও খেতে হল বাসিককে। অগত্যা বাসিক এই অতি বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে মানে মানে সরে পড়ল—একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছিল সে। এই ঘটনায় হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সাহস আর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল দারুণ ভাবে। গ্রামের বড় বড় কুকুরদের সঙ্গে ও আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করতে যেত না বটে, কিন্তু তাদেরকে আর ভয় করেও চলত না। দু-একবার ওর সঙ্গে লড়াই-এর অভিজ্ঞতার পর বড় কুকুরগুলোও আর একদম ওকে ঘাঁটাত না। নিঃসঙ্গ হোয়াইট ফ্যাঙও একলা নিজের মনে ঘুরে বেড়াত।

এখানে আসার কয়েক মাস বাদে হঠাৎ হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে ওর মা 'কিচে'র দেখা হয়ে গেল। গ্রামে একটি নতুন পরিবার এসেছিল, তাদের সঙ্গেই এসেছে সে। কিচে এতদিনে ওকে একেবারেই ভুলে গেছিল,—ওর নতুন বাচ্চাদের নিয়েই এখন সে ব্যস্ত। হোয়াইট ফ্যাঙকে দেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গজরে উঠল সে। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কিন্তু এই পরিচিত ভঙ্গি দেখে চট্‌ করে সব মনে পড়ে গেল—তার শৈশব জীবন, মায়ের শাসন—সমস্ত কিছু ওর স্মৃতিতে ভীড় করে এল। আগ্রহ ভরে ও মায়ের কাছে দৌড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই কিচের কাছ থেকে এক প্রচণ্ড কামড় খেয়ে অবাক হয়ে পিছিয়ে এল। ব্যাপারটা কি হল, তা ওর মাথায় ঢুকছিল না। একটা বাচ্চা এগিয়ে এসে ওকে শুঁকতে লাগল। তাই দেখেই কিচে লাফিয়ে এসে

আবার ওকে কামড়ে দিল। কিচের কাছে সে এখন একটা অপরিচিত জানোয়ার, নতুন বাচ্চাগুলো তার কাছে নিরাপদ নয়। বার বার মায়ের কামড় খেয়ে জায়গাটা ছেড়ে সরে পড়ল হোয়াইট ফ্যাঙ, মাদী কুকুর বলে কোনও পাল্টা জবাব দিতে পারল না। তবে, মায়েরও আর কোনও অস্তিত্বই ওর কাছে রইল না। পুরনো স্মৃতি এবার পুরোপুরি ওর মন থেকে মুছে গেল।

ওর তিন বছর বয়সের সময়ে হঠাৎ দেখা দিল নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। গ্রীষ্মকালে নদীতে মাছের ঝাঁকের দেখা পাওয়া গেল না। শীতকালে হরিণের পাল, চমরী গাইয়ের দল, খরগোস—সবই কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। শিকারি, মাংসাশী প্রাণীদের ওপর নেমে এল দারুণ দুঃসময়, অনাহারে অনেকেই মারা পড়তে লাগল। খিদের জ্বালায় একজন আর একজনকে ধরে খেতে শুরু করল, যারা শক্ত সমর্থ, তারাই টিকে রইল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গ্রামের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও হাহাকার পড়ে গেল। বুড়োরা আর দুর্বলরা মরল প্রথম। যেটুকু খাবার পাওয়া যেত তা হাড়সর্বস্ব শিকারিদের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হত,—খালিপেটে তারা শিকারের আশায় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এমনকি তারা নিজেদের পোষা কুকুরগুলোকেও খেতে শুরু করে দিল। কুকুরগুলোও একে অন্যকে খেতে লাগল,—দুর্বল কুকুরগুলো মারা পড়ল আগে। গ্রামে আগুনের চুল্লি জ্বালাও বন্ধ হয়ে এসেছিল প্রায়। ব্যাপার স্যাপার দেখে অনেক কুকুর শেষ পর্যন্ত মনিবদের আশ্রয় ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল—সেখানেও অনেকে হয় কিছু না খেতে পেয়ে মারা গেল, নয়তো বুনো নেকড়ের পেটে গেল। যে সব কুকুর জঙ্গলে পালিয়ে গেল, হোয়াইট ফ্যাঙও তাদের মধ্যে একজন। তবে, ওর অবস্থা অন্য কুকুরদের মতো হল না, কারণ জঙ্গলে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয় তা সে ছোটবেলাতেই খুব ভালভাবে শিখে নিয়েছে। ছোট ছোট প্রাণী কিভাবে শিকার করতে হয়, তা ওর জানা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ও ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে গাছ থেকে নেমে আসা কাঠবেড়ালির জন্য অপেক্ষা করত। তারপরেও সে অধৈর্য হত না—একেবারে শেষ মুহূর্তে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু মুসকিল হল এই যে, কাঠবেড়ালি খুব কমই ওর জন্যে জুটত। খিদের জ্বালায় মাটি খুঁড়ে ইঁদুরও অনেকবার ধরেছে সে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষদের গ্রামের দিকে গিয়ে খাবারের টুকরো চুরি করত, তাদের ফাঁদে পড়া খরগোস ফাঁস কেটে নিজের পেটে চালান করত। একবার তো খোদ ওর নিজের মনিব গ্রে বিভার-এর পাতা ফাঁদ থেকেও খরগোস চুরি করেছিল সে। আর একবার ওরই স্বজাতি একটা কংকালসার রোগা নেকড়ের সঙ্গে ওর মুখোমুখি

দেখা হয়ে গেল। অন্য সময় হলে হয়ত হোয়াইট ফ্যাঙ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নেকড়েদের দলে ফিরে যেত। কিন্তু এখন আর সে সব চিন্তা ওর মধ্যে এল না—নেকড়েটার সঙ্গে লড়াই করে তাকে মেরে খেল সে শেষ পর্যন্ত।

জঙ্গলের এই জীবনে ভাগ্যও ওর প্রতি খানিকটা সদয় ছিল। যখন ও বেশ কয়েকদিন না খেয়ে দুর্বল হয়েপড়ত, তখন কোনও বড় বা শক্তিশালী শিকারি প্রাণীর সামনে ও কখনো পড়ত না। আর অনাহার যখন চরম সীমায় পৌঁছত, তখনই ঠিক কোন-না-কোন ছোট প্রাণী জুটে যেত ওর। একবার একটা পুরো নেকড়ের পাল ওকে তাড়া করেছিল। কিন্তু ঠিক তার আগেই একটা বড় বনবেড়াল মেরে খেয়ে ও তখন বেশ তাজা অবস্থায় ছিল। নেকড়ের পাল ওকে তো ধরতে পারলই না, বরং শেষ পর্যন্ত ঐ অনেকটা ঘুরে পেছন থেকে এসে একটা পিছিয়ে পড়া নেকড়েকে মেরে খেল ও। এরপর ঘুরতে ঘুরতে সে গিয়ে হাজির হল, যে গুহাটাতে সে জন্মেছিল, ঠিক সেখানটিতে। এখানে আবার ওর সঙ্গে ওর মায়ের দেখা হয়ে গেল—ওর মা-ও মানুষের আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য, তার এই প্রথম ছেলের কথা এতদিনে ও একেবারেই ভুলে গেছিল। হোয়াইট ফ্যাঙও আর মায়ের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে আবার পথচলা শুরু করল। এবার ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল ওর পরম শত্রু লিপ্‌লিপ্‌-এর, সেও জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে। না খেতে পেয়ে ওর অবস্থা এতদিনে খুবই কাহিল হয়ে এসেছিল। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ পরপর কয়েকদিন পেট ভরে খেয়েছে, ওর শরীর এখন শক্তিতে ভরপুর। দুজনে দেখা হওয়া মাত্র শুরু হয়ে গেল মরণপণ লড়াই। তবে লড়াই খুবই অল্পক্ষণ চলল, হোয়াইট ফ্যাঙ প্রথম সুযোগেই লিপ্‌লিপ্‌কে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওর কণ্ঠনালী দু' টুক্‌রো করে দিল। তারপর আবার এগিয়ে চলল সামনের দিকে। দু-একদিন চলবার পরেই ও জঙ্গলটার শেষ প্রান্তে এসে দেখল, সামনেই নদীর তীরে ফাঁকা জায়গাটাতে মানুষদের একটা বসতি গড়ে উঠেছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিজেকে আড়ালে রেখে একটু এগিয়ে ও বুঝতে পারল, ওর নিজের পুরনো প্রভুদের কাছেই ও আবার এসে পড়েছে, তারাও আগেকার জায়গা ছেড়ে এসে এখানেই নতুন বসতি গেড়েছে। গ্রাম থেকে যে ধরনের আওয়াজ আর গন্ধ ভেসে আসছিল, তাতে ও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল যে অনাহারের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। মানুষের হাসিঠাট্টা, স্ত্রীলোকের ঝগড়া কানে এল ওর, এ সবই পেট ভরে, তৃপ্তি করে খেতে পাওয়ার একেবারে নির্ভুল প্রমাণ। তাছাড়া, বাতাসে মাছ ভাজার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। আর দ্বিধা না করে ও গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে সোজা চলে গেল গ্রে বিভার-এর তাঁবুতে। ওকে দেখতে পেয়েই গ্রে বিভার-এর গিন্নি 'কুচ-কুচ' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে ওকে ডাকল, একটা টাট্‌কা গোটা মাছ ওকে খেতে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙ নিশ্চিন্ত মনে মাছটা খেতে খেতে মনিব গ্রে বিভার-এর তাঁবুতে ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

তৃতীয় পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাদা ভগবান

লিপ্‌লিপ্‌ না থাকায় এবার হোয়াইট ফ্যাঙই হল মিত্‌সার স্লেজগাড়ির কুকুরবাহিনীর দলপতি। এর ফলে অন্যান্য কুকুরদের ওপর ওর বিদ্বেষ আর শত্রুতা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছল। দলের আগে আগে দৌড়ত বলে অন্য কুকুরগুলো মনে করত, হোয়াইট ফ্যাঙ নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। সব সময়েই তারা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর পেছনের দিকটা দেখতে পেত—তাই ওর হিংস্র চেহারাটা আর ওদের সামনে তখন ফুটে উঠত না। স্লেজ চলতে শুরু করলেই সব কটা কুকুর একসঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত। হোয়াইট ফ্যাঙ যে ঘুরে গিয়ে ওদেরকে কামড়াবে, তারও উপায় ছিল না, কারণ তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মিত্‌সার হাতের চামড়ার চাবুক এসে পড়বে ওর মুখে। অগত্যা প্রতিশোধ নেওয়ায় জ্বলন্ত ইচ্ছে মনেই চেপে রেখে হোয়াইট ফ্যাঙকে ছুটে চলতে হত। তবে, দিনের শেষে স্লেজগাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থাটা যেত বদলে। অন্য কুকুরগুলো তখন যেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেত, তখুনি মিত্‌সার হাতের চাবুক এবার তাদেরই ওপর এসে আছড়ে পড়ত। হোয়াইট ফ্যাঙও তখন তার সারাদিনের জমে থাকা রাগ ও ঘৃণা উজাড় করে দিত ওদের ওপরে। বলা বাহুল্য, কোনও সময়ে কোনও কুকুরই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারত না। এভাবে হায়াইট ফ্যাঙ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল তার স্বজাতি কুকুরদেরই চরমতম শত্রু।

হোয়াইট ফ্যাঙ-এর বয়স যখন পাঁচ, তখন গ্রে বিভার ওকে নিয়ে আর একবার লম্বা সফরে বেরিয়ে পড়ল, এবার তার লক্ষ্য 'ইউকন ফোর্ট'। হোয়াইট ফ্যাঙ এতদিনে একটা নিখুঁত লড়াইবাজ কুকুর হয়ে উঠেছিল। অন্য কুকুরদের সঙ্গে লড়াই বাধলে তারা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই হোয়াইট ফ্যাঙ তাদের কণ্ঠনালীটি দু'টুক্‌রো করে দিত—কারণ সাধারণ কুকুরদের মতো লড়াইয়ের আগে তর্জন গর্জন করে ও কোনরকম সময় নষ্ট করত না। তাছাড়া, অন্য কোনও কুকুরের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগিয়ে বেশিক্ষণ লড়াই করাটাকে ও একেবারে বরদাস্ত করতে পারত না—ওর স্বভাবে বুনো নেক্‌ড়েদের এই আদিম প্রবৃত্তিটা পুরোপুরি ফুটে উঠেছিল। কোনো

কিছুর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই যেন ফাঁদে আট্‌কা পড়ার একটা অজানা আতঙ্ক ওর অবচেতন মনে জেগে উঠত। তাই অন্যান্য কুকুররা যতক্ষণ লড়াইয়ের পাঁয়তাড়া কষত, ততক্ষণে ও বিদ্যুত চমকের মতো লাফিয়ে এসে কামড় বসিয়ে আবার দূরে সরে যেত। ক্ষিপ্রতা, হিংস্রতা, শক্তি আর চাতুর্য সব দিক দিয়েই হোয়াইট ফ্যাঙ হয়ে উঠল এক অসাধারণ, অতুলনীয় কুকুর।

গ্রে বিভার শেষ পর্যন্ত যখন 'ইউকন ফোর্ট'-এ এসে পেঁছিল, তখন গ্রীষ্মকাল। এখানেই হায়াইট ফ্যাঙ জীবনে প্রথমবার সাদা চামড়ার দু'পেয়ে ভগবানদের দেখল। ১৮৯৮ সালের গ্রীষ্মকাল—'গোল্ড রাশ' বা সোনা খোঁজার উন্মাদ অভিযান শুরু হয়ে গেছে। হাজার ভাগ্যান্বেষীর দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসে ইউকন থেকে 'ডসন' গিয়ে 'ক্লনডাইক' অঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। গ্রে বিভার এই অভিযানের কথা আগেই শুনতে পেয়েছিল, তাই সে মোটা দাঁও মারবার জন্যে বহু পরিমাণে 'ফার' চামড়ার দস্তানা আর পায়ের জুতোর উপযোগী 'মোকাসিন' সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। এই সব জিনিস বেচে ওর যা লাভ হতে লাগল, তা ওর স্বপ্নেরও বাইরে ছিল। তাই ও বহুদিন এখানে থেকে সব মালই বেচে দিয়ে যাবে ঠিক করল।

সাদা চামড়ার দু-পেয়েদের দেখে প্রথমেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মনে হল, যে সব দু-পেয়েদের মধ্যে এতদিন সে থেকেছে, তার চাইতে এরা অনেক বেশি শক্তিশালী আর উৎকৃষ্ট ধরনের জীব। কোনরকম যুক্তিতর্ক বা চিন্তা ভাবনা করে হোয়াইট ফ্যাঙ এই সিদ্ধান্তে পেঁছয়নি, কিন্তু তার সহজাত অনুভূতিই যেন তাকে জানিয়ে দিল, এই সাদা চামড়ার ভগবানদের কাছে তার মনিব ভগবান গ্রে বিভার শক্তিতে একটা শিশুর চাইতে বেশি নয়। একদিন একটা সাদা চামড়ার দুপেয়ে ছ বার রিভলবার চালিয়ে ছটা স্থানীয় কুকুরকে মেরে ফেলেছিল। হোয়াইট ফ্যাঙ এরকম আগুন-ঝরা অস্ত্র আগে কখনো দেখেনি। তাছাড়া, সাদা চামড়ার দুপেয়েদের থাকার জারগুলোও আকারে অনেক বিরাট আর শক্ত জিনিস দিয়ে তৈরি। কাপড়ের তৈরি তাঁবু নয়। দু তিনদিন বাদে যে সব বিশাল 'স্টীমার' বিকট ভোঁ করে ফোর্ট ইউকন-এ আসত, সেগুলোও এক আজব জিনিস। সব মিলিয়ে, এই সাদা চামড়ার দুপেয়ে ভগবানেরা যে অনেক বেশি উচ্চস্তরের জীব, তা হোয়াইট ফ্যাঙ খুব ভালভাবেই বুঝে গেল। তবে, এই সাদা দু-পেয়েদের পোষা কুকুরগুলো কিন্তু একেবারেই অপদার্থ, সেগুলো দেখতেও যেমন অদ্ভুত, লড়াইয়েও তেমনি কাঁচা। সেগুলো অবশ্য হোয়াইট ফ্যাঙকে দেখলেই লড়াই করতে ছুটে আসত। ওকে দেখে তারা নেকড়ে ছাড়া আর কিছু

ভাবত না, আর নেকড়েদের ওপর বিদ্বেষ তাদের রক্তের মধ্যে বহু পুরুষ ধরে বইছে। বলা বাহুল্য, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাছে মারা পড়ত তারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পিশাচ প্রভুর কবলে

ইউকন ফোর্টে যে সব সাদা চামড়ার লোক ছিল, তাদের মধ্যে 'সুন্দর স্মিথ' বা 'বিউটি স্মিথ' ছিল সবচাইতে ঘৃণ্য স্বভাবের। হতকুৎসিত, অতি কদাকার চেহারার জন্যই ওর বন্ধুরা ঠাট্টা করে ওকে বিউটি স্মিথ বলে ডাকত। চেহারা আর স্বভাবে এরকম নিখুঁত মিল বড় একটা দেখা যায় না। লোকটা ছিল অতি নিষ্ঠুর, বিকৃতমনা, আর ভীরু স্বভাবের—এক কথায়, একটি মনুষ্যদেহী পিশাচ। তবে, রান্না করতে ভালো জানত বলে ওকে 'ফোর্টের' অন্যান্য লোকেরা সহ্য করে যেত, কারণ ফোর্টের একমাত্র রাঁধুনি ছিল এই বিউটি স্মিথ। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ওপর বিউটি স্মিথ-এর নজর পড়েছিল প্রথম থেকেই। যখনই হোয়াইট ফ্যাঙ অন্যান্য কুকুরদের সঙ্গে লড়াই করত, তখনই সে দৌড়ে আসত সেই লড়াই দেখতে, আর কি এক বিকৃত উত্তেজনায় একেবারে অস্থির হয়ে উঠত। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টাও তার ছিল খুবই। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ লোকটাকে একেবারেই সহ্য করতে পারত না, লোকটা ওর কাছাকাছি এলেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গজরাতে গজরাতে সরে যেত। পচা ডোবা থেকে যেরকম দুর্গন্ধের বাষ্প বেরোয়, লোকটার বিকৃত মন আর শরীর থেকেও যেন সেরকম একটা অস্বাস্থ্যকর গন্ধ তার সমস্ত চেতনাকে বিদ্রোহী করে তুলত। নিজের ভেতরের কোনও এক অচেনা, অজানা অনুভূতি দিয়ে যেন হোয়াইট ফ্যাঙ পরিষ্কার বুঝে গেছিল যে এই লোকটা একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানের দূত, এর কাছ থেকে যতটা পারা যায় দূরে থাকাই ভালো।

বিউটি স্মিথ-এর কিন্তু মতলব ছিল অন্যরকম। ও একদিন সোজা এসে হাজির হল গ্রে বিভার-এর তাঁবুতে, আর ভালো দাম দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে কিনে নিতে চাইল। প্রথমটায় অবশ্য গ্রে বিভার এ ধরনের প্রস্তাবে কানই দেয়নি। ব্যবসা করে এখন তার হাতে অনেক পয়সা জমেছিল, আর তার পয়সার কোনও দরকার ছিল না। তাছাড়া, হোয়াইট ফ্যাঙ ছিল ওর কুকুরদের মধ্যে সবচাইতে শক্তসমর্থ আর পরিশ্রমী। ঐ তল্লাটে ওর মতো কুকুর আর একটিও ছিল না। তাই কোনো দামেই

গ্রে বিভার হোয়াইট ফ্যাঙকে বেচতে রাজি হল না। কিন্তু বিউটি স্মিথ এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তাছাড়া, রেড ইণ্ডিয়ানদের কি করে বশে আনতে হয়—সেটা ওর খুব ভালভাবেই জানা ছিল। ও প্রায়ই গ্রে বিভার-এর সঙ্গে দেখা করতে লাগল। সব সময়েই ওর সঙ্গে থাকত খুব কড়া হুইস্কির একটা বড় বোতল। কিছুদিন যেতে না যেতেই গ্রে বিভার পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল—সব সময়েই সে হুইস্কির মধ্যে ডুবে থাকতে লাগল। যত পয়সা সে এতদিন কামিয়েছিল, সবই একটু একটু করে চলে গেল হুইস্কির পেছনে। শেষে এমন সময় এল, যখন গ্রে বিভার একেবারে কপর্দকশূন্য। কিন্তু হুইস্কির নেশায় তখন তার সব বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পেয়েছে,—যে করেই হোক, হুইস্কি তার চাই-ই। বিউটি স্মিথ ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তাল বুঝে আবার ও হোয়াইট ফ্যাঙকে কিনতে চাইল—তবে পয়সা দিয়ে নয়, কয়েক বোতল হুইস্কির বিনিময়ে। এখন আর গ্রে বিভারের 'না' বলার মতো মনের জোর বা ইচ্ছে ছিল না। বোতলগুলো নিয়ে ও এবার বিউটি স্মিথকে জানাল—'ওহে, যদি কুকুরটাকে ধরতে পার তো নিয়ে যাও।' হোয়াইট ফ্যাঙকে কব্জা করা যে ওর নিজের সাধ্যে নেই, তা বিউটি স্মিথ এতদিনে ভালো করেই বুঝে গেছিল। কিন্তু এটাও সে বুঝে গেছিল যে, গ্রে বিভার এখন পুরোপুরি বোতলের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে, এবার ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো যাবে। তাই দু'দিন পরে বিউটি স্মিথই গ্রে বিভারকে বলে উঠল—'ওহে, তুমিই কুকুরটাকে বেঁধে আমার হাতে তুলে দাও তো দেখি!'

এর দু-একদিন বাদে হোয়াইট ফ্যাঙ বেশ নিশ্চিন্ত মনে তাঁবুতে শুয়ে ছিল। সেদিন সেই সাদা দুপেয়েরা আসেনি। গত কয়েকদিন ধরে ঐ লোকটা সমানে তার গায়ে হাত বুলিয়ে কি সব করবার চেষ্টা করছিল। তাই হোয়াইট ফ্যাঙ ওকে এড়িয়ে চলবার জন্য তাঁবুর বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত। ঐ লোকটাকে দেখলেই কি যেন অজানা বিপদের আশঙ্কায় হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মন ভরে উঠ্‌ত—তাই ও তার কাছাকাছি থাকতেই চাইত না। যাইহোক, এদিন কিন্তু খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবার পর গ্রে বিভার এসে একটা চামড়ার দড়ি ওর গলায় বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর একহাতে হুইস্কির বোতল আর অন্যহাতে দড়িটা ধরে বসে বসে মাংস খেতে লাগল। একটু পরেই হোয়াইট ফ্যাঙ সেই পরিচিত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল—মুখে কুটিল হাসি নিয়ে তাঁবুতে এসে ঢুকল বিউটি স্মিথ। হোয়াইট ফ্যাঙ আস্তে আস্তে দড়িটা মনিবের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে গেল, কিন্তু পারল না।—গ্রে বিভার দড়িটাকে শক্ত করে ধরে বসে রইল। ওর হিংস্র হাবভাব দেখে আর গজরানি

শুনে বিউটি স্মিথ বেরিয়ে গিয়ে একটা মোটা আর বড়সড় দেখে লাঠি নিয়ে এল। তারপর গ্রে বিভারের হাত থেকে চামড়ার দড়িটা নিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে টেনে তাঁবুর বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। দড়িতে টান পড়ল, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ একচুলও নড়ল না। গ্রে বিভার ওকে দোহাত্তা চড়চাপড় মেরে ওঠাবার চেষ্টা করল। মনিবের কথা মেনে হোয়াইট ফ্যাঙ দাঁড়িয়ে উঠল বটে কিন্তু তারপরেই দৌড়ে একটা লাফ মেরে গিয়ে বিউটি স্মিথ-এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। তবে, বিউটি স্মিথ এর জন্য তৈরিই ছিল। সে মোটা লাঠিগাছটা সজোরে ঘুরিয়ে মেরে হোয়াইট ফ্যাঙকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর আবার ওর গলার দড়িতে টান মেরে চলতে শুরু করল। টলতে টলতে অর্ধচেতন অবস্থায় কোনরকমে উঠে দাঁড়াল হোয়াইট ফ্যাঙ। আর সে বিউটি স্মিথ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল না—তাতে যে কোনো লাভ নেই, সেটা সে বুঝে গেছিল ভালভাবেই। গলার মধ্যে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে বিউটি স্মিথ-এর ডেরায় গিয়ে পেঁছিল সে। কিন্তু বিউটি স্মিথ ওকে শক্ত করে বেঁধে ঘুমোতে যাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যেই দাঁত দিয়ে চামড়ার দড়িটা কেটে ফেলল হোয়াইট ফ্যাঙ, তারপর ফিরে গেল গ্রে বিভার-এর তাঁবুতে। এই ভয়ানক, অদ্ভুত লোকটা তার কেউ নয়—একমাত্র গ্রে বিভারকেই সে প্রভু বলে জানে। তার ওপরেই সে নিজের সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু মূর্খ, প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত জানোয়ার সে—প্রভুর জাত মানুষের কাছে যে এই বিশ্বাসের কোনো মূল্যই নেই তা সে কি করে জানবে? তাই, পরের দিন সকালেই গ্রে বিভার আবার তাকে বেঁধে বিউটি স্মিথ-এর হাতে তুলে দিল। আবার বিউটি স্মিথ তাকে নিয়ে গেল নিজের ডেরায়। তবে, তার আগে হোয়াইট ফ্যাঙকে সে লাঠি আর চাবুক দিয়ে নৃশংস ভাবে বেদম মার মারল,—অসহায় ভাবে, বাঁধা অবস্থায় পড়ে পড়ে মার খেল হোয়াইট ফ্যাঙ। আঘাতের যন্ত্রণায় ও যত তীব্র আর্তনাদ করতে লাগল, বিকৃতমনা বিউটি স্মিথ ততই যেন উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইল। আসলে লোকটা ছিল একেবারে নিকৃষ্টতম ভীরু, তাই নিজের চাইতে দুর্বলতর, অসহায় প্রাণীদের যন্ত্রণা দিয়ে ও একটা পাশবিক আনন্দ পেত। গ্রে বিভার অবিচলিত ভাবে তার এই বিশ্বস্ত পোষা জীবের দুর্দশা উপভোগ করল। হোয়াইট ফ্যাঙ তো আর এখন তার কেউ নয়, কাজেই তার আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেদিন রাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থাতেও আবার হোয়াইট ফ্যাঙ ফিরে এল গ্রে বিভার-এর কাছেই—তার আসল প্রভুকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। যে বিশ্বস্ততা, অন্ধ প্রভুভক্তি তার জাতের সহজাত ধর্ম, পুরুষানুক্রমে স্বভাবের প্রতিটি অনু পরমাণুতে যে বৈশিষ্ট্য মিশে আছে,—তা সে ভুলে যাবে কি

করে? ফলে, আবার সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটল পরের দিন। এবার যে মারটা হোয়াইট ফ্যাঙ বিউটি স্মিথ-এর কাছে খেল, অন্য কোনো কুকুর হলে সে নির্ঘাত মরে যেত। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ অনেক বেশি শক্ত ধাতুতে গড়া। সে বড় হয়ে উঠেছে বনে জঙ্গলে বুনো বেড়াল আর বেঁজীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, কঠোর জীবন-সংগ্রাম করে। তাই এত মার খেয়েও সে মরল না। তবে বহুক্ষণ মড়ার মতো পড়ে রইল সে,—তার নড়াচড়ারও ক্ষমতা রইল না। তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার নতুন মনিব, এক মানসিক বিকারগ্রস্ত নরদেহী পিশাচের ডেরায় ফিরে গেল সে। এবার বিউটি স্মিথ তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল, যাতে আর সে পালাতে না পারে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও আর সে বাঁধন ছাড়াতে পারল না হোয়াইট ফ্যাঙ। আস্তে আস্তে মেনে নিতে হল যে, এই উন্মাদ, নিষ্ঠুর মানুষ ভগবানটিই তার প্রভু, এর কথাই তাকে মেনে চলতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরকের আগুন

নরপিশাচ মনিব বিউটি স্মিথ-এর কাছে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিনগুলো কাটতে লাগল যেন একটা নারকীয়, বীভৎস দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। সে নিজেও আস্তে আস্তে হয়ে উঠ্‌ল সাক্ষাৎ এক শয়তানের অনুচর। অন্তহীন ঘৃণা আর হিংস্রতা ছাড়া আর সব মনোবৃত্তি তার ভেতর থেকে মুছে গেল। মস্ত বড় একটা খোঁয়াড়ের ভেতর চেন দিয়ে বাঁধা থাকত হোয়াইট ফ্যাঙ, আর বিউটি স্মিথ প্রায়ই এসে ওকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখত। কেউ ওকে নিয়ে হাসাহাসি করছে এটা হোয়াইট ফ্যাঙ কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। বিউটি স্মিথ ওর এই দুর্বলতার কথা খুব ভালভাবেই জানত। তাই ও প্রায়ই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর খোঁয়াড়ের সামনে এসে দাঁড়াত আর ওর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসত। এই সব সময়ে হোয়াইট ফ্যাঙ অন্ধ অর্থহীন রাগে যেন পাগল হয়ে যেত—কোনরকম বোধশক্তি আর তার মধ্যে থাকত না। দিনের পর দিন একই ব্যাপার চলতে থাকার ফলে হোয়াইট ফ্যাঙ ওর চারপাশের প্রতিটি জিনিস, প্রত্যেকটি মানুষকেই ওর শত্রু বলে মনে করতে লাগল। তবে ওর কাছে সবচাইতে বড় শত্রু আর ঘৃণ্য জীব হয়ে উঠ্‌ল ওর মনিব, বিউটি স্মিথ।

ওর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করার পেছনে অবশ্য বিউটি স্মিথ-এর একটা গভীর উদ্দেশ্য ছিল। একদিন দেখা গেল, বেশ কিছু লোক ওর খোঁয়াড়ের চারদিকে জড়

হয়েছে। বিউটি স্মিথ হাতে একটা লাঠি নিয়ে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঢুকে ওর গলার শেকলটা খুলে দিল। তারপর স্মিথ খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেল, আর হোয়াইট ফ্যাঙ নিজেকে খোলা পেয়ে প্রচণ্ড রাগে বারে বারে খাঁচার শিকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইল, ওর চেহারাখানাও এখন দেখবার মতোই হয়ে উঠেছিল—পুরো পাঁচ ফুট লম্বা, আড়াই ফুট উঁচু প্রকাণ্ড শরীরে শক্তি আর একটা ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। পুরো নব্বুই পাউণ্ড ওজনের দেহে কোথাও একফোঁটা বাড়তি চর্বি বা মেদ ছিল না।

খোঁয়াড়ের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল আবার। হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝতে পারল, নতুন কোনো কিছু একটা ঘটতে চলেছে। একটা প্রকাণ্ড 'ম্যাণ্টিফ' কুকুরকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে খোঁয়াড়ের দরজাটা আবার আট্‌কে দেওয়া হল। এ রকম ধরনের কুকুর হোয়াইট ফ্যাঙ আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু এতে হোয়াইট ফ্যাঙ ঘাবড়ে গেল না মোটেই বরং গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্য একটা জীবন্ত প্রাণী পেয়ে ও যেন বিদ্যুত চমকের মতো আগন্তুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ম্যাণ্টিফ কিছু বুঝতে পারার আগেই দেখা গেল, তার ঘাড়ের একটা দিকের বেশ খানিকটা জায়গা ফালা-ফালা হয়ে গেছে। ম্যাণ্টিফটা রেগে গর্জন করে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু কোথায় হোয়াইট ফ্যাঙ? হোয়াইট ফ্যাঙ একেবারে চরকির মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল—তাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়াই যাচ্ছিল না। সে লাফিয়ে এসে কামড় বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার লাফিয়ে দূরে সরে যাচ্ছিল, যাতে নিজের গায়ে কোনো আঘাত না লাগে। খোঁয়াড়ের বাইরে যে সব দর্শক জমায়েত হয়েছিল, তারা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর লড়াই-এর কায়দা দেখে চীৎকার করে বাহবা দিচ্ছিল। বিউটি স্মিথ তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই ম্যাণ্টিফটার অবস্থা এত সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌ল যে, তার মালিক কোনরকমে তাকে বাইরে বার করে নিয়ে গেল। যারা বাজি ধরেছিল তারা পয়সাকড়ির লেনদেন করল—বিউটি স্মিথ-এর হাতেও এল বেশ কিছু টাকা।

এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই একই ব্যাপার ঘটতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙও এইসব লড়াইগুলোর জন্য অস্থির হয়ে থাকত। এই লড়াইগুলোই এখন তার জীবনী-শক্তি প্রকাশের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে তীব্র ঘৃণায় ও সারাক্ষণ জ্বলত, তা মেটানোর একমাত্র রাস্তাও ছিল এই লড়াইগুলো। এবং প্রতিটি লড়াইয়েই সে-ই জিতবেই—এটাই ছিল নিয়ম। ওর অসাধরণ ক্ষমতা বিউটি স্মিথ বুঝতে পেরেছিল খুব ভালো করেই, আর সেই সুযোগটা স্মিথ খুব ভালভাবেই

পয়সা রোজগারের কাজে লাগিয়েছিল। একদিন পর পর তিনটে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে হল হোয়াইট ফ্যাঙকে। এরপর তার সামনে ঠেলে দেওয়া হল জঙ্গল থেকে সদ্য ধরে আনা একটা খাঁটি বুনো নেক্‌ড়ে। এখানেই শেষ নয়। এর পরে একসঙ্গে দুটো কুকুরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার খোঁয়াড়ে। এইদিনই হোয়াইট ফ্যাঙকে দারুণ কঠিন লড়াই করতে হল। শেষ পর্যন্ত দুটো কুকুরই তার কাছে মারা পড়ল বটে, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ নিজেও প্রায় মরতে বসেছিল সেদিন।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিউটি স্মিথ হোয়াইট ফ্যাঙকে নিয়ে স্টীমারে চড়ে ইউকন থেকে ডসন-এর দিকে পাড়ি জমাল। এতদিনে 'লড়াইবাজ নেক্‌ড়ে'—এই নামে হোয়াইট ফ্যাঙ ঐ তল্লাটে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। স্টীমারে যে খাঁচায় তাকে রাখা হয়েছিল, তার চারদিকে প্রায় সব সময়েই উৎসুক লোকজনের ভীড় লেগে থাকত। হোয়াইট ফ্যাঙ-ও বুকভরা ঘৃণা নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে কখনো গজ্‌রাত, কখনো বা চুপ করে শুয়ে থাকত। অনেকে আবার খাঁচার ফাঁক দিয়ে কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে ক্ষেপাত, ওয় গজ্‌রানি শুনে হাসত। জীবনটা তার কাছে হয়ে উঠ্‌ল পুরোপুরি নরকবাসের মতো যন্ত্রণাময়। অন্য কোনও কুকুর হলে হয়ত এতদিনে মরেই যেত, কিংবা একেবারে ভেঙে পড়ে নির্জীব হয়ে যেত। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ ছিল অন্য ধাতুতে গড়া, অসাধারণ ছিল তার প্রাণশক্তি। তাই এই জীবনযাত্রার সঙ্গেও সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল, তবে তার হিংস্রতা পেঁাছে গেল একেবারে চরম সীমায়। এমনকি সাক্ষাৎ শয়তান বিউটি স্মিথ-ও তাকে বাগ মানাতে পারল না। স্মিথকে দেখলেই অন্ধ, যুক্তিহীন রাগে হোয়াইট ফ্যাঙ যেন একেবারে পাগল হয়ে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যেত। বেদম লাঠিপেটা করে স্মিথ ওকে শুইয়ে দিত বটে, কিন্তু ওর গজ্‌রানি থামাতে পারত না কিছুতেই।

কিছুদিন বাদে ওরা গিয়ে ডসন-এ নামল। এখানেও তাকে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হল—লোকেরা পঞ্চাশ সেণ্ট দর্শনী দিয়ে এই 'লড়াইবাজ নেক্‌ড়ে'টাকে দেখতে ভীড় করত। ওকে বিশ্রাম করতেও দেওয়া হত না—ঘুমিয়ে পড়লে সরু লাঠির খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলা হত। তাছাড়া প্রায় সব সময়েই ওকে ক্ষেপিয়ে এক ভয়াবহ, হিংস্র জীব করে রাখা হত। যাতে দর্শকরা তাদের দর্শনীর পয়সাটা পুরোপুরি উশুল করতে পারে। আর মাঝে মাঝেই রাতের অন্ধকারে তাকে শহরের বাইরে কোনো নির্জন জায়গায় অন্য কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে নিয়ে যাওয়া হত। লড়াইটা হত খুব ভোরবেলায়, যাতে স্থানীয় পুলিশ কিছু টের না পায়। বহু জাতের বহু ধরনের কুকুরের সঙ্গে লড়তে হল তাকে আর

বলা বাহুল্য, প্রতিবারই সে জিতল। ওর লড়াই করার কায়দা, চাতুরী আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে কেউই এঁটে উঠতে পারত না। শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে লড়াই করবার মতো কুকুরই আর ও তল্লাটে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। এখন ওকে লড়াই করতে হত রেড ইণ্ডিয়ানদের ফাঁদে ধরা পড়া নেক্‌ড়েদের সঙ্গে। একবার একটা মাদী বনবেড়ালের সঙ্গেও লড়তে হল তাকে। এই লড়াইটাই ছিল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কঠিনতম অপর হিংস্রতম লড়াই, কারণ মাদী বনবেড়ালের চাইতে বেশি বদ্‌মেজাজী আর দ্রুতগামী প্রাণী জঙ্গলের দুনিয়াতেও খুব কমই আছে। বনবেড়ালটাকে মারবার পর হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে লড়াই করবার মতো আর কোনো জানোয়ারই পাওয়া যাচ্ছিল না। বেশ কয়েকমাস এইভাবে যাওয়ার পর 'টিম কিনান' নামে এক ব্যবসায়ী ডসন-এ এসে হাজির হল। তার সঙ্গে এল একটা 'বুলডগ'। ক্লনডাইক অঞ্চলে এর আগে কোনও বুলডগ কখনো আসেনি। কাজে কাজেই খুব শিগগিরই অবধারিত ভাবেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে তার লড়াই-এর দিনটা ঠিক হয়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৃত্যুর হাতছানি

বিউটি স্মিথ হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গলা থেকে শেকলটা খুলে নিয়ে সরে এল। হোয়াইট ফ্যাঙ কিন্তু অন্যান্য বারের মতো সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখতে লাগল। এ রকম আশ্চর্য ধরনের কুকুর সে আগে কখনো দেখেনি। টিম কিনান বুলডগটাকে লড়াইয়ের জায়গার মাঝখানটায় ঠেলে দিয়ে বলল—'চিরোকি, যাঃ লেগে যা। শুরু কর।'

চিরোকির মধ্যে কিন্তু লড়াই করবার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। সে বেশ খুশি মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ছোট্ট ল্যাজখানা নাড়তে লাগল। একেই সে একটু কুঁড়ে স্বভাবের, তার ওপর সে-ও হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মতো কুকুর আগে কখনো দেখেনি। সে ভাবছিল যে, এবার বোধহয় অন্য একটা সত্যিকারের কুকুর আসবে। অগত্যা টিম কিনান ওর ঘাড়ের পেছনের রোঁয়ার মধ্যে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ওকে উত্তেজিত করে তুলল। ওর গলার মধ্যে থেকে বেরোতে লাগল চাপা গজ্‌রানি। ওর গজ্‌রানি শুনে উত্তেজনায় হোয়াইট ফ্যাঙ-এরও ঘাড়ের আর গলার রোঁয়া শক্ত হয়ে উঠ্‌ল। এবার চিরোকি দৌড়ে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিকে, হোয়াইট ফ্যাঙ-ও যথারীতি চোখের নিমেষে ওর কানের পেছনে মোটা ঘাড়ের ওপর এক কামড় বসিয়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে গেল। এর পর দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল

এক মরণপণ লড়াই। দুজনের কেউই এরকম ধরনের লড়াই আগে কখনো লড়েনি। হোয়াইট ফ্যাঙ বারবার বুলডগটাকে কাম্‌ড়ে ফালাফালা করে দিতে লাগল বটে, কিন্তু বুলডগটা তাতে দমে না গিয়ে নিঃশব্দে সমানে ওকে তাড়া করে ঘুরতে লাগল, কিছুতেই থামল না, অন্যান্য কুকুরদের মতো চীৎকার চেঁচামেচিও করল না। ও এত বেঁটে আর নিরেট যে হোয়াইট ফ্যাঙ ওর কণ্ঠনালীতে কামড় বসাতে পারছিল না। তাছাড়া বুলডগটার বিরাট ভারী বড় চোয়ালও এতেবাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। চিরোকিও খুব মুস্কিলেই পড়েছিল, কারণ অন্যান্য কুকুরদের মতো হোয়াইট ফ্যাঙ কাছে এসে জাপ্‌টাজাপ্‌টি, কামড়াকামড়ি করছিল না। দূর থেকে লাফিয়ে এসে কামড় বসিয়ে আবার দূরে সরে যাচ্ছিল। তাই চিরোকিও হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কণ্ঠনালীতে কামড় বসাতে পারছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে লড়াই চলল। তারপরেই হোয়াইট ফ্যাঙ একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলল। ও নিজের পুরনো কায়দা মতো চিরোকির কাঁধে ধাক্কা মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু চিরোকি ওর চাইতে এত বেশি বেঁটে যে ওর কাঁধের সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাঁধ ঠিকমতো লাগছিল না। একবার এইভাবে খুব জোরে ধাক্কা মারতে গিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ চিরোকির কাঁধের ওপর দিয়ে পিছলে অন্যদিকে বেরিয়ে গিয়ে সজোরে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ও অবশ্য আবার উঠে দাঁড়াল কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই চিরোকির ভয়াবহ চোয়াল দুখানা জাঁতাকলের মতো ওর কণ্ঠনালীর বেশ খানিকটা নিচে চেপে বসে গেল। হোয়াইট ফ্যাঙ লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে দৌড়ে বেড়াতে লাগল বটে, কিন্তু কিছুতেই বুলডগটার কামড় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল না। বুলডগটা ঠিক ওর গলার নিচটা কাম্‌ড়ে ধরে ঝুলে রইল। কুকুরটার সারা শরীর ধাক্কা লেগে থেঁতলে যেতে লাগল, কিন্তু তাতে ও ভ্রূক্ষেপও করল না। যে মুহূর্তে হোয়াইট ফ্যাঙ ক্লান্ত হয়ে থেমে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তেই চিরোকি একটুখানি করে চোয়াল দুটোকে নাড়িয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কণ্ঠনালীর ওপর দিকটায় ওঠাচ্ছিল। একটু একটু করে খাবার চিবানোর মতো করে ও হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কণ্ঠনালীর চামড়া আর রোঁয়াগুলোকে বেশি করে কাম্‌ড়ে ধরছিল। ভয়ে আতঙ্কে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর বুদ্ধি শুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়ে গেল—ফাঁদে আট্‌কা পড়ার সেই আদিম বন্য ভীতি আবার ওর সমস্ত চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। গলায় আট্‌কে থাকা শত্রুর যতটুকু ও নিজের নাগালের মধ্যে পেল, ততটুকুই ও কামড়ে ফালাফালা করে দিতে লাগল। কিন্তু ঐ ভয়াবহ কামড়ের ফাঁস ওর গলা থেকে একটুও সরল না, বরং আস্তে আস্তে

বেড়ে গিয়ে একটু একটু করে ওর দম বন্ধ করে দিতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর এখন নিঃশ্বাস নিতে ক্রমশঃই বেশি কষ্ট হচ্ছিল! বিউটি স্মিথ এবার ওর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল—ও জানত, হোয়াইট ফ্যাঙকে তাতিয়ে তোলবার এটাই মোক্ষম অস্ত্র। হলও তাই, রাগে অন্ধ হয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে একবার শেষ চেষ্টা করল। শরীরের শেষবিন্দু শক্তি দিয়েও আবার চিরোকিকে গলা থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করল। বার বার করে ও দৌড়তে চেষ্টা করল, আর মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়ল সে। চিরোকি এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। সে এবার ধীরে সুস্থে একটু একটু করে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কণ্ঠনালীতে চাপ বাড়িয়েই চলল। দর্শকরা এতক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে, হোয়াইট ফ্যাঙ-এর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। চিরোকির ওপর যারা বাজী ধরল, উল্লাসে ফেটে পড়ল তারা। রাগে, হতাশায় বিউটি স্মিথ-এর পাশবিকতা এবার চরম পর্যায়ে পেঁছে গেল—রিং-এ ঢুকে পড়ে হোয়াইট ফ্যাঙ-কে সমানে লাথি মারতে লাগল সে। হোয়াইট ফ্যাঙ এতক্ষণে প্রায় স্থির হয়ে এসেছিল—মাঝে মাঝে দুর্বল ভাবে একটু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বিউটি স্মিথ-এর বর্বরতা দেখে দর্শকদের মধ্যে প্রতিবাদের একটা গুঞ্জন উঠল বটে, কিন্তু কেউই তাকে বাধা দিতে এগিয়ে এল না। হঠাৎ এই সময় অদূরে একটা স্লেজ গাড়ি এসে থামল। দুজন লোক সেটা থেকে নেমে দেখতে এল কি ঘটছে। স্লেজ চালকের চেহারাটা বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা। তার সঙ্গীটি তরুণ, লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, অভিজাত চেহারার। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। দর্শকদের ভিড় ঠেলে রিং-এর মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপরেই তার এক প্রচণ্ড ঘুষিতে বিউটি স্মিথ আছড়ে পড়ল মাটিতে। কোনরকমে দাঁড়িয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালে আর একটা মারাত্মক ঘুষি খেয়ে বিউটি স্মিথ যেন বাতাসে ভেসে গিয়ে দূরে ছিটকে ধরাশায়ী হল। আর উঠে দাঁড়াবার সাহস হল না তার। আগন্তুক এবার স্লেজ চালককে ডেকে বলল—'ম্যাট, এদিকে চলে এসো চট্‌পট্‌। হাত লাগাও। দুজনে মিলে এবার কুকুর দুটোর ওপর ঝুঁকে পড়ল। ম্যাট নামে লোকটি হোয়াইট ফ্যাঙকে ধরে রইল, আর আগন্তুক বুলডগটার চোয়াল দুটো ধরে টেনে ফাঁক করবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ এই রকম উট্‌কো ঝামেলা এসে হাজির হওয়াতে দর্শকদের মধ্যে অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। কিন্তু আগন্তুকের রুদ্রমূর্তি দেখে কারোরই আর কিছু বলার সাহস হল না। ওদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আগন্তুক গর্জে উঠল—'জানোয়ারের দল কোথাকার।' কিন্তু

শত টানাটানি করেও বুলডগটার চোয়ালটা সে একটুও আলগা করতে পারল না। কুকুরটার মাথায় বার বার জোরে বাড়ি মেরেও কোনো ফল হল না। চিরোকির লেজের টুকরোটা কিন্তু সমানে নড়েই যাচ্ছিল—সে যেন জানাতে চাইছিল, এই মারধরের মানে সে বুঝতে পারছে, কিন্তু কামড় সে ছাড়বে না। অগত্যা আগন্তুক কোমরের খাপ থেকে রিভলবারটা বার করে বুলডগটার চোয়ালের ফাঁক দিয়ে সজোরে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে ঠেলতে লাগল। এমন সময় ঘটনাস্থলে আবির্ভাব হল চিরোকির মালিক টিম কিনান-এর। সে এসে আগন্তুকের কাঁধে টোকা মেরে বলল—'এই যে মশাই, শুনছেন? কুকুরটার দাঁতগুলো যেন ভেঙে ফেলবেন না।' ওর মুরুব্বিয়ানা হাবভাবে কিন্তু আগন্তুক একটুও ঘাবড়াল না। বরং উল্টে টিম কিনানকে সে বলে উঠল—'তাহলে ওর ঘাড়টাই ভেঙে দেব, বুঝেছেন? এটা আপনার কুকুর তো? এটাকে এবার ছাড়িয়ে নিন।'

টিম কিনান উত্তর দিল—'দেখুন, এরকম ব্যাপার যে ঘটবে, তা আমিও বুঝতে পারিনি। এখন কি করব তা আমার মাথায় আসছে না।'

'তাহলে সরে দাঁড়ান, আমাকে আমার কাজ করতে দিন,'—খেঁকিয়ে উঠল আগন্তুক। এতক্ষণে রিভলবারের নলটাকে সে বুলডগটার চোয়ালের অন্যদিক দিয়ে বার করে এনেছিল। আস্তে আস্তে মোচড় দিয়ে দিয়ে চিরোকির চোয়াল দুটোকে খুলে দিল সে, আর ম্যাট হোয়াইট ফ্যাঙ-এর প্রায় ছিব্‌ড়ে হয়ে যাওয়া গলাটাকে ছাড়িয়ে আনল। টিম কিনান এবার বাধ্য ছেলের মতো চিরোকিকে শক্ত করে ধরে রিং-এর বাইরে নিয়ে গেল। হোয়াইট ফ্যাঙ কয়েকবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পারল না। আবার মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ল সে।

আগন্তুকের নাম উইডন স্কট। সে এবার বিউটি স্মিথের দিকে ঘুরে দাঁড়াল—স্মিথ এতক্ষণ পরে উঠে হোয়াইট ফ্যাঙের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্কট তাকে বলে উঠল—'বুঝলে হে, জানোয়ার মশাই! আমি তোমার এই কুকুরটাকে দেড়শো ডলার দিয়ে কিনে নিচ্ছি। এরকম ভালো স্লেজ টানা কুকুরের দাম অবশ্য তিনশো ডলার। তবে এখন তো এর আধমরা অবস্থা, তাই অর্ধেক দাম পাবে।' কথাগুলো বলতে বলতে পকেটের মানিব্যাগ থেকে দেড়শো ডলার বার করল সে।

বিউটি স্মিথ হাত পেছনের দিকে সরিয়ে বলে উঠল—'এটা আমার কুকুর। আমি একে বেচব না। আমার ব্যক্তিগত অধিকার বলে একটা জিনিস আছে।'

স্কট গর্জে উঠল এবার—'আমি কুকুরটা কিনব, তুমিও বেচবে। তুমি যা করেছ, তার পরে এই কুকুরটার মালিক হওয়ার আর কোনও অধিকার তোমার নেই।

তা, ভালোয় ভালোয় পয়সাটা নেবে, না তোমার চোয়ালে আর একখানা মোক্ষম ঘুষি লাগাতে হবে ?'

কাপুরুষ চূড়ামণি বিউটি স্মিথ টাকাটা হাত পেতে নিতে নিতে বলল—'ঠিক আছে, ডসনে আমাকে ফিরতে দাও। তোমার বিরুদ্ধে আমি আইনের সাহায্য নেব।'

স্কট আবার হিংস্রভাবে বলে উঠল—'একটা কথা ভালোভাবে জেনে রাখ, জানোয়ার মশাই। ডসনে গিয়ে এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেছ কি তোমাকে আমি শহর ছাড়া করে ছাড়ব, বুঝেছ ? তুমি মানুষ হলে তোমার ব্যক্তিগত অধিকার থাকত। কিন্তু তুমি তো মানুষ নও, মানুষের চেহারায় একটা খাঁটি শয়তান। কি আমার কথাগুলো কানে গেল ?'

বিউটি স্মিথ-এর দিকে আর নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করল না স্কট। ম্যাট-এর সঙ্গে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দর্শকরা এতক্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়ে জটলা করছিল। টিম কিনান তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করল—'এই অবতারটি কে হে ?'

কে একজন উত্তর দিল—'উইডন স্কট।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু কে এই উইডন স্কট, করেটা কি ?'

'তাও জান না ? এদিককার খনি-টনির ব্যাপারে ও একজন বিশেষজ্ঞ। যত বড় বড় লোক আর খনি অফিসারদের সঙ্গে ওর দহরম মহরম। ওর সঙ্গে যেন লাগতে যেও না, তাহলে মহা ঝামেলায় পড়বে।'

'আমি ঠিকই বুঝেছিলাম যে লোকটা বড় দরের কেউ হবে'—উত্তর দিল টিম কিনান।—'তাই তো আমি প্রথম থেকেই ওকে ঘাঁটাতে যাইনি।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অদম্য

'নাঃ, আর চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।'—হতাশভাবে বলে উঠল উইডন স্কট। ওর স্লেজচালক' ম্যাটও মাথা নেড়ে সায় দিল। দু সপ্তাহ ধরে সমানে দুজনে মিলে হোয়াইট ফ্যাঙকে পোষ মানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ-এর হিংস্রতা তাতে এক ফোঁটা তো কমেই নি, বরং বেড়েই চলেছে। উইডন আবার বলে উঠল—'এটা একেবারেই খাঁটি বুনো নেকড়ে—কিছুতেই পোষ মানবে না।'

ম্যাট জবাব দিল—'কিন্তু কত্তা, এটা নেকড়ে বা কুকুর যাই হোক্ না কেন, এ আগে মানুষের কাছে পোষ মেনেছে, স্লেজগাড়িও টেনেছে। এর বুকের আর গলার দাগগুলো ভালো করে লক্ষ্য করেছেন? আর, একবার যখন এ স্লেজটানা কুকুরের কাজ করেছে, তখন দ্বিতীয়বার আবার সেই কাজ না করতে পারার তো কোনো কারণ নেই কি বলেন?'

'কিন্তু তার কোনো সম্ভাবনা তো এখনো দেখা যাচ্ছে না।' উইডন বলে উঠল।

ম্যাট উত্তর দিল—'যাই হোক, কত্তা, ওকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। ওকে একবার শেকল থেকে খুলে দিয়ে দেখা যাক।' ম্যাট এবার হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাছে এগিয়ে গেল। হোয়াইট ফ্যাঙ একদৃষ্টে লাঠিটার নড়াচড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

'দেখেছেন কত্তা, কুকুরটা কিভাবে লাঠিটার দিকে নজর রেখেছে। তার মানে জীবটা মোটেই পাগল নয়। লাঠিটা যতক্ষণ আমার হাতে থাকবে, ততক্ষণ ও কক্ষনো আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করবে না।' বলতে বলতে ম্যাট লাঠিগাছাটাকে উঁচিয়ে ধরে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গলা থেকে শেকলটা খুলে নিল। হোয়াইট ফ্যাঙ প্রথমটায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল—সত্যিই কি তাকে খুলে দেওয়া হল? বিউটি স্মিথ-এ হাতে পড়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পায় নি। খালি যখন অন্য কোনো কুকুরের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হত, তখনই তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাকে বেঁধে ফেলা হত। তাই, এই আচমকা ছাড়া পেয়ে সে বুঝেই উঠতে পারছিল না ব্যাপারটা কি ঘটল—এটা কি তার নতুন মনিবদের নতুন কোনো ছল? একটু দূরে সরে গিয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে। উইডন স্কট বলে উঠল, 'আহারে, বেচারা! আসলে ওর দরকার হল মানুষের কাছ থেকে একটু দয়া আর একটু স্নেহ ভালবাসা পাওয়া। সেটাই ওকে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখি।' উইডন হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কাছে খালি হাতে এগিয়ে গিয়ে খুব নরম সুরে, আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মন কিন্তু সন্দেহ আর অবিশ্বাসেই ভরে রইল। তার মনে হল, নিশ্চয়ই নতুন ধরনের কোনো শাস্তি আর নির্যাতন তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। উইডন স্কট ওর মাথার যত কাছাকাছি হাতটা নিয়ে আসতে লাগল, হোয়াইট ফ্যাঙ-এর চাপা গজরানিও তত বেড়ে চলল। সে জানে, বহুবার দেখেছে যে এই সব মানুষ মনিবদের হাতে সব সময়েই লুকোনো

থাকে শাস্তি দেবার, আঘাত করবার নতুন নতুন কৌশল। এই মনিবটার হাতে অবশ্য লাঠি নেই', কিন্তু মানুষের স্পর্শই যে এক অতি ভয়াবহ অপছন্দের জিনিস। তাকে কেউ ছোঁবে, এটাই হোয়াইট ফ্যাঙ বরদাস্ত করতে করতে রাজি নয় একেবারেই। তাই দাঁত বার করে গজরাতে গজরাতে সে ক্রমশঃই নিচু হতে লাগল। কিন্তু নতুন মনিবের হাতটা কিছুতেই না থেমে শেষ পর্যন্ত তার মাথার ওপর নেমে এল। আর সেই মুহূর্তেই পাল্টা আঘাত করল হোয়াইট ফ্যাঙ। হাতখানায় কামড় বসানোর ইচ্ছে ওর ছিল না। কিন্তু ওর নিজের সহজাত অনুভূতিই শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল,—নিজেকে নিরাপদ রাখবার স্বাভাবিক তাগিদেই চোখের পলকে হাতখানায় এক কামড় বসিয়ে দূরে সরে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। উইডন খুব তাড়াতাড়ি হাতখানাকে সরিয়ে নিতে গেল বটে, কিন্তু তাতে কোনও ফল হল না—অবাক চোখে উইডন দেখল, তার হাতখানা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর তীক্ষ্ন দাঁতের ঘায়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। হোয়াইট ফ্যাঙ দূরে বসে ভয়াবহ মূর্তিতে গজরাতে লাগল—সে ঠিক জানে, প্রচণ্ড, নির্দয় মার এবার তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ম্যাট দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে রাইফেলটা বার করে নিয়ে এল। উইডন চেঁচিয়ে উঠল— 'আরে, করছ কি তুমি?' ম্যাট শান্তভাবে জবাব দিল—'কি আর করব। আমিই বলেছিলাম কুকুরটাকে একটা সুযোগ দিতে। কিন্তু তার ফল যা হল, তাতে ওটাকে তো এখন শেষ করেই দিতে হবে।'

উইডন এবার প্রাণপণে ম্যাটকে বোঝাতে লাগল—'আরে না না, ম্যাট। ওকে আর সুযোগ দিলাম কোথায় আমরা? সবে তো চেষ্টা শুরু করেছি,—ওকে একটু সময় দিতে হবে না? আমি তো বেশি অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। একবার তাকিয়ে দেখ, কুকুরটার কি অসাধারণ বুদ্ধি।'

ম্যাট অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, চল্লিশ ফুট দূরে ঘরের অন্য কোণে দাঁড়িয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ ওর হাতের রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ডভাবে গজরাচ্ছে। যতবারই ম্যাট রাইফেলটা নামিয়ে রাখল, ততবারই হোয়াইট ফ্যাঙ সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল। আবার রাইফেলটা হাতে নেওয়া মাত্রই গজরে উঠতে লাগল সে। ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য ম্যাট একবার রাইফেলটা তুলে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিকে তাক্ করতে গিয়ে দেখল, হোয়াইট ফ্যাঙ ঠিক সময়ে লাফিয়ে আড়ালে চলে গেছে, রাইফেলের পাল্লার সামনে নেই। স্কট বলে উঠল—'দেখলে, ম্যাট, কি দারুণ বুদ্ধি ধরে কুকুরটা। বন্দুক রাইফেলের মানে কি, তার সামনে পড়লে কি করতে হয়, সেটাও কুকুরটা তোমার মতোই জানে। এরকম বুদ্ধি ধরে যে,

তাকে ভালোভাবে একটা সুযোগ দেবে না ? রাইফেলটা রেখে দাও।'

ম্যাট আস্তে আস্তে রাইফেলটা নামিয়ে রেখে উইডনের দিকে তাকিয়ে বলে ' উঠল 'ঠিকই বলেছেন, কত্তা। এরকম একটা চালাক বুদ্ধিমান জানোয়ারকে কি মেরে ফেলা যায় ?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিবর্তন

হোয়াইট ফ্যাঙ উইডন স্কটের হাত ফালাফালা করে দেওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও নির্মম শাস্তি হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ওপর নেমে আসেনি। তবে, দেরিতে হলেও যে সেরকম শাস্তি তাকে পেতেই হবে—হোয়াইট ফ্যাঙ সেটা ধরেই নিয়েছিল। সে যা করেছে, সে অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই—দুপেয়ে ভগবানদের একজনের গায়ে সে দাঁত বসিয়েছে। তাই, উইডন স্কট যখন ওর দিকে এগিয়ে এল, তখন হিংস্রভাবে গজরাতে লাগল সে—বিনা বাধায় কোনরকম শাস্তি সে মেনে নেবে না।

উইডন এগিয়ে এসে ওর খানিকটা দূরে বসে পড়ল। হোয়াইট ফ্যাঙ দেখল, তার এই মনিব খালি হাতেই তার কাছে এসেছে—লাঠি, চাবুক বা বন্দুক—কিছুই তার কাছে নেই। তাই হোয়াইট ফ্যাঙ সতর্কভাবে দেখতে লাগল এরপর কি ঘটে—তাকে তো বেঁধে রাখা হয়নি, কাজে কাজেই বেগতিক দেখলে সে পালিয়ে যেতে পারবে অনায়াসেই।

উইডন কিন্তু চুপচাপ বসেই রইল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গজরানিও আস্তে আস্তে কমে এল—খালি ওর গলার মধ্যেই একটা চাপা আওয়াজ হতে লাগল। এবার উইডন কথা বলতে শুরু করল। প্রথম প্রথম ওর গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গলা থেকেও চাপা, ঘড়ঘড়ে একটা শাসানির আওয়াজ বেরোচ্ছিল। উইডন কিন্তু সমানে ওর সঙ্গে কথা বলেই চলল। হোয়াইট ফ্যাঙ কখনো কোনো মানষের কাছ থেকে এরকম নরম, আদরের সুরে কথা শোনেনি। একটু একটু করে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মনে হতে লাগল, তার এই নতুন মনিবকে বোধহয় বিশ্বাস করা যায়। বোধহয় এই মনিবের কাছে সে খানিকটা নিরাপদ। অনেকক্ষণ পরে উইডন উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে খানিকটা মাংস নিয়ে এল। তারপর এক টুক্‌রো মাংস হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিকে বাড়িয়ে ধরল। কিন্তু মানুষের ওপর

এতদিনের জমে থাকা অবিশ্বাস এত সহজেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মন থেকে মুছে গেল না—সন্দেহ ভরে সে মাংসের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে রইল বটে, কিন্তু উইডনের হাত থেকে সেটা নিতে এগোল না। তার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, মানুষ মনিবরা খাবারের লোভ দেখিয়ে কাছে নিয়ে এসেও কঠিন শাস্তি দেয়,—তাদের মতলব কোনো সময়েই বোঝা যায় না। খানিকক্ষণ পরে উইডন মাংসের টুকরোটা ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙ অনেকক্ষণ ধরে মাংসটা শুঁকে শেষ পর্যন্ত সেটা মুখে তুলে নিল—উইডনের দিক থেকে কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও চোখ সরাল না সে। বেশ কয়েকবার এইভাবে চলার পর একবার উইডন আর মাংসটা ওর সামনে ছুঁড়ে দিল না—হাতেই ধরে রাখল। খুব দোটানার মধ্যে পড়ে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। এখন কি করবে সে? অথচ তার খুব খিদেও পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত খুব আস্তে এক পা এক পা করে মনিবের দিকে এগিয়ে গেল সে, তারপর একটু একটু করে তার হাতে ধরা মাংসটুকু খেয়ে ফেলল। তবে সারাক্ষণ ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে, গলার মধ্যে চাপা গর্জনও করে চলল সে—মনিবকে সে যেন সাবধান করে দিচ্ছিল যে, তাকে নিয়ে কোনরকম ছল-চাতুরি করা সে বরদাস্ত করবে না। তবে সেরকম কিছুই ঘটল না। বরং ওর মনিব ওর সঙ্গে নরম সুরে, আদর করে কথা বলেই চলল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মনের মধ্যে কিরম একটা অচেনা অনুভূতি জেগে উঠতে লাগল। ওর মনে হতে লাগল, কি যেন এক আজানা আনন্দে ওর ভেতরটা ভরে উঠছে—কি একটা দরকারি জিনিস যেন এতদিন সে পায়নি, সেটা এবার ওর ওপর সমানে ঝরে পড়ছে। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার সন্দেহ আর অবিশ্বাসেও দুলে উঠছিল ওর মন। হঠাৎ ও দেখল, মনিব তার একখানা হাত তার মাথার ওপর নিয়ে এসেছে। এইবার, এইবার বোধহয় এতক্ষণকার পাওয়া শাস্তি তার মাথার ওপর নেমে এসেছে। কিন্তু না, হাতাখনা আস্তে আস্তে নেমে ওর ঘাড়ে আর মাথায় খুব নরমভাবে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে রাখল হোয়াইট ফ্যাঙ—বিশ্বাস আর সন্দেহের প্রচণ্ড দোটানরে মধ্যে পড়ে ওর মনে হচ্ছিল, এবার বোধহয় ওর ভেতরটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আর সে পারছে না। একদিকে ওর এতদিন-কার মজ্জাগত বাধা, অন্যদিকে এক নতুন অচেনা অনুভূতির শিহরণ। মাথায় কাউকে হাত দিতে দেওয়া মানেই নিজের স্বাধীনতাকে তার হাতে সঁপে দেওয়া।—এটাই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর জন্মগত অনুভূতি। কিন্তু তার এই মনিব যেভাবে তার সঙ্গে কথা বলছিল তার, মাথায় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, তাতে ওর সমস্ত দেহ মন এক অজানা আনন্দে ভরে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত এই নতুন অনুভূতিই তাকে আচ্ছন্ন

করে ফেলল,—উইডনের হাতের স্পর্শ থেকে সে আর নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না।

এইভাবেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর জীবনে শুরু হল এক আমূল পরিবর্তন। তার এতদিনকার সন্দেহ আর অত্যাচারের দিনগুলি শেষ হয়ে দেখা দিল নতুন দিনের হাতছানি। উইডন তার অসীম ধৈর্য আর ভালবাসা দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল—বুনো, নিষ্ঠুর, হিংস্র, অদম্য হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মনে সে জাগিয়ে তুলল বিশ্বাস আর ভালবাসা। এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে হোয়াইট ফ্যাঙ-এরও কম অসুবিধা হয়নি—এতদিনে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সমস্ত যুক্তি, অনুভূতি আর অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে তার নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে হচ্ছিল। ছোটবেলা থেকে যে অন্যায়, যে অত্যাচার সে সহ্য করেছে, যে ঘৃণা, অবহেলা সে পেয়েছে—তা কি চট্ করে ভুলে যাওয়া সম্ভব? উইডন স্কট-ও সেটা বুঝতে পেরেছিল ভালভাবেই। তাই, হোয়াইট ফ্যাঙ-এর প্রতি মানুষ জাতটার সমস্ত অন্যায় আর অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত করার দায়িত্ব যেন সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। ভুলেও সে কখনো হোয়াইট ফ্যাঙ-এর প্রতি কোনরকম রূঢ় ব্যবহার করত না।—সব সময়েই দয়া, করুণা আর ভালবাসা দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ-কে ভরিয়ে রাখত। ফলে আস্তে আস্তে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মনেও জেগে উঠল সর্বগ্রাসী এক ভালবাসার অনুভূতি। তার এই নতুন দয়ালু মনিবকে নিজের সবটুকু মন উজাড় করে ভালবেসে ফেলল সে। এতদিন মানুষকে ভালবাসতে না শিখলেও মানুষের প্রভুত্ব সে অনেকদিন আগেই স্বীকার করে নিয়েছে। নইলে তো বনে পালিয়ে গিয়েও স্বেচ্ছায় সে আবার 'গ্রে বিভার'-এর কাছে ফিরে আসত না। এবার সে জীবনে এই প্রথম মানুষ প্রভুকে ভালবাসতেও শিখল। তাই, সারাক্ষণ খোলা অবস্থায় থাকলেও সে পালিয়ে যাবার আর কোনো রকম চেষ্টাই করল না। বরং তার জাতের সহজাত বিশ্বস্ততার সে হয়ে উঠল তার মনিবের বিষয় সম্পত্তি, ঘরবাড়ির এক অতন্দ্র, সদাসতর্ক প্রহরী। তার প্রভুর কে আপনজন, আর কে তা' নয়—সেটা হোয়াই ফ্যাঙ-এর বুঝে নিতে একেবারেই দেরি হল না। রাতের অন্ধকারে পা টিপে যারা আসে, তারা যে একেবারেই অবাঞ্ছিত, এটা সে খুব ভালভাবেই জানত। স্লেজচালক ম্যাট, অন্যান্য পোষা কুকুরগুলোকে সে মেনে নিল। কারণ তারা তার মনিবেরই সম্পত্তি। কিন্তু মনিব ছাড়া অন্য কারো হুকুম হোয়াইট ফ্যাঙ কখনো মেনে চলত না। ওকে ম্যাট-ই সব সময় খেতে দিত বটে, কিন্তু ও জানত যে মনিবের দেওয়া খাবারই সে ম্যাট-এর হাতে দিয়ে পাচ্ছে। ম্যাট শত চেষ্টা করেও ওকে স্লেজের সঙ্গে জুড়তে পারেনি; কিন্তু উইডন

স্কট যখন ওর গলায় স্লেজগাড়ি টানবার দড়ি পরাল তখন ও সাগ্রহে, খুব মনোযোগ দিয়ে অন্যান্য কুকুরদের সঙ্গে স্লেজ টানতে লেগে গেল।

মনিবের প্রতি অগাধ ভালবাসা থাকলেও হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ভালবাসার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল খুবই কম। ও কখনো ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শেখেনি; এখনও সে প্রভুকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কোনরকম চিৎকার চেঁচামেচি করত না। প্রভু বাইরে থেকে ফিরলে ও কখনো দৌড়ে প্রভুর কাছে গিয়ে লাফালাফি করত না। দূর থেকে একদৃষ্টে তার প্রিয় মনিবের দিকে তাকিয়ে থাকত। প্রভুর প্রতিটি পদক্ষেপ, নড়াচড়া ও এক মনে লক্ষ্য করে যেত।—সেটাই ছিল ওর ভালবাসার চরম প্রকাশ। এমনকি উইডন যখন কাছে এসে ওর সঙ্গে কথা বলত, তখনও কিছুতেই নিজের অপরিসীম ভালবাসাকে বাইরে প্রকাশ করতে পারত না হোয়াইট ফ্যাঙ।

কিছুদিন পরে হঠাৎই কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সামনে দেখা দিল এক দারুণ সমস্যা। হঠাৎ একদিন তার মনিব রাত্রে আর বাড়ি ফিরল না। সারা রাত প্রভুর অপেক্ষায় জেগে বসে রইল সে। পরের দিন সকালেও প্রভুর দেখা পাওয়া গেল না। হোয়াইট ফ্যাঙ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি ঘটল—প্রভু যে কাজের জন্য সার্কল সিটি-তে চলে গিয়েছে, ফিরতে বেশ কিছু দিন দেরি হবে সেটা ও কি করে বুঝবে? প্রভুকে সে জিনিসপত্তর একটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে দেখেছে বটে, কিন্তু তার আসল অর্থ তখন ওর মাথায় ঢোকেনি। দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, কিন্তু তার প্রভুর কোনো পাত্তা নেই। দুশ্চিন্তায় ভাবনায় হোয়াইট ফ্যাঙ জীবনে এই প্রথমবার দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। খাওয়া দাওয়া একদম ছেড়ে দিল সে। ক্যাম্পের অন্যান্য কুকুরগুলো তাকে ইচ্ছেমত কামড়ে গেলেও সে তাদেরকে কিছু বলত না। ম্যাট শত চেষ্টা করেও হোয়াইট ফ্যাঙকে খাওয়াতে বা চাঙা করে তুলতে পারল না—ম্যাট-এর দিকে অর্থহীন, বোবা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে আবার নিজের দুই থাবার মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকত সে। বেঁচে থাকবার সব ইচ্ছাই যেন চলে গেছিল তার। এইভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরে ম্যাট একদিন রাত্রে কেবিনে বসে বই পড়ছে, হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল হোয়াইট ফ্যাঙ; তারপরেই গলায় মধ্যে একটা অস্ফুট আওয়াজ করে কান খাড়া করে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটু পরেই বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, ঘরে এসে ঢুকল উইডন স্কট। ম্যাট-এর সঙ্গে করমর্দন করে উইডন স্কট প্রথমেই জিজ্ঞেস করে উঠল "কই, সেই নেকড়েটা কোথায়?' ম্যাট-এর চিঠিতে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সব খবরই তার জানা হয়ে গেছিল। হোয়াইট ফ্যাঙ কিন্তু

অন্যান্য ককুরদের মতো মনিবের কাছে দৌড়ে এসে লাফালাফি ঝাঁপাঝাপি জুড়ল না; এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে মনিবের দিকে তাকিয়ে থাকল। উইডন ওকে ডাকতে ডাকতে ওর দিকে এগিয়ে গেল। হোয়াইট ফ্যাঙ-ও এবার মনিবের দিকে এগিয়ে এল, ওর চোখ দুটো যেন কি এক আবেগে জ্বলে উঠল। উইডন স্কট বসে পড়ে ওর ঘাড়ে, মাথায় পিঠে গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গলা থেকে বেরোতে লাগল আদর, আবদার মেশানো একটা চাপা গজরানির আওয়াজ, অন্য কোনো ডাক সে ডাকতে শেখেনি। তবে, এতদিন পরে সে নিজের ভালবাসা জানাবার একটা উপায় খুঁজে পেল। হঠাৎ নিজের মাথাটাকে প্রভুর হাত আর শরীরের ফাঁকে গুঁজে দিল সে, তারপর মাথাটাকে ঠেলে ঠেলে একদম ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। এটাই ছিল তার কাছে আত্মসমর্পণ করবার, ভালবাসা জানাবার শেষ কথা। তার সহজাত, আদিম, ফাঁদ এড়িয়ে চলার প্রবৃত্তির ফলে সে নিজের মাথাকে সব সময় অন্য কিছুর ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে চলত, তা এবার তার মন থেকে হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো।

মনিবকে ফিরে পেয়েই দু-তিন দিনের মধ্যেই হোয়াইট ফ্যাঙ আবার তার পুরনো জীবনীশক্তি, প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেল। ক্যাম্পের যে সব কুকুর এ কয়েকদিন তাকে ইচ্ছেমতো কামড়েছে, তাদেরকেও এবার তার কাছে বেধড়ক মার খেতে হল। আবার তাদের একচ্ছত্র দলপতি হয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ।

এর কয়েকদিন বাদেই ঘটল আর এক রোমাঞ্চকর ঘটনা। একদিন রাত্রে উইডন স্কট আর ম্যাট কেবিনে বসে তাস খেলছে। এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গর্জন আর মানুষের গলার তীব্র আর্তনাদ। ওরা দুজনেই আলো হাতে করে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, একটা মানুষ চিৎ হয়ে মাটিতে শুয়ে দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ আর গলা ঢেকে রেখেছে। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রাণপন চেষ্টা করে চলেছে সে। হোয়াইট ফ্যাঙ ভয়াবহ রাগী চেহারার লোকটার দুটো হাতই কামড়ে ফালা ফালা করে দিচ্ছে—জামার হাতা দুটো টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। আর ক্ষতবিক্ষত হাত দুটো রক্তে ভেসে যাচ্ছে। উইডন সঙ্গে সঙ্গে গলা চেপে ধরে হোয়াইট ফ্যাঙকে সরিয়ে আনল। আর ম্যাট লোকটাকে টেনে তুলে দাঁড় করাল। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়েই দুজনে ভূত দেখার মতো চমকে গেল—দেখা গেল, লোকটা আর কেউ নয় স্বয়ং বিউটি স্মিথ। কাছেই মাটিতে পড়ে আছে লোহার একটা কুকুর বাঁধার শেকল, আর একটা মোটা বড় লাঠি।

উইডন আর ম্যাট্ কেউই কোনো কথা বলল না—কথা বলার কোনো দরকারও ছিল না। ম্যাট বিউটি স্মিথ-এর ঘাড়ে হাত দিয়ে চলে যাবার রাস্তার দিকে ফিরিয়ে শুধু। বিউটি স্মিথও নিঃশব্দে সরে পড়ল চরম আতংকে, প্রাণভয়ে চোখমুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তার। ম্যাট হেসে উঠে বলল—'বুঝলেন কত্তা, বিউটি স্মিথ নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে একসঙ্গে এক ডজন রাক্ষস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' উইডন স্কট হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে উঠল—'কি রে, তোকে হতভাগাটা অন্ধকারে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছিল? তা তুই তো ওকে বেশ উচিত শিক্ষাই দিয়ে দিয়েছিস, তাই না?'

রাগে, উত্তেজনায় এখনো হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গায়ের রোঁয়াগুলো শক্ত হয়ে ছিল। প্রভুর আদর পেয়ে ধীরে ধীরে ও শান্ত হয়ে এল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝেই ও নিচু গলায় গজরাচ্ছিল আর চাপা উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

চতুর্থ পর্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুদূরের পাড়ি

হোয়াইট ফ্যাঙ মনিবের 'কেবিন' ঘরে কখনো ঢুকত না। কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সে বুঝতে পারছিল যে, শিগ্‌গীরই তার জীবনে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে। মনিবের চলাফেরাতে কি রকম একটা আসন্ন বিপর্যয়ের সংকেত যেন তার সমস্ত চেতনাকে সতর্ক করে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝেই চাপা, তীব্র একটা গোঙ্গানির আওয়াজ তার গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল। অজানা, আসন্ন বিপদের কথা ভেবে কেন যেন বুকের ভেতরটা মুচ্‌ড়িয়ে উঠছিল তার। আর খানিকক্ষণ বাদে বাদেই গভীর নিঃশ্বাস টেনে সে দেখে নিচ্ছিল, তার প্রভু ঘরে আছে কিনা।

হোয়াইট ফ্যাঙ ভুল বোঝেনি। উইডন স্কট তাকে ছেড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় করছিল। হোয়াইট ফ্যাঙকে ছেড়ে যেতে তারও বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কি-ই বা করবে সে? রাতের খাবার খেতে বসে একদিন উইডন আর ম্যাট বাইরে থেকে ভেসে আসা হোয়াইট ফ্যাঙ-এর চাপা গোঙ্গানি শুনতে শুনতে এই ব্যাপারেই কথাবার্তা বলছিল। ম্যাট বলে উঠল—'যাই বলুন কত্তা, এই নেক্‌ড়েটা আপনাকে একেবারে পাগলের মতো ভালবাসে। তাই ভাবছিলাম যে—'

'কি ভাবছিলে কি?' হঠাৎ রেগে চেঁচিয়ে উঠল উইডন স্কট। আসলে সে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে একেবারে বিধ্বস্ত, অধৈর্য হয়ে পড়েছিল, তাই অকারণেই চটে উঠল সে। 'আমি কি জানি না আমার কি করা উচিত? আমার সেই দক্ষিণের দেশে, ক্যালিফোর্নিয়াতে একটা নেকড়ে কি করে নিয়ে যাব আমি শুনি? ওর অন্যের কুকুর মেরে ফেলার খেসারত দিতে গিয়েই তো আমি ফতুর হয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত শহরের কর্তৃপক্ষ খুনে নেকড়েটাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। এ সব কি বুঝতে পারছ না, নাকি?'

ম্যাট খুব নিরীহভাবে জবাব দিল—'আহা চট্‌ছেন কেন কত্তা। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না যে কি করবেন। আমি খালি এই কথাটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, হতভাগা নেকড়েটা কি করে বুঝতে পারছে যে আপনি ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

'ঠিকই বলেছ, ম্যাট। আমি সত্যিই সত্যি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না কি করব।'—ক্লান্তভাবে জবাব দিল উইডন—'আর কি করেই বা ও সবকিছু বুঝতে পারছে, তাও জানি না।'

অবশেষে সেই দিনটি এসে গেল। কেবিনের দরজার ফাঁক দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ দেখতে পেল, তার প্রভুর বড় হোল্ডলটা বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। আগেরবারও ঠিক এর পরেই তার প্রভু তাকে ছেড়ে চলে গেছিল। এবারও নিশ্চয়ই যে একই ব্যাপার ঘটবে, সেটা আর হোয়াইট ফ্যাঙ-এর বুঝতে বাকি রইল না। সেদিন রাতে বহুদিন পরে সে কাঁদল, নেকড়েদের সেই বুক ফাটা কান্না, আকাশের দিকে, তারাদের দিকে নাক তুলে সে নিজের দুঃখের কথা জানিয়ে চলল। এই কান্নাই সে কেঁদেছে ছোট-বেলায় জঙ্গলে, আর জঙ্গল থেকে ফিরে এসে গ্রে বিভারের তাঁবু দেখতে না পেয়ে। কেবিনের ভেতরে ম্যাট তার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠল—'জানেন কত্তা কুকুরটা আবার খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গতবার আপনি চলে যাওয়ার পর ওর যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে এবার ও মরেই যাবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার চুপ করবে?'—অন্য বিছানা থেকে খেঁকিয়ে উঠল উইডন স্কট। ওর মনে হল, ম্যাট যেন একটু চাপা হাসি হাসল।

পরের দিন হোয়াইট ফ্যাঙ এক নিমেষের জন্যও প্রভুর কেবিনের দরজা ছেড়ে নড়ল না। উইডনের বাকী জিনিসপত্রও গোছানো হয়ে গেল। দুটো রেড ইণ্ডিয়ান কুলি এসে সব লটবহর মাথায় তুলে জাহাজঘাটায় চলে গেল—ম্যাটও গেল তাদের সঙ্গে। উইডন হোয়াইট ফ্যাঙকে কেবিনের মধ্যে ডেকে নিয়ে ওর মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—'বুঝলি রে, ধেড়ে খোকা, অনেক দূরে যাচ্ছি এবার, দেশের দিকে। সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। নে, তোর গলার মধ্যে যে চাপা ঘড়ঘড়ানিটা হরদম আমাকে শোনাস, সেটা একবার শেষবারের মতো আমাকে শুনিয়ে দে। আর ম্যাট-এর কাছে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকিস কেমন?'

হোয়াইট ফ্যাঙের গলা দিয়ে কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরোল না। প্রভুর মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। তারপর নিজের মাথাটা প্রভুর হাতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল।

ম্যাট ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিল। সে এবার তাড়া লাগাল—'কত্তা, স্টীমার এখুনি ছাড়বে। ঐ যে, ভোঁ বাজছে, চলুন এবার।'

দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি একই সঙ্গে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল—তবে দুদিক দিয়ে। ঘরের দুটো দরজা একই সঙ্গে বন্ধ না করলে হোয়াইট ফ্যাঙকে আটকানো

যাবে না, তাই এই ব্যবস্থা। বেরিয়ে এসে দুজনেই শুনতে পেল, হোয়াইট বুকফাটা কান্না জুড়ে দিয়েছে। ধাপে ধাপে সে কান্নার আওয়াজ উঁচু পর্দায় উঠছে, আস্তে আস্তে নিচুতে নামছে, আবার তীব্র হয়ে উঠছে। চরমতম দুঃখ বা শোকের সময়েই কুকুরা এভাবে কাঁদে—প্রভুকে হারানোর কান্না। ম্যাট মনিবকে স্টীমারে উঠিয়ে দিয়ে নেমে আসবার আগে শেষবারের মতো উইডনের সঙ্গে করমর্দন করছিল। হঠাৎ বিস্ময়ে ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফিরিয়ে উইডন হতবাক্ হয়ে দেখল, অদূরেই হোয়াইট ফ্যাঙ ডেকের ওপর বসে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। কেবিনের দুদিকের দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও কুকুরটা কি করে বেরিয়ে এল—তা ওদের মাথায় ঢুকল না। বিস্ময়ের ঘোর একটু কাটলে ম্যাট বলে উঠল—'দেখি, কুকুরটাকে এবার নামিয়ে নিতে হবে।' কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙকে ধরতেই পারল না ম্যাট। ও অনেক দৌড়াদৌড়ি করল, কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ লোকের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে ঠিক ওকে এড়িয়ে গেল। কিন্তু উইডন ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ও এসে ঠিক প্রভুর পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল। উইডন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে দেখল, ওর সারা মুখে কাটাছেঁড়ার দাগ, দুই চোখের মধ্যে গভীর ক্ষত। ম্যাট নিচু হয়ে ওর পেটের নিচে হাত বুলিয়ে দেখল, সেখানটা কেটে একেবারে ফালাফালা হয়ে গেছে। মুখে একটা চাপা শব্দ করে ম্যাট বলে উঠল—'ওঃ হো, কত্তা জানলাটার কথা তো আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জানলার কাঁচ ভেঙে হতভাগাটা বেরিয়ে এসেছে—ওর তলার দিকটা তো একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। বুঝুন কাণ্ডটা!'

উইডন ম্যাট-এর কথার কোনো জবাব দিল না। একমনে কি যেন ভাবছিল সে। স্টীমার এতক্ষণে শেষ ভোঁ বাজিয়ে দিয়েছে,—যাত্রীরা ছাড়া আর সবাই নেমে যাচ্ছে। ম্যাট নিজের গলার বড় রুমালটা খুলে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গলায় বাঁধতে গেল। কিন্তু হঠাৎই উইডন স্কটের হাত এসে পড়ল ওর হাতের ওপর।

'ঠিক আছে, বিদায় ম্যাট। এই নেকড়েটা—বুঝলে, তোমাকে আর এর খবর আমাকে জানাতে হবে না। আমিই তোমাকে এর সম্বন্ধে চিঠিতে জানাব।'

'মানে?' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাট—'আপনি কি তাহলে একে সঙ্গে নিয়ে…'

'ঠিকই ধরেছ ম্যাট, এই নাও তোমার রুমালটা।' জবাব দিল উইডন।

জাহাজ থেকে নেমে ম্যাট চেঁচিয়ে বলল—'কত্তা, দক্ষিণের ঐ আবহাওয়াতে এ কিছুতেই বাঁচবে না, যদি না এর গায়ের লোম ছেঁটে দেন।'

স্টীমার ছেড়ে দিল। শেষবারের মতো ম্যাটকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে

হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিকে ফিরল উইডন। কুকুরটা নিশ্চিন্তভাবে ওর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর কানের পেছনে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল উইডন 'নে হতভাগা, এবার খুশি তো? এবার যত ইচ্ছে ঘড়্ঘড়্ করে যা।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দক্ষিণ দেশ

সান ফ্রান্সিস্কোয় পেঁাছে প্রথমটা হোয়াইট ফ্যাঙ একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। মানুষ মনিবরা যে শক্তিশালী ভগবান, এটা সে ছোট থেকেই নিজের অনুভূতি দিয়ে জেনে এসেছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা যে কত অসীম, সর্বগ্রাসী—সেটা সভ্যজগতের শহরে পা দিয়ে ও প্রথম বুঝল। শৈশবে গ্রে বিভারের কাছে এসে ওর নিজেকে যে রকম অসহায় মনে হয়েছিল, আর একবার নিজেকে সে রকম অসহায় মনে হল ওর। সুদূর উত্তরের সেই কাঠের 'কেবিন'-এর বদলে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, ঘোড়ার গাড়ি—বিরাট বিরাট ট্রাক, তীক্ষ্ণ শব্দ করে ছুটে যাওয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম, এ সবের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে গেল প্রথমটা। সব সময়েই নিজের মনিবের একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপটে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ।

উইডন স্কটের বাবা আর মা গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। শহরের বাইরে গাড়ির স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। এতক্ষণ হোয়াইট ফ্যাঙ ছিল একটা মালবাহী ট্রাকের মধ্যে। সেখানে প্রভুর সমস্ত জিনিসপত্রের মধ্যে বসে পাহারা দিচ্ছিল সে,—ট্রাকের যে লোকটা সব মালপত্রের তদারকি করছিল তাকে মনিবের কোনো জিনিস ছুঁতেই দেয়নি সে। এবার ট্রাক থেকে নেমে এসে সে দেখল, একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্কটের মা এগিয়ে এসে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রাগে গর্জন করে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল হোয়াইট ফ্যাঙ। এই অচেনা মানুষটা তার মনিবকে ধরে কি করতে যাচ্ছে? তাড়াতাড়ি নিজেকে মায়ের বাহুপাশ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে চেপে ধরল স্কট। তারপর ওকে শান্ত করতে করতে বলে উঠল—'ভয় পেয়োনা, মা। আসলে ও ভেবেছে তুমি বোধহয় আমাকে মারতে যাচ্ছ। কিচ্ছু ভেবো না, শিগ্গীরই ও সব শিখে নেবে।'

স্কটের মা ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিলেন, তাও কোনরকমে মুখে হাসি

টেনে এনে উনি বলে উঠলেন—'মজা মন্দ নয়। তাহলে ওর চোখের আড়ালে আমার ছেলেকে আদর করতে হবে?'

'না না মা। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি, দেখ না।' বলে স্কট হোয়াইট ফ্যাঙকে কড়া গলায় বলে উঠল—'এই বসে পড়। একদম মাথা নিচু করে বোস্।'

এই কথাগুলোর অর্থ হোয়াইট ফ্যাঙ ভালভাবেই মনিবের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর হুকুম তামিল করল সে।

'এইবার মা' বলে স্কট দুহাত খুলে মাকে ডাকল। একই সঙ্গে আবার হোয়াইট ফ্যাঙকে শাসাল 'চুপ করে বসে থাক।'

হোয়াইট ফ্যাঙ একটু ওঠার চেষ্টা করে আবার বসে পড়ল। গায়ের সব লোম-গুলো উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠেছিল তার। তবে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সে দেখল, এই অচেনা মহিলার তার প্রভুর কোনো ক্ষতি করল না। তারপর স্কটের বাবাও একইভাবে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এবার সবাই মিলে গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল, আর হোয়াইট ফ্যাঙ দৌড়ে চলল গাড়ির পেছনে। এখন আর শহরের হৈ চৈ, ব্যস্ততা, ভিড় ছিল না—ফাঁকা, চওড়া রাস্তা, দুধারে গাছের সারি। মিনিট পনেরো যাওয়ার পরে একটা বড় ফটকের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ঢুকল ভেতরে—সামনে সুন্দর চওড়া কাঁকর ছড়ানো রাস্তা; দুপাশে ওক গাছ, পরিষ্কার, ঝক্‌ঝকে মাঠ। কিন্তু গাড়ি ফটকে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা শেপহার্ড কুকুর চেঁচাতে চেঁচাতে এসে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হোয়াইট ফ্যাঙ ওর গলাটা কামড়ে ধরতে গিয়ে একেবারে বোকা বনে গেল—কুকুরটা মাদী কুকুর। মাদী কুকুরের সঙ্গে যে লড়াই করতে নেই। এ বোধটা তার জন্মগত ও অনুভূতিতেই গাঁথা হয়ে আছে। কিন্তু মাদী কুকুরটা ওকে ছাড়ল না। একেই তো মাদী কুকুর বলে ওর সে রকম কোনো জন্মগত অনুভূতি নেই, বরং তার বংশগত অনুভূতিতে সে জানে, নেকড়ে দেখলেই তাকে আক্রমণ করতে হয়। তার পূর্বপুরুষরা বুনো নেকড়েদের হাত থেকে চিরকাল প্রভুদের ভেড়ার পালকে বাঁচিয়ে এসেছে। হোয়াইট ফ্যাঙ যে আদতে একটা নেকড়ে, সেটা বুঝতে তার এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। আর এই বহিরাগত শত্রুকে এখুনি তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল মাদী কুকুরটা। গাড়ি থেকে স্কটের বাবা ডেকে উঠলেন—'এই কোলি, এদিকে আয়।' কোলি কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙকে ছাড়ল না। হোয়াইট ফ্যাঙ পড়ে গেল মহা মুশকিলে, এদিকে গাড়িতে চড়ে প্রভু তার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। অগত্যা মরীয়া হয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ তার পুরনো

লড়াইয়ের চালটা খাটাল—দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে কোলির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাকে মারল জোরসে এক ধাক্কা। ছিটকে পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগল কোলি, আর এই সুযোগে মনিবের গাড়ির পেছনে নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল হোয়াইট ফ্যাঙ। কোলি উঠে প্রাণপণে চেঁচাতে চেঁচাতে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর পিছু নিল বটে, কিন্তু খোলা রাস্তায় দৌড়ে ওর নাগাল পাওয়া কোলির পক্ষে একেবারেই সম্ভব হল না। একটু বাদেই গাড়িটা এসে থামল বাড়ির গাড়ি বারান্দার নিচে। উইডন গাড়ি থেকে নেমে এল। এমন সময় দৌড়ে আসতে আসতেই টের পেল, পাশ থেকে একটা কুকুর আসছে ওকে আক্রমণ করতে। হোয়াইট ফ্যাঙ ঘুরে দাঁড়াবার আগেই একটা 'ডিয়ার হাউণ্ড' কুকুর এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল হোয়াইট ফ্যাঙ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাউণ্ডটার গলা লক্ষ্য করে কামড় বসাল। একটুর জন্য বেঁচে গেল হাউণ্ডটা। দ্বিতীয়বার মোক্ষম কামড়টা বসানোর আগেই কোলি দৌড়তে একেবারে ঘূর্ণিঝড়ের মতো হোয়াইট ফ্যাঙ-এর উপরে এসে পড়ল। আচমকা ওর ধাক্কা খেয়ে আবার গড়িয়ে পড়ল হোয়াইট ফ্যাঙ। উইডন এক লাফে ছুটে এসে পড়েছিল। এক হাত দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙকে ধরে রইল সে। আর অন্য কুকুর দুটোকে কাছে ডেকে নিলেন উইডনের বাবা। মজা করে উইডন বলে উঠল, 'বাঃ এতো ভারী মজার ব্যাপার দেখছি! বেচারী নিঃসঙ্গ নেকড়েটা সেই সুদূর উত্তর দেশ থেকে তোমাদের কাছে এল আর তাকে কিনা এরকমভাবে তোমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছ। সারা জীবনে এতদিন একবার মাত্র ওর পা ফস্‌কেছে। আর এখানে এসে পেঁছনোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিনা ওকে দু'বার গড়াগড়ি খেতে হল।' কথাগুলো বলতে বলতে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করল উইউন। বাড়ির অন্যান্য লোকেরাও ইতিমধ্যে এসে পড়েছিল। 'ডিক' নামে হাউণ্ডটা আর 'কোলি' দূরে সরে রইল বটে, কিন্তু ওদের গজরানি থামল না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে উইডনের বাবা বলে উঠলেন—'এক কাজ করা যাক। কোলি ভেতরে চলুক, আর ডিক আর এই নতুন অতিথি নিজেদের মধ্যে প্রাণ খুলে মারপিট করে নিক। তারপরে দেখবে, দু'জনেই পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে।'

উইডন হেসে উঠে বলল—'তাহলে হোয়াইট ফ্যাঙকেই ডিক-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রধান অতিথি হতে হবে কিন্তু!'

উইডনের বাবা খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তার মানে?'

উইডন উত্তর দিল—'তার মানে, লড়াই বাধলে দু'মিনিটের মধ্যেই ডিক মারা

পড়বে।' হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিকে ফিরে উইডন এবার ডাকল—'আয়রে, নেক্‌ড়ে। তুই-ই ভেতরে আয়।'

হোয়াইট ফ্যাঙ খুব সাধবানে মনিবের সঙ্গে বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকল। ডিক সিঁড়ির ওপর শুয়ে শুয়ে গজরাতে লাগল। ভেতরে ঢুকেও হোয়াইট ফ্যাঙ সতর্কভাবে চারদিক দিখে নিল একবার—কি জানি না জানি আবার কোন বিপদ এখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু কিছুই যখন ঘটল না তখন ও বেশ খুশি মনে মনিবের পায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন জগৎ

মনিবের বাড়ির নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মোটেই দেরি হল না। জীবনে সে অনেক কিছু দেখেছে,—চট্‌ করে কোনো কিছু শিখে নিতে তার কোনও অসুবিধা হোত না। উইডনের বাবা বিচারপতি মিঃ স্কটের এই বিশাল বাড়িটার নাম ছিল 'সিয়েরা ভিস্টা।" ডিক্‌ বা বাড়ির অন্যান্য কুকুরগুলোর সঙ্গেও হোয়াইট ফ্যাঙ-এর আর কোনো ঝগড়া বা লড়াই হল না—তারা বুঝেই গিয়েছিল যে, এই নতুন আগন্তুক নেক্‌ড়ে হলেও তাদের মতোই মানুষ মনিবদের আর একটি পোষা জীব। ডিক্‌ কুকুরটা তো হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই এগিয়ে এসেছিল ; কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ ওকে কোনরকম পাত্তাই দিল না। বন্ধুত্ব করতে সে শেখেনি কোনদিন। তবে এটা হোয়াইট ফ্যাঙ ভালভাবেই জানত যে, মনিবের অন্য কোনও পোষা কুকুরকে কিছু বলা যাবে না। তাই সে বাড়ির অন্য সব কুকুরের কাছ থেকে তফাতেই সরে রইল। কিন্তু কোলিকে নিয়েই সে পড়ে গেল মহা মুশকিলে। কোলি সুযোগ পেলেই ওকে কামড়ে, তাড়া করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। হোয়াইট ফ্যাঙ যতটা সম্ভব কোলিকে এড়িয়ে চলত। আর কোলি কাছাকাছি এসে গেলেই তাড়াতাড়ি সে জায়গা থেকে সরে পড়ত।

হোয়াইট ফ্যাঙ-এর জন্মভূমি সুদূর উত্তরের জীবনযাত্রা ছিল একেবারে সহজ আর সরল। তাই, দক্ষিণের মনিবের এই বিশাল বাড়ির, এখানকার সুসভ্য জীবনের হরেক রকমের আদব কায়দা, নিয়মকানুন বুঝে উঠতে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর স্বাভাবিক ভাবেই লেগে গেল বেশ কিছুদিন। প্রথমেই তার প্রভুর আপনজন কে কে, সেটা বুঝে নিল সে। উইডনের বাবা-মা, স্ত্রী, দুই বাচ্চা—এরাই যে প্রভুর সব চাইতে আদরের প্রিয়জন, সেটা খুব তাড়াতাড়িই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

বাচ্চা দুটোকে প্রথম প্রথম সে এড়িয়েই চলত, কারণ শিশুদের সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়—ঐ সব ক্ষুদে জীবগুলোই অত্যাচার করে বেশি। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল, সে উইডনের বাচ্চা দুটোর একেবারে ঘনিষ্ঠ খেলার সাথী হয়েছে উঠেছে। এমনকি বাচ্চা দুটো যখন ওর সঙ্গে খেলতে খেলতে অন্য কোথাও চলে যেত, তখন সে বেশ মুষড়েই পড়ত।

আস্তে আস্তে স্কট পরিবারের সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ। কিন্তু উইডনের প্রতি যে সীমাহীন ভালবাসা ওর মধ্যে জেগে উঠেছিল, তার ভাগীদার আর কেউই হতে পারল না। আর কোনও মানুষের শরীরের মধ্যেই নিজের মাথাটা গুঁজে দিয়ে গলার মধ্যে অস্ফুট গড়গড় আওয়াজ করে আদর জানানোর চেষ্টা ও কখনো করেনি—পুরোপুরি আত্মসমর্পণের এই বহিঃপ্রকাশ একমাত্র প্রভু উইডনের জন্যেই বাঁধা রইল।

প্রভুর বাড়ির বাইরের পারিপার্শ্বিক জগতের অনেক কিছু নিয়মকানুনও শিখতে হল তাকে। বাড়ির বাইরে যে রাস্তা, আশেপাশে আরো যে মনিবের স্বজাত অন্যান্য মানুষদের বাড়ি—সেখানে চলাফেরা করতে গেলেও অনেক কিছু মেনে চলতে হবে। নিজের বুদ্ধি দিয়ে, সহজাত অনুভূতি বিয়ে ধীরে ধীরে শহুরে সভ্য জগতের সবকিছু হালচালই শিখে ফেলল হোয়াইট ফ্যাঙ। মনিবের চড়া, রাগী গলার আওয়াজ, তার হাতের একটা থাপ্পড়—এটাই তার পক্ষে কোনও কিছু শিখে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। 'গ্রে বিভার' বা 'বিউটি স্মিথ'-এর হাতে অজস্রবার প্রচণ্ড মার খেয়েও যে কষ্ট তার হয়নি, তার চাইতে শতগুণে বেশি কষ্ট তার হত উইডনের কাছ থেকে বকুনি বা একটা থাপ্পড় খেলে। আগেকার ঐ সব মনিবদের দেওয়া শাস্তি ছিল শুধুই শারীরিক—কিন্তু উইডনের কাছ থেকে কোনরকম শাস্তি পেলে তার মনে হত, তার ভেতরটা কি যেন এক অসহ্য দুঃখে, লজ্জায় অনুতাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার আর সেই একই অন্যায় সে কখনো করত না। হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝতে শিখল যে, তার মনিবের বা মনিবের স্বজাত অন্য কোনও মানুষের পোষা জীবকেই কখনো ছুঁতে নেই। এমনকি সেটা যদি মুরগীর মতো কোনও লোভনীয় খাবার হয় তাহলেও নয়। শুধু মুরগী কেন, পোষা বেড়াল, পাখি, খড়গোস,—এক কথায় কোনও জীবন্ত প্রাণীকেই একদম ধরা বা মারা চলবে না। তবে, বাড়ির পেছনের বাগানে বা ঝোপেঝাড়ে যে সমস্ত বুনো প্রাণী চলাফেরা করে, তাদের শিকার করতে দোষ নেই। যেমন—বুনো কাঠবিড়ালী, মেঠো খরগোস বা বনমোরগ। সংযত আর ধীরস্থির হয়ে চলাফেরাটি করাটাই এখানকার আধুনিক, সভ্য জীবন-

যাত্রার ধারা। উইডন যখন ঘোড়ার গাড়ি চড়ে 'সানজোস' শহরে যেত, গাড়ির পেছন পেছন দৌড়ে চলত হোয়াইট ফ্যাঙ। গাড়ি যখন শহরে কোথাও থামত, তখন সে নিজের মতোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত। শহরে অনেক অপরিচিত লোক অবাক হয়ে তাকে দেখত। কেউ কেউ তার গায়ে, মাথায় হাতও বুলিয়ে দিত। এই ব্যাপারটা সে বরাবরই খুব অপছন্দ করত, কিন্তু এটাও সে এখন মেনে নিতে শিখে গিয়েছিল। তবে ওর চালচলনে এমন একটা কিছু ছিল যে কেউই ওর সঙ্গে খুব বেশি একটা মাখামাখি করতে ভরসা পেত না। মাথায় একটু হাত বুলিয়েই সরে পড়ত।

এ ছাড়া আরো কিছু কিছু ঘটনা অবশ্য হোয়াইট ফ্যাঙ-এর পক্ষে মেনে নেওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। 'সানজোস' শহরের ঢুকবার ঠিক মুখেই কয়েকটা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছেলে ওকে দেখলেই ঢিল ইট ছুঁড়ে মারত। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ জানত যে শত ইচ্ছে থাকলেও সে এই সভ্য জগতের নিয়মে ঐ চ্যাংড়া অসভ্য ছেলেগুলোকে কামড়ে সায়েস্তা করতে পারবে না। এ ছাড়া, এ শহরে একটা রাস্তার মোড়ের পানশালার সামনে তিনটে রাস্তার কুকুর চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এসে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। উইডন জানত যে হোয়াইট ফ্যাঙকে ছেড়ে দিলে সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ক'টা কুকুরকে মেরে ফেলবে। তাই সে কখনো হোয়াইট ফ্যাঙকে কোনও কুকুরের সঙ্গে লড়াই করতে দিত না। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মনে হত তার ওপর অবিচার করা হচ্ছে—তাকে একতরফা মার খেয়েই যেতে হচ্ছে, কিন্তু নিজেকে বাঁচানোর কোনও সুযোগই তাকে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষের মতো চিন্তা করে অবশ্য এসব সে ভাবত না,—তবে তার সহজাত ইন্দ্রিয় চোখ দিয়েই সে যেন অনুভব করত যে, এ ব্যাপারটা হওয়া উচিত নয়। শিগগীরই অবশ্য ভুল ভাঙল তার। একদিন ঐ ছেলেগুলো যখন ওকে ঢিল মারতে শুরু করেছে, তখন হঠাৎ উইডন গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে ঐ ছেলে-গুলোকে আচ্ছা করে চাবুক পেটা করল। তারপরের দিন থেকেই ছেলেগুলোর ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল। আর একদিন পানশালার সামনের কুকুরগুলো যখন ওকে প্রাণপণে তাড়া করেছে আর পানশালার বাইরে দাঁড়িয়ে বাকী কয়েকটা লোক সমানে কুকুরগুলোকে ওর পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছে তখন ওর মনিব সেরকম হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে ওকে বলে উঠ্‌ল—'যাঃ ব্যাটা। কুকুরগুলোকে খেয়ে ফ্যাল্‌।' বলা বাহুল্য, হোয়াইট ফ্যাঙকে আর দ্বিতীয় কারু কিছু বলতে হল না। নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র, নেকড়ের গতিতে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হোয়াইট ফ্যাঙ।

দু-এক মিনিট ভীষণ লড়াইয়ের পরে ধুলোর ঝড়ের মধ্যে থেকে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য—দুটো কুকুর রাস্তায় শুয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। আর তৃতীয় কুকুরটা প্রাণ ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ রেহাই দিল না তাকে। মাটির ওপর দিয়ে যেন উড়ে গিয়ে একটা মাঠের মধ্যে কুকুরটাকে ধরে টেনে নামিয়ে আনল হোয়াইট ফ্যাঙ, আর সঙ্গেই সঙ্গেই তার গলার নালিটা দু' ফাঁক হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে ঐ অঞ্চলের আর আশেপাশের লোকের মুখে এই 'লড়িয়ে নেকড়ের' কথা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই সাবধান হয়ে গেল, যেন তার কুকুর কোন রকমেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সঙ্গে লড়তে না যায়। হোয়াইট ফ্যাঙ-ও বুঝতে পারল যে, তার ওপর যাতে কোনও অন্যায় না হয়, আর সে যাতে নিজের সম্মান বজায় রেখে চলাফেরা করতে পারে, সে দিকে ওর মনিব সবসময়েই সজাগ দৃষ্টি রাখে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবনের ডাক

দেখতে দেখতে অনেকগুলো মাস চলে গেল। খুব আরামেই এখন হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিনগুলো কাটছিল—দক্ষিণের এই প্রাচুর্যের দেশে খালি পেট ভরে খাওয়া, ঘুমোনো আর প্রভুর সঙ্গে বেড়ানো ছাড়া তার অন্য কোনও কাজ ছিল না। এখানকার মানুষরাও সবাই দয়ালু, তারা সবাই ওকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য পোষমানা গৃহস্থ বাড়ির কুকুরদের সঙ্গে হোরাইট ফ্যাঙ-এর কোথায় যেন একটা তফাৎ রয়ে গেল—ওর ভেতরে কোথায় যেন একটা বুনো নেকড়ে লুকিয়ে রইল। এখানকার অন্য কোনও কুকুরের সঙ্গে তার কিছুতেই কোনরকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠল না। হোয়াইট ফ্যাঙকে সব কুকুরই সন্দেহের চোখে দেখত—ওকে দেখলেই তাদের মনে কেমন যেন বন্য জগতের একটা আদিম ভীতি জেগে উঠত। হোয়াইট ফ্যাঙও কোনও কুকুরের সঙ্গে মিশবার কোনও রকম আগ্রহই দেখাল না। নিঃসঙ্গভাবে দিন কাটিয়েই সে এত বড় হয়েছে। তাছাড়া, ছোটবেলায় 'লিপ্‌-লিপ'-এর অত্যাচার সহ্য করে আর 'বিউটি স্মিথ'-এর কাছে প্রত্যেক দিন বিভিন্ন কুকুরের সঙ্গে মরণপণ লড়াই করে গোটা কুকুর জাতটার ওপরেই তার হয়ে গিয়েছিল ঘোর বিতৃষ্ণা। এখানে কোনও কুকুরের সঙ্গেই অবশ্য ওর লড়াই

করবার দরকার হয়নি। ওর হিংস্র মূর্তি আর ঝকঝকে দাঁত দেখেই অন্য কুকুরেরা পালিয়ে যেত। তবে কোলিকে নিয়েই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর ছিল যত ঝামেলা কোলি কিছুতেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর উপস্থিতি সহ্য করতে পারত না। এখানে আসবার পর প্রথম প্রথম যে হোয়াইট ফ্যাঙ কয়েকটা পোষা মুরগীকে মেরে ফেলেছিল, সেটা আর কোলি কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। বাড়ির মাঠে, আস্তাবলে যেখানেই হোয়াইট ফ্যাঙ ঘুরতে যেত, তার পেছনে ঠিক ছায়ার মতো লেগে থাকত কোলি, আর চেঁচিয়ে লাফালাফি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত। ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হোয়াইট ফ্যাঙ একটা উপায় বার করেছিল তা হল, শুয়ে পড়ে দুই থাবার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমের ভান করা। কোলি এতে হতভম্ব হয়ে চুপ করে যেত।

কোলি ছাড়া অবশ্য হোয়াই ফ্যাঙ-এর জীবনে এখন আর কোনও ঝামেলা ছিল না। এমনকি, দক্ষিণ দেশের গরম আবহাওয়াও ওর গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মে যখন খুব গরম পড়ত, তখন ওর খানিকটা অস্বস্তি হতো, ছটফটানি বেড়ে যেত। খুব আচ্ছন্নভাবে সেই সময় ওর কন্‌কনে ঠাণ্ডা সুদূর উত্তরের কথা মনে পড়ে যেত।

হোয়াইট ফ্যাঙ-এর স্বভাবে, ব্যবহারেও এসেছিল অনেক পরিবর্তন। আগে ও কোনদিন কোনও মানুষের হাসিঠাট্টা সহ্য করতে পারত না—ওকে লক্ষ্য করে কেউ হাসলেই রাগে যেন ও পাগল হয়ে যেত। কিন্তু এর প্রিয়তম প্রভু উইডন যখন ওর হাবভাব দেখে হেসে উঠত, তখন ও রেগে উঠতে পারত না কিছুতেই। প্রথম প্রথম ও খুব গম্ভীর, আড়ষ্ট হয়ে যেত। তাতে উইডন মজা পেয়ে আরো বেশি করে হাসত। শেষ পর্যন্ত মনিবের হাসির তোড়ে ওর পক্ষেও আর গম্ভীর হয়ে থাকা সম্ভব হত না—চোয়াল ফাঁক করে, ঠোঁট দুটো একটু তুলে, সে-ও যেন প্রভুর হাসির উত্তর দিত। এ ছাড়া প্রভুর সঙ্গে নানারকম খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপও চলত ওর—উইডন খেলাচ্ছলে ওকে ধরে উল্‌টে ফেলে দিত, গড়াগড়ি খাওয়াত। হোয়াইট ফ্যাঙও কপট রাগ দেখিয়ে গজরাত। প্রভুকে কামড়াবার ভান দেখিয়ে শূন্যে কামড় বসাত। বহুক্ষণ এভাবে খেলা চলবার পর দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলত। আর হোয়াইট ফ্যাঙ প্রভুর বগলের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে চাপা গলায় ঘড়ঘড় করে যেত।

হোয়াইট ফ্যাঙ-এর প্রধান কাজ অবশ্য ছিল, প্রভু যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোত, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলা। দিনে পঞ্চাশ মাইল দৌড়েও হোয়াইট

ফ্যাঙ কখনো ক্লান্ত হত না—অনায়াস, স্বচ্ছন্দ লঘু গতিতে দৌড়ে চলত সে। একদিন এইভাবে তারা চলেছে। এমন সময় হঠাৎ ঘোড়াটা চমকে গিয়ে এমনভাবে হোঁচট খেল যে, ছিটকে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে উইডনের একটা পা গেল ভেঙে। উঠবার চেষ্টা করে উইডন দেখল, সে উঠতে পারছে না।

হোয়াই ফ্যাঙ প্রভুর অবস্থা দেখে ঘোড়াটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। উইডন ওকে ডেকে বলে উঠল—'এই বাড়ি যা। শিগ্‌গীর বাড়ি ফিরে গিয়ে খবর দে।'

'বাড়ি' কথাটার মানে হোয়াইট ফ্যাঙ বুঝত। তবে প্রভুকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে সে চলে যেতে চাইছিল না। কিন্তু উইডন যখন কড়া গলায় তাকে আবার বাড়ি যেতে বলল, তখন আর ও দাঁড়াল না। উইডন পরিবারের সবাই তখন বাড়ির সামনের বারান্দায় বসেছিল। দৌড়তে দৌড়তে, সর্বাঙ্গে ধুলো মেখে তাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল হোয়াইট ফ্যাঙ। প্রথমে সবাই ভেবেছিল, উইডন বোধহয় ফিরে এসেছে। বাচ্চ দুটো লাফাতে লাফাতে এসে ওকে ঘিরে ধরল। কিন্তু এক ঝটকায় তাদের উল্টে ফেলে দিয়ে উইডনের বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গজরাতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। কি ঘটেছে, তা জানাবার আপ্রাণ চেষ্টায় ওর সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কণ্ঠনালী ফুলে ফুলে উঠছিল। এবার গজরানি থামিয়ে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। ওর হাবভাব দেখে সবাই খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল—এ রকম করছে কেন হোয়াইট ফ্যাঙ? উইডনের বাবা বলে উঠলেন—'যতই হোক আসলে তো এটা একটা নেকড়ে। নেকড়েদের বিশ্বাস করা মোটেই উচিত নয়।' উইডনের মা-ও খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন—'কি জানি বাবা, পাগল টাগল হয়ে যাচ্ছে না তো ও? আমি কিন্তু প্রায়ই উইডনকে বলি যে, এত গরম আবহাওয়া ওর সহ্য হবে কিনা সন্দেহ।' উইডনের ছোট বোন বেথ কিন্তু আসল ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পেরেছিল। সে জানাল—'না মা, আমার মনে হয় ও কিছু বলতে চেষ্টা করছে।' ঠিক এই সময়েই প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল হোয়াইট ফ্যাঙ, এতক্ষণে তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল। জীবনে এই প্রথমবার এইভাবে ঘেউ ঘেউ করে ডাকল সে। এবার উইডনের স্ত্রী বলে উঠল—'নিশ্চয়ই উইডনের কোনও বিপদ হয়েছে, সেটাই ও জানাতে এসেছে। এতে আর কোনও সন্দেহ নেই।' সবাই এতক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। হোয়াইট ফ্যাঙ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার ফিরে চলল, আর পেছন ফিরে ফিরে দেখতে লাগল সবাই তার পেছন পেছন আসছে কিনা। পেরেছে সে তার কথা সবাইকে বোঝাতে পেরেছে।

এই ঘটনার পরে 'সিয়েরা ভিস্টা' পরিবারের কাছে হোয়াইট ফ্যাঙ আরো বেশি প্রিয় হয়ে উঠল। উইডনের বাবা বিচারপতি মিঃ স্কট কিন্তু তাঁর মত বদলালেন না—অভিধান খুলে, জীববিজ্ঞানের বই ঘেঁটে প্রমাণ করে দিলেন যে হোয়াইট ফ্যাঙ একটি খাঁটি নেকড়ে।

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে বাতাসে আবার শীতের ছোঁয়া লাগল। হঠাৎ একদিন হোয়াইট ফ্যাঙ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, কোলির ব্যবহারে এসেছে এক আমূল পরিবর্তন। তার কামড়ে আর সেই তীব্রতা, হিংস্রতা নেই,—সে এখন আদর করে হোয়াইট ফ্যাঙের গায়ে আস্তে দাঁত বসিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে খেলতে চাইছে। হোয়াইট ফ্যাঙও কোলির সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল,—এতদিন ধরে কোলি যে ওর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল তা ভুলে গিয়ে কোলির ডাকে সাড়া দিল সে। বাড়ির পেছনের বাগানে, জঙ্গলে খেলায় মেতে উঠল দু'জনে মিলে।

সেদিন বিকেলে উইডন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবে—দরজায় ঘোড়া তৈরী। চরম দোটানার মধ্যে পড়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ একদিকে প্রভুর প্রতি ভালবাসা অন্যদিকে জীবনের, প্রকৃতির ডাক। কি এক অচেনা, অজানা জৈব আহ্বান যেন হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সমস্ত অনুভূতিকে, চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—প্রভুর প্রতি ভালবাসার চাইতেও যেন সে আকর্ষণ আরো তীব্রতর হয়ে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে কোলি ওকে খেলাচ্ছলে কামড়ে দিয়ে দৌড়তে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙও অনুসরণ করল তাকে। সেদিন তার প্রিয় প্রভু উইডন একলাই ঘোড়ায় চড়ে বেরোল। আর বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি দৌড়ে চলল হোয়াইট ফ্যাঙ আর কোলি।—ঠিক একইভাবে অনেক বছর আগে সুদূর উত্তরের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি দৌড়েছিল হোয়াইট ফ্যাঙ-এর মা 'কিচে' আর বুড়ো একচোখা নেকড়েটা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঘুমন্ত নেকড়ে

ঠিক এই সময়েই খবরের কাগজগুলো 'জিম হল' নামে একটা জেল পালানো ভয়ংকর খুনীর কথা খুব ফলাও করে ছাপছিল। 'সান কোয়েণ্টিন'-এর মতো সুরক্ষিত জেলখানা থেকে সে যে কিভাবে উধাও হয়ে গেল, সেটাই কেউ বুঝে উঠতে

পারছিল না। জিম হল ছিল একেবারে খাঁটি একটি নরপশু। ঠিক হিংস্র জানোয়ারের মতোই একরাতে স্রেফ দাঁত দিয়ে তার কুঠরির প্রহরীর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে সে পালিয়েছিল। জেলের বাইরে যাবার পথে আরো দু'জন প্রহরীকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিল। প্রহরীদের বন্দুক আর টোটাগুলোও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে। ওকে জীবিত বা মৃত ধরবার জন্য মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও ফল তো হয়নি বটেই, বরং উল্টে তাকে যারা ধরতে চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যেই অনেকে মারা পড়েছিল।

জিম হল-এর পালানোর খবর পড়ে সিয়েরা ভিস্টার স্কট পরিবার খুবই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বিচারপতি মিঃ স্কট অবশ্য বাড়ির মেয়েদের দুশ্চিন্তা দেখে হাসতেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ সত্যি সত্যিই ছিল। উনি চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার ঠিক আগে তাঁর কাছেই জিম হল-এর বিচার হয়েছিল; উনি জিম হলকে পঞ্চাশ বছর কারাবাসের আদেশ দিয়েছিলেন। রায় শুনে আদালতে সকলের সামনেই জিম হল প্রতিজ্ঞা করেছিল যে একদিন না একদিন সে বিচারপতি স্কটের ওপর প্রতিশোধ নেবেই। আর সত্যি সত্যিই সেবার জিম হল নির্দোষ ছিল। পুলিশ নিজের বাহাদুরি দেখানোর জন্য সাজানো সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে ওকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছিল। বিচারপতি স্কট অবশ্য সে সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কিন্তু জিম হল মনে করেছিল, বিচারপতি স্কট পুলিশের সঙ্গে যোগসাজস করেই তার প্রতি এত বড় একটা অন্যায় অবিচার করেছেন। তার চোখে বিচারপতি স্কটই ছিলেন পয়লা নম্বরের দুশমন।

হোয়াইট ফ্যাঙ অবশ্য এসব কিছু জানত না। কিন্তু ইদানীং প্রতি রাতে সবাই শুয়ে পড়ার পর উইডনের স্ত্রী এ্যালিস চুপি চুপি উঠে হোয়াইট ফ্যাঙকে নিঃশব্দে একতলার হলঘরে ঢুকিয়ে নিত, আবার ভোরবেলায় কেউ ঘুম থেকে উঠবার আগেই বাইরে বার করে দিত।

বেশ কয়েকদিন এইভাবে কাটবার পর একদিন রাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে চুপ করে শুয়ে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ। বাতাস শুঁকে এক অপরিচিত একটা গন্ধ পেল সে। —কোনও অচেনা মানুষেরই গন্ধ। তারপর তার কানে এল চলাফেরার আওয়াজ, নিঃশব্দে অন্ধকারে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। হোয়াইট ফ্যাঙ চেঁচাল না, কোনও আওয়াজও করল না। বনের জীবনে তাকে শিকার করেই খাবার জোগাড় করতে হত; তাই সে ভালভাবেই জানে যে একদম নিঃশব্দে, চুপিচুপি গিয়ে শিকার ধরতে হয়। তাই, এই অপিরিচিত মানুষটা মতই আস্তে আস্তে চলাফেরা করুক

না কেন, তার চাইতেও বেশি আস্তে হালকা পায়ে তার পিছু নিল হোয়াইট ফ্যাঙ। লোকটা এবার হলঘরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গেল।—সেখানেই ঘুমিয়ে আছে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর প্রিয়তম প্রভু আর তার নিকটতম আপনজনেরা। হোয়াইট ফ্যাঙ আর অপেক্ষা করল না, নিঃশব্দে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই থাবা দিয়ে লোকটার কাঁধ আঁক্‌ড়ে ধরে পেছন দিক থেকে তার ঘাড়ে কামড় বসাল সে, তারপর দু'জনেই গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। হোয়াইট ফ্যাঙ সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে সরে গেল, আর লোকটা উঠে বসতে চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাড়ির সবাই এতক্ষণে চমকে জেগে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল একতলার অন্ধকার হলঘরে যেন একপাল শয়তান লড়াই করছে। গুলির আওয়াজ, জানোয়ারের গর্জন, মানুষের গলার আর্ত, তীব্র চিৎকার আসবাবপত্র উল্টোনোর, কাচ ভাঙার শব্দ,—সব মিলিয়ে যেন একটা নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হল। মিনিট তিনেক ধরে চলল এই ব্যাপার; তারপর আচমকা যেমন সব শুরু হয়েছিল, তেমন আচমকাই সব চুপচাপ হয়ে গেল। বাড়ির সবাই এখন সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিচের অন্ধকার থেকে জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌ ওঠার মতো একটা আওয়াজ ভেসে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা থেমে গেল। তারপর সব নিঃস্তব্ধতার মধ্যে থেকে শোনা যেতে লাগল একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ,—যেন কেউ খুব কষ্ট করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

উইডন সুইচ টিপে আলো জ্বালাল তারপর বাবার সঙ্গে দু'জনেই রিভলভার হাতে নিয়ে খুব সাবধানে নিচে নামল। সাবধান হওয়ার অবশ্য আর কোনও দরকার ছিল না—যা করার তা হোয়াইট ফ্যাঙ-ই করে দিয়েছে। চারিদিকে ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের স্তূপের মধ্যে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়েছিল। উইডন হেঁট হয়ে লোকটাকে উল্টে দিল—দেখা গেল, লোকটার গলায় একটা গভীর ক্ষত। লোকটার মুখ দেখে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন বিচারপতি সকট। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে উঠলেন—'জিম হল।'

এবার দু'জনেই হোয়াইট ফ্যাঙ-এর দিকে নজর দিলেন। চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়েছিল সে। এই অবস্থাতেও প্রভুর উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খুলে লেজ নাড়তে চেষ্টা করল হোয়াইট ফ্যাঙ। উইডন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গলা থেকে একটা দুর্বল, ক্ষীণ আওয়াজ বেরোল। তারপরেই ওর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল, শরীর এলিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে।

'বেচারা অল্পক্ষণের মধ্যেই মরে যাবে'—ধরা গলায় বলে উঠল উইডন স্কট।

'দেখা যাক কি করা যায়'—ডাক্তারকে টেলিফোন করতে করতে উত্তর দিলেন মিঃ স্কট।

এতক্ষণে ভোর হয়ে এসেছিল—বাড়ির সবাই এসে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারবাবু ঘণ্টা দেড়েক ধরে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর চিকিৎসা করে হতাশভাবে মাথা নাড়লেন—'সত্যি কথা বলতে কি। ওর বাঁচবার সম্ভাবনা যে নেই বললেই চলে, হাজারে কেন দশ হাজারে-ও এরকম কেস একটাই বাঁচে। পেছনের একটা পা আর পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙেছে। অন্ততঃ একটা ভাঙা হাড় ওর ফুস্‌ফুসও ফুটো করে দিয়েছে। শরীরের প্রায় সব রক্তই বেরিয়ে গিয়েছে। শরীরের ভেতরেও চোট লেগেছে। এ ছাড়া তিন তিনটে বুলেট এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।'

ডাক্তারবাবুর মতামত শুনে মিঃ স্কট বলে উঠলেন 'তাহলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখব। ওর চিকিৎসার এক বিন্দু ত্রুটিও যেন না হয়—খরচপত্র কি লাগবে না লাগবে, সেটা কোনও ব্যাপারই নয়। উইডন এখুনি একবার সান ফ্রান্সিসকোতে ডাক্তার নিকোল্‌স্‌কে কোন করো। ডাক্তারবাবু আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। আমি ওকে চিকিৎসার যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে, সবই দিতে চাই। কোনরকম চেষ্টা করতেই আমি বাদ দেব না।'

ডাক্তারবাবু একটু হেসে বললেন—'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। —এটা খুবই স্বাভাবিক। চিকিৎসা ছাড়াও যেটা এখন ওর পক্ষে সব চাইতে দরকারী, তা হল ঠিকমত সেবা শুশ্রূষা। ছোট, রুগ্ন বাচ্চাকে যেভাবে পরিচর্যা করতে হয়, ওকেও ঠিক সেভাবেই সারাক্ষণ দেখাশোনা করতে হবে। আমি এখন চলি, এগারোটার সময় আবার আসব।'

যে সেবা শুশ্রূষা হোয়াইট ফ্যাঙ পেল, তার সত্যিই কোনও তুলনা হয় না। মিঃ স্কট প্রস্তাব করেছিলেন, একজন শিক্ষিত, অভিজ্ঞ নার্স নিয়ে আসা হোক। বাড়ির মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিল। তারা বলল, হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সমস্ত পরিচর্যার ভার তারাই নেবে। আর সত্যি সত্যিই যেভাবে দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তারা পালা করে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর সেবা শুশ্রূষা করে গেল, তা জানোয়ার কেন, কোনও মানুষের ভাগ্যেও কম জোটে।

আস্তে আস্তে সেরে উঠতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। দশ হাজারে যে রোগী একটাও বাঁচে না, সেরকম অবস্থা থেকেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল সে। ডাক্তারবাবু একটা ভুল করেছিলেন। এ যাবৎ যত কুকুরের তিনি চিকিৎসা করেছেন

তারা সবাই দক্ষিণ দেশের পোষা, গৃহপালিত সভ্য কুকুর। তাদের শরীর নরম, আয়েসী, শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতাও সীমিত। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। সুদূঢ় উত্তরের মেরু অঞ্চলের নেকড়ে সে।—বনে জঙ্গলে গুহায়, নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে সে বড় হয়েছে। তার ইস্পাত কঠিন শরীরে ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি। তাই নিশ্চিত মৃত্যুও হার মানল তার অদম্য প্রাণশক্তি আর স্কট পরিবারের মেয়েদের সেবার কাছে।

আষ্টেপৃষ্টে প্লাস্টার আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বহু সপ্তাহ শুয়ে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ। প্রায় সব সময়েই সে ঘুম আর আচ্ছন্নতার ঘোরের মধ্যে তলিয়ে থাকত। নানারকম দুঃস্বপ্ন তাকে তাড়া করে ফিরতো—লিপ্‌লিপ্‌ এর অত্যাচার, বন বিড়ালের আক্রমণ, সবই তার স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে ফিরে আসত বার বার। কখনো বা সে দেখত, আকাশ থেকে বাজপাখি ছোঁ মেরে নামছে—নামতে নামতে হঠাৎ সেটা হয়ে গেল কর্কশ শব্দ করে ছুটে চলা একটা বৈদ্যুতিক ট্রাম। আবার অন্য অনেক সময় তার মনে হত, সে যেন বিউটি স্মির-এর খাঁচার মধ্যে বন্দী। খাঁচার দরজা দিয়ে একটা কুকুর তার সঙ্গে লড়াই করার জন্য ঢুকল। আর ঢুকেই সেটা হয়ে গেল একটা বৈদ্যুতিক গাড়ি। বার বার নানা বিভীষিকা দেখে সে ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠত।

অবশেষে একদিন ওর গা থেকে সব প্লাস্টার, ব্যাণ্ডেজ খুলে নেওয়া হল। 'সিয়েরা ভিস্টা' পরিবারের কাছে সেটা হয়ে উঠল একটা উৎসবের দিন—সবাই এসে ওর কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। ওর মনিব ওর কানের পেছনটা, চুলকে দিল, আর উইডনের স্ত্রী অ্যালিস ওকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'বাহাদুর নেকড়ে।' বাড়ির আর সবাই হাততালি দিয়ে উঠে একযোগে হোয়াইট ফ্যাঙের এই নতুন নামটাকে মেনে নিল। হোয়াইট ফ্যাঙ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বারবার সে পড়ে যেতে লাগল—ওর শরীরে আর একফোঁটা শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু হোয়াইট ফ্যাঙ এতে খুব লজ্জা পেয়ে গেল—ওর মনে হল, ও যেন ওর প্রিয়তম মনিবের কাজ ঠিকমত করতে পারছে না। বারবার চেষ্টা করতে করতে মনের সবটুকু জোর দিয়ে একসময় টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। বাড়ির সব মেয়েরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—'বাহাদুর নেক্‌ড়ে।'

বিচারপতি স্কট এবার বলে উঠলেন—'তাহলে, নিজের মুখেই তোমরা স্বীকার করলে যে হোয়াইট ফ্যাঙ আসলে একটি নেকড়ে। যেভাবে ও বেঁচে উঠল, কোনও কুকুরের পক্ষে কিছুতেই সেটা সম্ভব ছিল না। এটা একেবারে খাঁটি নেকড়ে।'

'হ্যাঁ, তবে বাহাদুর নেকড়ে'—উত্তর দিলেন মিসেস্ স্কট।

'ঠিক আছে, এখন থেকে তা হলে এই নামেই ওকে ডাকা হবে। আমি মেনে নিচ্ছি, এ সত্যিই এক বাহাদুর নেকড়ে।' —বিচারপতি রায় দিলেন।

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন—'ওকে আবার নতুন করে হাঁটতে শিখতে হবে। আস্তে আস্তে ওকে বাইরের রোদে নিয়ে যান, কোনও ক্ষতি হবে না।'

রাজার মতো সম্মানে বাইরে বেরিয়ে এল হোয়াইট ফ্যাঙ—পেছনে পেছনে চলল 'সিয়েরা ভিস্টা' পরিবারের প্রতিটি লোক। আস্তে আস্তে হেঁটে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে আস্তাবলের দরজা পর্যন্ত এল এই অপূর্ব শোভাযাত্রা। সেখানে কোলি গোটা ছয়েক মোটাসোটা, মিষ্টি বাচ্চা নিয়ে শুয়েছিল, বাচ্চাগুলো ওর চারদিক ঘিরে সকালের হাল্কা রোদে খেলা করছিল।

হোয়াইট ফ্যাঙ অবাক চোখে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। কোলি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠল ওকে। উইডন একটা বাচ্চাকে পা দিয়ে ঠেলে ওর দিকে এগিয়ে দিল। বাচ্চাটা এসে ওর নাকে নাক ঠেকাল, নরম, গরম ছোট্ট জিভে দিয়ে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গাল চেটে দিল। হোয়াইট ফ্যাঙ প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেছিল। কিন্তু কিছু না ভেবেই হঠাৎ সে-ও নিজের জিভ দিয়ে বাচ্চাটার মুখ চেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। হোয়াইট ফ্যাঙ খুব আশ্চর্য হয়ে ওদের দিকে তাকাল। তারপরেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল সে।—দুর্বল শরীরে বেশিক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। শুয়ে শুয়ে বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল হোয়াইট ফ্যাঙ। বাচ্চাগুলো এবার সব ক'টাই এগিয়ে এল ওর দিকে। কোলির অবশ্য ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছিল না। বাচ্চাগুলো এসে হোয়াইট ফ্যাঙ-এর গায়ে পিঠে চড়তে লাগল, খেলা করতে লাগল। গম্ভীরভাবে তাদের এই চঞ্চলতা মেনে নিল হোয়াইট ফ্যাঙ। মনিবদের হাততালিতে, কথাবার্তায় ও একটু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাগুলোর খেলাধুলো, খুনসুটিতে শিগ্গীরই সব আড়ষ্টতা কেটে গেল তার। মিঠে রোদে আরাম করে শুয়ে বাচ্চাগুলোর দুষ্টুমি উপভোগ করতে করতে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমোতে লাগল হোয়াইট ফ্যাঙ। এতদিনে তার জীবনে এসেছে চরম পরিপূর্ণতা।

পুরুষের বিশ্বাস

THE FAITH OF MEN

সকাল আটটা বেজে গেছে বটে, কিন্তু সূর্য ওঠেনি। বাইরে ঘন অন্ধকার। লরেন্স পেন্টফিল্ড আর কোরি হাচিনসন নিজেদের কেবিনে বসে সমানে তর্কাতর্কি করে চলেছে। কাছেই একটা ছোট টেবিলের ওপর খালি একটা হুইস্কির বোতলের মুখে চর্বির তৈরি মোমবাতি আটকানো—সেটা থেকে চর্বি গলে গলে টেবিলের ওপর পড়ে যেন একটা বরফের ঢিপি উঁচু হয়ে উঠছে। ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে দুটো ঝুলন্ত বিছানা লাগানো।

লরেন্স পেন্টফিল্ড আর কোরি হাচিনসন—এরা দু'জনেই খুব সাধাসিধে আর অমায়িক। ওদের খোলামেলা কথাবার্তা, সহজ চালচলন দেখে বোঝাই যেত না যে "ক্লনডাইক" অঞ্চলে ওদের চাইতে বড় সোনার খনির মালিক বোধহয় আর কেউ তখন ছিল না। ওরা দু'জনে যে খনিটার অংশীদার, তা থেকে প্রত্যেকদিন হাজার হাজার ডলারের সোনা পাওয়া যেত।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হাচিনসন বলে উঠল—'দূর ছাই, দু'জনে মিলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়।'

পেন্টফিল্ড বেশ কড়া চোখে ওর অংশীদার, অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আর সারাক্ষণের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে এক ধমক লাগাল—'ঝামেলাটা আবার কোথায়? তুমিই তো মিছিমিছি গোঁ ধরে বসে আছ। তোমাকে তো আমি বারবার বলছি, এখুনি বাড়ির দিকে রওনা দাও। আমি এদিকটা সামলাচ্ছি, পরের বছর না হয় আমি ঘুরে আসব।'

হাচিনসনের কিন্তু সেই এক গোঁ—'কেন, আমিই বা এবার যাব কেন? আমার জন্য তো আর কেউ অপেক্ষা করে বসে নেই। তোমারই যাওয়াটা আরো অনেক বেশি জরুরী। তোমার বাগদত্তা প্রেমিকা আর কতদিন তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবেন?'

'আরো এক বছর না হয় বসে থাকবেন, তাতে তাঁর এমন কিছু বয়স বেড়ে যাবে না। তোমারও তো বাড়িতে বাবা-মা, ভাই-বোন আছে—সে কথাটা কি একেবারে ভুলে

বসে আছ নাকি ?'—পেন্টফিল্ড এবার সত্যি সত্যিই চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'তার মানে, পুরো তিন-তিনটে বছর তুমি পৃথিবীর এই জঘন্যতম জায়গাটাতে আটকে থাকবে ?'—হাচিনসন আর্তনাদ করে উঠল প্রায়। পেন্টফিল্ডের চাইতেও বছর তিনেকের ছোট—এখনো ওর বয়স ছাব্বিশ পেরোয়নি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর মনের সমস্ত স্বাভাবিক সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা-গুলোকে জোর করে চেপে রাখার জন্য ওর চোখে মুখে একটা হতাশ ব্যগ্রতার ছাপ ফুটে উঠেছে। পেন্টফিল্ডের চোখমুখেরও একই অবস্থা। ও এবার বলে উঠল—"জান, কোরি, কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন 'জিন্‌কা' হোটেলটায় বসে আছি। চারদিকে দারুণ নাচগান হৈ হুল্লোড় চলছে, গ্লাসের টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে। সুন্দরী মেয়েদের হাসির শব্দ ভেসে আসছে। আর আমি তোফা আরামে বসে টাট্‌কা সব খাবারের অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি—ডিম সেদ্ধ, ডিমের অমলেট, পোচ—ওঃ সে যে কত রকমের খাবার। সে আর কি বলব। আমিও গোগ্রাসে সেগুলো খেয়ে চলেছি।"

"হুঁ, ভারি কাজ করেছ"—জিভের জল সামলে হাচিনসন বলল—"আমি হলে তার সঙ্গে টাট্‌কা কাঁচা পেঁয়াজ আর স্যালাডের অর্ডার দিতাম, বুঝলে ?"

"আরে আমার যে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। নইলে কি আমিও এগুলো অর্ডার দিতে ছাড়তাম নাকি ?' পেন্টফিল্ড চট্‌পট্‌ জবাব দিল।

একটুখানি সময় দু'জনেই চুপ করে বসে থেকে দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে রইল। তারপর হাচিনসন আবার বলে উঠল—"শোন লরেন্স, একটা কাজ করা যাক্‌। এসো, আমরা টস করি। তিনবার 'টস' করা হবে। দু'বার হেড পড়লে তুমি দেশে যাবে, দু'বার 'টেল' পড়লে আমি। কি, ঠিক আছে তো ?

"পুরোপুরি ঠিক, খুব ভালো বুদ্ধি।"—পেন্টফিল্ড সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

হাচিনসন পকেট থেকে একটা চক্‌চকে রুপোর টাকা বার করে এনে তালুর মধ্যে সেটাকে রেখে বেশ করে উল্টে পাল্টে নিল। তারপর দু' আঙুলের টোকায় টাকাটাকে ওপরে ছুঁড়ে দিল। লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গিয়ে আবার নিচে নেমে আসতে লাগল সেটা। দুই বন্ধু সম্মোহিতের মতো টাকাটার দিকে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল। টাকাটা মাটিতে পড়ে একটু ঘুরল, তারপর পড়ে গিয়ে আস্তে আস্তে থেমে গেল। দু'জনেই একসঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়ল।

"হেড।"

দু'জনের কারুর মুখেই কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তবে শত চেষ্টা সত্ত্বেও পেন্টফিল্ড-এর চোখ দুটো একটু যেন চক্‌চক্‌ করে উঠল। আর নিজের অজান্তেই

হাচিনসন-এর দু' চোখে খেলে গেল একটু বিষাদের ছায়া।

দ্বিতীয়বার 'টস' করল হাচিনসন। এবার আর টাকাটা মাটিতে পড়ে বেশিক্ষণ ঘুরল না, এক লাফ ঘুরেই থেমে গেল।

"টেল।"

নিজেদের অজান্তেই দু'জনের বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। শেষবারের মতো 'টস' করতে তৈরী হল হাচিনসন। চাপা উত্তেজনার দু'জনেই এখন ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। প্রায় অবশ হাতে হাচিনসন মাটি থেকে টাকাটা কুড়িয়ে নিল। তার তালু দরদর করে ঘামছিল, আঙ্গুল কাঁপছিল। টস করতে গিয়ে ওর হাত থেকে প্রথমবার টাকাটা পিছলে হাত থেকে বেরিয়ে গেল।

"আরে করছটা কি? তাড়াতাড়ি কর। তিনবার 'টস' করতে কি সারাটা দিন কাটিয়ে দেবে নাকি?' পেন্টফিল্ড প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। নিজেকে সামলে রাখবার জন্য ও এত জোরে টেবিলের কোনাটা খামচে ধরেছিল যে ওর নখগুলো একেবারে বেঁকে গেছিল। আঙ্গুলের গাঁটগুলো সাদা, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল।

এবার টাকাটা পড়ে বেশ একটু ঘুরল, খানিকটা গড়িয়ে গেল, তারপর থামল।

"টেল।"

হাচিনসন প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখল। আড়চোখে একবার বন্ধুর দিকে তাকাল সে! পেন্টফিল্ড-ও আড়চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে চোখেমুখে এমন একটা উদাসীন ভাব ফুটিয়ে তুলল যেন এ নিয়ে ওর কোনও মাথাব্যথাই নেই।

হাচিনসন একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল। এভাবে জেতাটা ওর কাছে খুব অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই পেন্টফিল্ড ওকে এক ধমক লাগাল—"কোরি একদম চুপ করে থাক। তুমি কি বলতে চাইছ আমি জানি—আমাকেই দেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এখানে থাকতে চাইছ। কিন্তু সেটি আমি তোমাকে করতে দিচ্ছি না। তোমাকে এবার ডেট্রয়েটে নিজের বাড়িতে যেতেই হবে। তাছাড়া, আমি গেলে যে কাজটা করতাম, আমার হয়ে সেই কাজটা তুমি-ই করতে পারবে। তুমি যখন ফিরবে, তখন আমার বাগ্‌দত্তাটিকেও তুমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, বুঝেছ? আমাদের বিয়েটা সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর বদলে না হয়ে এখানে এই 'ডসনে'ই হবে, কি বল?"

পেন্টফিল্ড-এর মতলব শুনে কিন্তু হাচিনসন দারুণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল—"আরে, কি বলছটা কি? আমি তোমার বাগদত্তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব? আমি তো তাঁকে চিনিই না। তিনিও আমাকে কখনো দেখেন নি। অবশ্য

তাতে আমার কিছুই আসে যায় না, তাঁকে নিয়ে আসতেও আমার কোনো অসুবিধে নেই। তুমি আমাকে ভালভাবেই চেনো। কিন্তু এতখানি পথ আমি আর সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এক তরুণী মহিলা একসঙ্গে আসব—লোকে কি ভাববে, কি বলবে, পেন্টফিল্ড ? নাঃ, তা হয় না, তার চাইতে আমি যা বলছি শোনো। এই অবস্থায় যা করা উচিত, তাই কর। তুমিই বেরিয়ে পড় সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর দিকে, বৌকে নিয়ে ফিরে এস। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। পরের বছর আমি ঘরমুখো হব।'

বন্ধুর কথা শুনে পেন্টফিল্ড-এর মনে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। ওর মনে হল, এখুনি ও ছুটে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রেখে ও খুব জোরের সঙ্গে বলে উঠল—'না, কোরি, তা হয় না। তুমি অবশ্য সত্যিকারের বন্ধুর মতোই কথা বলেছ। কিন্তু আমার তো বিবেক বলে একটা জিনিস আছে। তাছাড়া এইমাত্র একটা দারুণ মতলব মাথায় এসে গেছে।' টেবিলের ড্রয়ার হাঁট্‌কে চিঠি লেখার কাগজ আর পেন্সিল বার করে কি যেন লিখতে বসে গেল পেন্টফিল্ড। লেখা শেষ করে কাগজটা বন্ধুর হাতে তুলে বলল—'এই নাও, ধর। এই চিঠিটা ওর হাতে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হাচিনসন চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলো—'তা, তুমি কি করে জানলে যে ভদ্রমহিলার ভাই এরকম একটা জঘন্য রাস্তা পেরিয়ে তোমার কাছে আসতে রাজী হবে ?'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক রাজী হবে। আমার জন্য না হোক, নিজের বোনের জন্য এই কষ্টটুকু ও নিশ্চয়ই করবে।'—পেন্টফিল্ড খুব নিশ্চিন্তভাবে জবাব দিলো। 'আসলে ব্যাপারটা কি জান ? ওর এই ভাইটা মোটেই শক্তসমর্থ নয়, একেবারে ফুলবাবু গোছের। একলা বোনকে নিয়ে এতখানি কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসা ওর ক্ষমতায় কুলোবে না। কিন্তু তুমি ওদের সঙ্গে থাকলে আমার কোনো চিন্তাই থাকবে না। এখান থেকে বেরিয়ে তুমি সোজা ওদের বাড়িতে যাবে। ওর নাম হল ম্যাবেল। সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরে পৌঁছে যে কোনো ভাড়াটে গাড়ির চালককে 'মায়ার্ডন এ্যাভিনিউ, বিচারপতি হোমস্‌-এর বাড়ি বললেই সে তোমাকে চোখ বুঁজে ওদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। আমি ঠিক জানি, ওকে তোমার খুব পছন্দ হবে। এই দেখ, ওর ফটো।'—পেন্টফিল্ড ওর পকেট ঘড়ির পেছন দিকটা খুলে ফেললো—সেখানে এক অতি সুন্দরী ভদ্রমহিলার ফটো আঁটা আছে। হাচিনসন মনে মনে বন্ধুর রুচিকে তারিফ জানাল। ঘড়িটা বন্ধ করে পেন্টফিল্ড আবার বলে চলল—'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তুমি ম্যাবেলের সঙ্গে দেখা করে এখানে আসার জন্য ওকে

তৈরি হতে বলবে। তারপর ডেট্রয়েটে গিয়ে তোমার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করবে। শীতকালটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা এখানে আসার জন্য রওনা দেবে। ও, আর একটা কথা, আমার কয়েকটা দরকারী জিনিসও যদি তুমি···মানে··· বুঝতেই পারছ···' সপ্রতিভ পেন্টফিল্ড হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেলে আমতা আমতা করতে লাগল, চোখমুখ লাল হয়ে উঠল ওর। কোরি হো হো করে হেসে উঠে বলল—'আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি সব। নতুন সংসার পাতার জন্য তোমার বেশ কিছু সাজসরঞ্জাম দরকার, এই তো ?'

বন্ধুর কথায় পেন্টফিল্ডের সংকোচ কেটে গেল। এবার সে-ও প্রাণ খুলে হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোয়ালে, টেবিলের ঢাকনা, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়—এরকম বেশ কিছু গৃহস্থালির জিনিস চাই। একসেট খুব ভাল চিনেমাটির বাসনও। এখানকার এই জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেচারি ম্যাবেলের প্রথমটায় খুবই অসুবিধে হবে। তাই যতটা পারা যায়, ওকে একটু গুছিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, একটা পিয়ানোও এই সঙ্গে আনিয়ে নিলে কেমন হয় ?'

'খুব ভালোই হয়'—কোরি সোৎসাহে সময় দিল। পুরো ব্যাপারটা এখন তার কাছে খুব ভালো লাগছিল। বন্ধুকে আশ্বাস দিল—'বুঝলে লরেন্স, তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি তোমার বাগদত্তা, আর তার ভাইকে খুব ভালভাবে যত্ন করেই এখানে পেঁাছে দেব। ওদের কোনো কষ্টই হবে না।'

পরদিন পেন্টফিল্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাচিনসন বেরিয়ে পড়ল। জমে যাওয়া 'য়ুকন' নদীর বুকের ওপর দিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল ওর স্লেজ গাড়িটা। পেন্টফিল্ডও শূন্য মনে ফিরে গেল ওর সোনার খনিতে। কিন্তু খনির পরিবেশ যেন ওর কাছে এখন অনেক বেশি ক্লান্তিকর, একঘেঁয়ে হয়ে উঠল। কোনো কাজেই এখন যেন আর ওর মন বসছিল না। ওদের খনির পেছনে যে ছোট্ট পাহাড়টা ছিল, তার ওপর একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করতেই এখন পেন্টফিল্ড সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিল। খুব যত্নের সঙ্গে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটু একটু করে বাড়িটা তৈরী করাল ও। বাড়িটায় রইল তিনখানা বড় বড় ঘর, আর ঘরগুলোর প্রত্যেকটা কাঠই হল হাতে পালিশ করা, ঝকঝকে, মসৃণ। এই 'কেবিন' বাড়িটা তৈরি করতে পেন্টফিল্ডের খরচ হয়ে গেল অনেক—কিন্তু যে বাড়িতে ওর ম্যাবেল এসে সংসার পাতবে, সে বাড়ির জন্য কোনো খরচই ওর কাছে বেশি বলে মনে হল না। বাড়িটা তৈরি হয়ে গেলে সামনের ঘরটার টেবিলের সামনে পেন্টফিল্ড একট বড় ক্যালেণ্ডার টাঙাল। সকালে উঠে ওর প্রথম কাজই হয়ে দাঁড়াল ক্যালেণ্ডারে সেই দিনটার তারিখটাতে

একটা ঢ্যাঁরা কেটে দেওয়া, তারপর হাচিনসন সবাইকে নিয়ে এখানে এসে কবে নাগাদ পেঁছিতে পারে, তার হিসেব কষা। এই নতুন বাড়িতে ও অন্য কাউকেই ঢুকতে দিত না, তালাবন্ধ করে রাখত। ম্যাবেল যেন এসে ঘরগুলোকে একেবারে আনকোরা নতুন, ঝকঝকে অবস্থায় দেখে,—এটাই ছিল ওর একমাত্র চিন্তা। ও নিজে কেবিন বাড়িটায় ঢুকে এ ঘর ও ঘর করে বেড়াত, কোনো ঘরে একলা বসে গুনগুন করে গান করত। বাড়িটা থেকে যখন ও বেরিয়ে আসত, তখন উৎসাহে, আনন্দে ওর সারা চোখমুখ যেন জ্বলজ্বল করত।

ডিসেম্বরে কোরির কাছ থেকে প্রথম চিঠিটা এসে পেঁছিল। ম্যাবেলের সঙ্গে কোরির দেখা হয়েছে,—এই খবরের সঙ্গে চিঠিতে আছে ম্যাবেল সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, চিঠিতে ম্যাবেলের কথা পড়ে নতুন করে যেন পেন্টফিল্ডের সারা দেহমন আকুল হয়ে উঠল, রক্ত গরম হয়ে উঠল। এরপর থেকে প্রায়ই কোরির চিঠি আসতে লাগল,—ডাক আসতে দেরি হলে কখনো কখনো একসঙ্গে একাধিক চিঠিও। প্রত্যেকটা চিঠিরই বিষয়বস্তুই এক—কোরি হয় তক্ষুনি মায়ার্ডন অ্যাভিনিউ থেকে ফিরেছে, নয়তো সেখানে যাচ্ছে, আর তাও না হলে সেখানেই আছে। ডেট্রয়েটে কোরির নিজের বাড়ি যাওয়ার কোনরকম উল্লেখই কোনো চিঠিতে নেই। পেন্টফিল্ডের মনে মাঝে মাঝে কেমন যেন একটা খটকা লাগত,—ও ভাবত, 'আরে, কোরি তো দেখছি ম্যাবেলদের বাড়ি ছেড়ে আর নড়তেই চাইছে না! ডেট্রয়েটে নিজের বাড়ি যাওয়ার কোনরকম আগ্রহই তো ওর মধ্যে দেখছি না!' তবে, ম্যাবেল আর কোরি—এই দু'জনকেই ও এত ভালভাবে চিনত আর বিশ্বাস করত যে ওর মনে এই মেলামেশা নিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা বা সন্দেহ হয়নি কখনো। ম্যাবেলও তার চিঠিতে কোরির খুব প্রশংসা করত। ওর চিঠিতে অবশ্য এতখানি কঠিন পথ পেরিয়ে ডসনে এসে বিয়ে করার ব্যাপারেও যেন খানিকটা ভয় আর অনিচ্ছার মনোভাব ফুটে উঠত। পেন্টফিল্ড ম্যাবেলকে কোনরকম চিন্তাভাবনা করতে বারণ করত, ওর ভীরুতা নিয়ে চিঠিতে ঠাট্টাতামাসা করত। ও সবসময়েই ভাবত, এই দীর্ঘ, কঠিন রাস্তার কষ্টের কথা ভেবেই ম্যাবেল ঘাবড়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ শীতকাল নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে পেন্টফিল্ড শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠল। জানুয়ারির শেষদিক থেকে ও প্রায়ই ডসনে গিয়ে তাসের আড্ডায় সময় কাটাতে লাগল। হারজিতের তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া ভাবে খেলত বলে সব সময়েই ও তাসের বাজীতে দারুণ ভাবে জিতত। ওর আশ্চর্য তাস ভাগ্যের কাহিনী 'ডসনের' জুয়াড়িদের মুখে মুখে কিংবদন্তীর মতো ঘুরতে লাগলো। ফেব্রুয়ারির

মাঝামাঝি পর্যন্ত পেন্টফিল্ড একটানা এইভাবে জিতে চলল। তারপর একদিন একেবারে আকস্মিক ভাবে তাসখেলার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিল সে।

ঘটনাটা ঘটল 'অপেরা হাউস'-এ। পেন্টফিল্ড একটানা ঘণ্টাখানেক ধরে জিতবার পর নতুন করে তাস বাঁটা হচ্ছিল। এমন সময় ওর এক বন্ধু নিক ইনউড হঠাৎ মন্তব্য করল—'ওহে পেন্টফিল্ড, তোমার অংশীদার কোরি হাচিনসন কিন্তু দারুণ ওস্তাদ ছেলে—এটা মানতেই হবে।'

পেন্টফিল্ড উত্তর দিল—'হ্যাঁ, কোরি বরাবরই খুব ছটফটে আমুদে স্বভাবের ছেলে। তাছাড়া, এখানে তো দিনের পর দিন বেচারির কিছু করবার থাকে না, তাই এখান থেকে একবার ছাড়া পেলে ও যতটা পারে আমোদ আহ্লাদ করে এখানকার একঘেঁয়েমি সুদে আসলে পুষিয়ে নিতে চায়।'

'সেটা অবশ্য যার যেমন অভিরুচি'—হাসতে হাসতে জানালো ইনউড—'তবে কিনা, বিয়ে করে সংসারী হয়ে বসাটা আমার কাছে খুব একটা আমোদ আহ্লাদ করে বেড়ানোর মতো ব্যাপার নয়, তা সে তুমি যাই বল।'

'কে বিয়ে করেছে, কোরি'?—দারুণ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল পেন্টফিল্ড—কণ্ঠে অবিশ্বাস ভরা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কোরি। আজ সকালে সান্‌ফ্রান্সিসকো থেকে যে খবরের কাগজটা এসে পেঁছেছে—তাতেই বেরিয়েছে খবরটা।'

'ওঃ তাই নাকি? তা, বিয়েটা কার সঙ্গে হচ্ছে শুনি?—পাত্রীর নাম কি?' পেন্টফিল্ড এবার শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল। ওর মনে হচ্ছিল, ওকে নিয়ে বোধহয় একটা বিরাট ঠাট্টার জাল পাতা হয়েছে।

নিক ইন্‌উড পকেট থেকে খবরের কাগজটা বার করতে করতে বলল—'ওসব নামধাম আমার বড় একটা মনে থাকে না। মনে হচ্ছে মেয়েটার নাম ম্যাবেল না ঐরকম কি একটা যেন। একটু দাঁড়াও, হ্যাঁ, এই তো! বিচারপতি হোমস্‌-এর মেয়ে ম্যাবেল হোমস্‌।'

পেন্টফিল্ড ভেতরে ভেতরে দারুণ চমকে গেলেও তার মুখের একটা রেখাও কাঁপল না। ও নিশ্চিন্ত হল, বন্ধুরা ম্যাবেলকে নিয়ে একটা রসালো গল্প ফেঁদে ওকে বোকা বানিয়ে রাগাতে চাইছে। কিন্তু ও ভেবে পেল না, এই সুদূর উত্তরের লোকের কাছে তার আর ম্যাবেলের প্রেমের খবর পেঁছল কি করে? অগত্যা ও স্থির দৃষ্টিতে আশে-পাশের সব পরিচিত লোকদের মুখের দিকে তাকাল, বুঝতে চেষ্টা করল সবাই এক-জোট হয়ে তাকে নিয়ে কোনরকম ঠাট্টা করতে চাইছে কিনা। কিন্তু কৌতূহল ছাড়া

কারোর মুখেই আর কোনো কিছুর চিহ্ন পাওয়া গেল না। এরপর নিক ইনউডের দিকে ফিরে তাকিয়ে ও ঠাণ্ডা গলায় বলল—'ইনউড, আমি পাঁচশো ডলার বাজী রাখছি, তুমি যা বলছ তা ঐ খবরের কাগজটাতে ছাপা হয়নি।'

ইন্‌উড খুব অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—'আচ্ছা বাপু, ঠিক আছে। মিছিমিছি তোমার এতগুলো টাকা হাতাতে চাই না।'

পেন্টফিল্ড এবার একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে উত্তর দিল—'হ্যাঁ, আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।'

ইনউডের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। কাগজটা আর একবার ভালো করে খুঁটিয়ে পড়ল ও। তারপর পেন্টফিল্ডকে ডেকে বলল—"পেন্টফিল্ড তুমি কি আমাকে মিথ্যেবাদী বলতে চাইছ?'

পেন্টফিল্ড কড়াস্বরে উত্তর দিল—'না, মোটেই না। আমি শুধু বলতে চাইছি যে তুমি আমার সঙ্গে একটা বোকার মতো ঠাট্টা করতে চেষ্টা করছ।'

'আমি একদম সত্যি কথাই বলছি।'

'আমিও পাঁচশো ডলার বাজী রাখছি।'

'ঠিক আছে, রইল বাজী। এই নাও কাগজের খবরটা নিজের চোখেই দেখে নাও।' —বলতে বলতে ইনউড কাগজটা পেন্টফিল্ড-এর হাতে গুঁজে দিল।

পেন্টফিল্ড কাগজটা পড়তে শুরু করল। প্রথমটায় ও নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু অবিশ্বাস করবার কোনো কারণই নেই। কোরি হাচিনসনের সঙ্গে যে ম্যাবেল হোমস্‌-এর বিয়ে হয়েছে তা বেশ ফলাও করেই ছাপা হয়েছে। কোরি হাচিনসন যে সুদূর উত্তরের "ক্লনডাইকে" সোনার খনিতে লরেন্স পেন্টফিল্ড-এর পার্টনার সংবাদদাতা সেটাও জানাতে ভোলেন নি। খবরের শেষে এমন আভাসও দেওয়া হয়েছে যে, নবদম্পতি অল্প কয়েকদিনের জন্য ডেট্রয়েট গিয়ে সেখানে থেকে রোমাঞ্চকর "ক্লনডাইকে"-ই ফিরে যাবেন মধুচন্দ্রিমা যাপন করবার জন্যে।

পেন্টফিল্ড আর কিছু বলল না। বরং একটুখানি হেসে মন্তব্য করল 'না হে, ইনউড, বাজীটা তুমিই জিতেছ। আমার পার্টনারটি একবার খেলার সুযোগ পেলে যে কোথায় গিয়ে থামবে তা সত্যিই বলা যায় না। তা যাক্, টেবিলে আমার জায়গাটা রেখো, আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।'

আড্ডা থেকে বেরিয়ে পেন্টফিল্ড রাস্তার মোড় থেকে 'সি আট্‌ল্' শহরের একটা খবরের কাগজ কিনল। এখানেও হুবহু সেই একই খবর বেরিয়েছে। কোরি

হাচিনসন আর ম্যাবেল হোমস্ যে এখন বিবাহিত স্বামী স্ত্রী, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। পেন্টফিল্ড আবার ফিরে এল তার তাসের টেবিলে, আর তারপর টানা দু'ঘণ্টা ধরে সে এমনভাবে জিতে চলল যে শেষ পর্যন্ত জুয়োর আড্ডার মালিককে খেলা বন্ধ করে দিতে হল। দেখা গেল, এই দু'ঘণ্টায় পেন্টফিল্ড পুরো চল্লিশ হাজারটি ডলার জিতে নিয়েছে। খেলা শেষ করে হিসেব বুঝে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সময় পেন্টফিল্ড ইনউডকে বলে গেল, "এই শেষ। কাল থেকে আর খেলতে আসছি না।"

পেন্টফিল্ড-এর মনে যে কি মর্মান্তিক আঘাত লেগেছে, ওর হাবভাবে অবশ্য বাইরের কেউ তা টের পেল না। দিন সাতেক ধরে ও স্বাভাবিকভাবেই নিজের কাজকর্মের মধ্যে ডুবে রইল। তারপর 'পোর্টল্যা-ড' থেকে ছাপা একটা নামকরা কাগজ জোগাড় করল। তাতে কোরি হাচিনসন আর ম্যাবেল হোমস্-এর বিবাহ অনুষ্ঠানের খবর বেশ ফলাও করে বেরিয়েছে। পরের দিনই পেন্টফিল্ড তার আর এক বন্ধুর ওপর দিন কয়েকের জন্য নিজের খনিটা দেখাশোনা করার ভার দিয়ে স্লেজ গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। 'য়ুকন' নদীর জমাট বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে সে সোজা চলে গেল 'হেয়োইট রিভার' অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানদের ছাউনিতে। দিন দুয়েক পর যখন সে ফিরে এল, তখন দেখা গেল যে স্লেজ গাড়িতে সে আর একা নেই, সেখানে বসে আছে 'লাস্কা' নামে এক রেড ইন্ডিয়ান তরুণী। ছেলেবেলায় ভালুকের কামড়ে মেয়েটির একটা পা একটু খোঁড়া হয়ে গেছিল। 'ডসনে' পৌঁছেই পেন্টফিল্ড পাদ্রীর সামনে মেয়েটিকে যথারীতি বিয়ে করল। তারপর তাকে নিয়ে সটান গিয়ে উঠল তার তৈরী করা সেই নতুন 'কেবিন' বাড়িতে যা সে এতদিন ধরে তিল তিল করে ম্যাবেলের জন্য তৈরী করেছে।

বলাই বাহুল্য, পেন্টফিল্ড-এর প্রতিবেশী আর বন্ধুরা ওর এই কাণ্ডকারখানায় একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল। পেন্টফিল্ড যদি কোনো রেড ইন্ডিয়ান মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করার জন্য নিয়ে আসত, তাহলে অবশ্য ওরা ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু পেন্টফিল্ড একটা রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে একেবারে আইনমাফিক-ভাবে সামাজিক বিয়ে করে ঘরে তুলল কেন,—এটাই ওরা কেউ বুঝে উঠতে পারল না। পেন্টফিল্ডকে অবশ্য সামনা সামনি কেউই কিছু বলল না। তবে ওর যে কোনরকম রুচিবোধ নেই, সে বিষয়ে সবাই একমত হল।

কোরির কাছ থেকে চিঠিপত্র আসা এতদিনে বন্ধ হয়ে গেছিল। কিছুদিন আগে তুষারঝড়ের মধ্যে পড়ে ছ'খানা ডাক বওয়া স্লেজ গাড়ির জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে

গেছিল। তার জন্যও বাইরের চিঠিপত্র আসা বেশ কিছু দিন যাবৎ বন্ধ ছিল। তাছাড়া পেন্টফিল্ড বুঝতে পারল যে কোরি আর তার নব বিবাহিতা স্ত্রী এতদিনে নিশ্চয়ই মধুচন্দ্রিমা কাটাতে এখানে আসার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। পেন্টফিল্ডের যখন মনে পড়ে যেত যে দীর্ঘ দু'বছর ধরে সে নিজের মধুচন্দ্রিমার কথা ভেবেই বিভোর হয়ে ছিল, তখনই ওর বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেত। মনে হত সেখান দিয়ে যেন অবিরাম রক্ত ঝরছে। কিন্তু তিক্ত এক টুকরো হাসিতে ঠোঁট দুটি বেঁকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো চিহ্নই ওর মুখে ফুটে উঠত না, ব্যবহারেও কোনো তফাত ধরা পড়ত না। বরং এই সব সময় লাস্‌কা-র দিকে ও যেন আরো বেশি ঝুঁকে পড়ত।

আস্তে আস্তে এপ্রিল মাসও শেষ হতে চলল। একদিন পেন্টফিল্ড আর লাস্‌কা ঠিক করল, ওরা বেশ খানিকটা দূরে পিটার নামে এক বন্ধুর বাড়ি যাবে। পিটারের বাচ্চাটার নাকি খুব অসুখ। ও তল্লাটে কারুর কোনো বাচ্চার অসুখবিসুখ হলেই লাস্‌কা তক্ষুনি সেখানে গিয়ে হাজির হত। অসুস্থ বাচ্চাকে শুশ্রূষা করতে ওর কোনো জুড়ি ছিল না। দু'জনে মিলে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ল। এতদিনে বসন্তকাল শুরু হয়ে গিয়েছে, চারিদিকে বরফ গলে যাচ্ছে। বরফে জমে যাওয়া নদীর বুকে মাঝে মাঝেই বিরাট বিরাট ফাটল দেখা দিচ্ছে, তার পাশ দিয়ে নতুন রাস্তা করে লোকজন চলাচল করছে। বেশ খানিকক্ষণ চলার পর ওরা একটা বাঁকের কাছে এসে হাজির হল। বাঁকের ঠিক মুখেই একটা বিরাট বড় ফাটল দেখা দিয়ে রাস্তাটা এমন সরু হয়ে গিয়েছে যে দুটো স্লেজ গাড়ি পাশাপাশি যাওয়ার মতো জায়গা নেই। ঠিক এই সময় উল্টো দিক থেকে একটা স্লেজ গাড়ি আসার আওয়াজ পেয়ে পেন্টফিল্ড থেমে গেল।

যে স্লেজ গাড়িটা বাঁক ঘুরে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, তার আরোহীদের দিকে তাকিয়ে এক নিমেষের জন্য পেন্টফিল্ডের মনে হল যেন তার হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল, আর সারা শরীর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। স্লেজটা চালাচ্ছে কোরি হাচিনসন। পেছনে বসে আছে ম্যাবেল, আর তার বোন ডোরা। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য পেন্টফিল্ড নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিয়ে শান্তমুখে স্লেজ থেকে নেমে দাঁড়াল। মনে মনে ও খুব খুশি হয়ে ভাবল, একেবারে ঠিক সময়ে ওদের সঙ্গে দেখাটা হয়ে গেল, আগের থেকে ভেবে ঠিক করে রাখলেও এর চাইতে বেশি উপযুক্ত সময় ঠিক করা যেত না। ভাগ্যিস, লাস্‌কাও সঙ্গে আছে। কিভাবে ওরা নিজেদের ব্যবহারের জবাবদিহি করবে, তা শুনবার জন্য পেন্টফিল্ড উৎসুক হয়ে রইল।

ওকে দেখতে পাওয়া মাত্র কোরি স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেচে দৌড়ে এল। কাছে এসে ওর হাত দুটো ধরে প্রাণপণে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দরাজ গলায় বলে উঠল—'আরে আরে, তুমি এখানে। কোথায় যাচ্ছিলে? যাক্ আমরা তাহলে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম, কি বল?'

পেন্টফিল্ড অবশ্য ওর এত উচ্ছ্বাসের কোনো জবাবই দিল না। নিঃশব্দে নিষ্প্রাণ ভাবে ওর সঙ্গে হাত মেলাল। মাথা থেকে টুপি খুলে ডোরাকে অভিবাদন জানাল। তারপর ম্যাবেলের দিকে মুখ ফেরালও। লজ্জা, দ্বিধা, আনন্দ সব মিলিয়ে ম্যাবেলের মুখ ঝলমল করে উঠল। পেন্টফিল্ড ওকে বলতে গেল, 'তারপর মিসেস হাচিনসন, কেমন আছেন?' কিন্তু "মিসেস হাচিনসন"—এই কথা দুটো কিছুতেই ওর মুখ দিয়ে বেরোতে চাইল না। তাই, ও কোনরকমে খালি জিজ্ঞেস করতে পারল 'তারপর কেমন আছ?'

পেন্টফিল্ডের হাবভাব দেখে, কথাবার্তা শুনে এতক্ষণে ওরাও খুবই অবাক হয়ে গেছিল। ওর নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা পেয়ে ম্যাবেলের সারা চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওদের অবস্থা দেখে পেন্টফিল্ডের মনে অবশ্য খুব আনন্দ হচ্ছিল। ডোরা খুব অবাক হয়ে ওকে জিজ্ঞেস করল 'কি ব্যাপার,। লরেন্স? এমন করছ কেন? কি হয়েছে?' পেন্টফিল্ড কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কোরি ওর জামার আস্তিন ধরে টেনে একটু দূরে নিয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় জানাতে চাইল—'বলি ব্যাপার-খানা কি হে? এরকমটা করার মানে কি? আর ঐ রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েটাই বা তোমার স্লেজে বসে আছে কেন? ছি ছি, এখন এদের কি বোঝাই বল তো? মেয়েটা কে? কে ওর মনিব?' পেন্টফিল্ডের মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। এসেছে এবার তার সময় এসেছে। এরা সবাই তার সঙ্গে যে চরম বঞ্চনা করেছে, এবার সে তার বদলা নেবে। খুব ধীরভাবে খুশিমনে সে উত্তর দিল—'কোরি, তোমার, অন্ততঃ তোমার—এ সব নিয়ে কোনো কথা বলবার অধিকারই নেই। তা-ও যখন জানতেই চাইছ, তখন জানিয়েই দিচ্ছি ঐ ভদ্রমহিলা আমার স্ত্রী, মিসেস পেন্টফিল্ড।'

ওর কথা শুনে কোরি তো একেবারে আঁতকে উঠে চুপ করে গেল। ওকে এই হতবাক্ অবস্থায় রেখে পেন্টফিল্ড আবার দুই বোনের কাছে ফিরে এল। যেন খুব খোসমেজাজে আছে, এমনভাবে ডোরাকে ও জিজ্ঞেস করল—'তারপর ডোরা, রাস্তায় আসতে খুব বেশি কষ্ট হয়নি তো? ঠাণ্ডায় ঠিকমত ঘুম হয়েছিল তো?' এরপর ম্যাবেলের দিকে ফিরে পেন্টফিল্ড বেশ কেটে কেটে বলে উঠল, 'আর মিসেস

হাচিনসন, আপনার খবর কি? এতখানি রাস্তা পাড়ি দিয়ে খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

"মিসেস হাচিনসন" এই কথা দুটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাবেল আর ডোরা তো একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল। তারপরেই ডোরা লাফিয়ে এসে পেন্টফিল্ডকে জড়িয়ে ধরে হো হো করে হেসে উঠে বলল—'ওঃ হো, এই তাহলে ব্যাপার লরেন্স? সত্যিই তুমি একটি হাঁদারাম। খবরটা তাহলে তুমিও পড়েছিলে? প্রথম থেকে তোমার ব্যবহার দেখেই বুঝতে পেরেছি। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়ই।'

এবার পেন্টফিল্ডের হতবাক্ হওয়ার পালা। কোনোরকমে ঢোঁক গিলে ও বলে উঠল—'মানে? ইয়ে—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। পরের দিনই ঐ কাগজটা নিজেদের ভুল শুধরে নিয়ে ঠিক নামগুলো ছাপিয়েছিল—সেটা আর দেখনি? আমরা তো ভাবতেই পারিনি যে ঠিক ঐ দিনের ঐ ভুল খবরটাই তোমার চোখে পড়বে। সানফ্রান্সিসকোর অন্য সব কাগজেই ঠিকমত ছাপা হয়েছিল। একটাই হতভাগা কাগজ আমাদের নামগুলো গুলিয়ে ফেলে প্রথম দিন ভুল খবর ছাপল, আর বেছে বেছে ঠিক সেই খবরটাই তোমার নজরে এল?'

'তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'—কি এক অজানা আতংকে পেন্টফিল্ডের গলা যেন বুজে এল—ওর মনে হতে লাগল, ও যেন একটা অতলস্পর্শী খাদের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

চঞ্চলা, বাক্‌পটু ডোরার মুখে যেন এবার কথার খই ফুটতে লাগল—'কি বলতে চাইছি? বলতে চাইছি এই যে, আমিই হচ্ছি কোরি হাচিনসনের বৌ মিসেস ডোরা হাচিনসন। আর তুমি এতদিন ধরে ভেবে বসে আছ যে ম্যাবেলের সঙ্গে কোরির বিয়ে হয়েছে—সত্যি। ভাবনারও বলিহারি যাই। বুদ্ধু আর কাকে বলে!'

পেন্টফিল্ড আস্তে আস্তে উত্তর দিল—'ঠিক তাই। এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। ঐ কাগজের রিপোর্টারটা তোমাদের নাম দুটো গুলিয়ে ফেলেছিল। সিআট্‌ল আর পোর্টল্যাণ্ডের কাগজগুলো, সান্‌ফ্রান্সিকোর কাগজটার প্রথম দিনের খবরটাই হুবহু ছাপিয়ে দিয়েছে, আর ঠিক সেগুলোই আমার নজরে পড়েছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পেন্টফিল্ড। ভাগ্যের এই নিদারুণ ঠাট্টার মুখোমুখি হয়ে ও যেন এখন আর পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে পারছিল না। সামনের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, ম্যাবেল আশাভরা চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে

আছে। কোরি হাচিনসন খুব মনোযোগ দিয়ে নিজের জুতোর ডগাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ডোরা চোরা চাউনি হেনে স্লেজের ওপর লাস্‌কাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে পেণ্টফিল্ডের সামনে যেন ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের বিবর্ণ, ক্লান্তিকর, ধূসর ছবিটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল। খোঁড়া, অক্ষম, আদিম রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ে লাস্‌কাকে পাশে নিয়ে সভ্য জগৎ থেকে দূরে আদি অন্তহীন তুষার প্রান্তরের ওপর দিয়ে সে স্লেজ চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কয়েকটি মুহূর্ত, তারপরে ম্যাবেলের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে পেন্টফিল্ড সহজ ভাবেই বলে উঠল—আমি সত্যিই দুঃখিত ম্যাবেল। এরকম ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম যে তুমি কোরিকে বিয়ে করেছ। ঐ যে ওখানে স্লেজের ওপর বসে আছে, ঐ মেয়েটিকেই আমি বিয়ে করেছি—মিসেস লাস্‌কা পেন্টফিল্ড ওর নাম।'

ম্যাবেল ফ্যাকাসে, রক্তহীন মুখে আস্তে আস্তে ওর বোনের দিকে ফিরে তাকাল। এই দীর্ঘ, কঠিন পথ পেরিয়ে আসার সমস্ত ব্যর্থতা আর গ্লানির বোঝা যেন হঠাৎ ওর ওপর চেপে বসল। মনে হল ও যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। ডোরা তাড়াতাড়ি ওর কোমর ধরে ফেলে সামলাল। কোরি এক দৃষ্টিতে তার জুতোর ডগার দিকেই তাকিয়ে রইল। পেন্টফিল্ড আর একবার সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর নিজের স্লেজের কাছে ফিরে গিয়ে লাস্‌কা-কে বলল—'চল, এবার রওনা হওয়া যাক। পিটারের কাছে গিয়ে পেঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।' বাতাসে ওর হাতের চাবুক সপাৎ করে একটা আওয়াজ করল। কুকুরগুলো চামড়ার দড়িতে টান লাগাল। স্লেজগাড়িটা নড়েচড়ে উঠে গড়গড় করে চলতে আরম্ভ করল।

'ওঃ হো, ভালো কথা কোরি'—চলন্ত স্লেজ গাড়ি থেকে পেছন দিকে তাকিয়ে পেণ্টফিল্ড বলে উঠল—'তুমি আমাদের আগেকার কেবিনটাতেই গিয়ে উঠতে পার। অনেকদিন ধরেই ওটা খালি পড়ে আছে। আমি খনির পেছনে টিলাটার ওপর একটা নতুন 'কেবিন' বাড়ি তৈরি করেছি।'

শেষ প্রশ্ন

THE GREAT INTEROGATION

॥ এক ॥

ডসনে মিসেস শেথারের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান পর্বটাকে তুলনা করা যেতে পারে একমাত্র কোনো কক্ষচ্যুত উল্কার সঙ্গেই। হঠাৎ এক বসন্তকালের সকালে উনি 'ডসনে' এসে হাজির হলেন। সঙ্গে এল বেশ কয়েকখানা কুকুরে টানা 'স্লেজ গাড়ি' আর একদল নিপুণ, পেশাদার দো-আঁশলা ফরাসী ক্যানাডিয়ান স্লেজ চালক আর মাঝি। মাসখানেক ধরে নারীবিহীন 'ডসন' শহরের সামাজিক জীবনে একটা ঘূর্ণিঝড় তুলে হঠাৎ আবার একদিন উনি 'য়ুকন' নদীতে নৌকা ভাসিয়ে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দিলেন। মিসেস শেথার ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, যুবতী, মধুর হাসিনী আর মিশুকে। তার ওপর অল্প কিছুদিন আগেই ওর ধনী স্বামী মারা গেছেন। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই এক মাসে নারীবর্জিত ডসনের প্রায় সব প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষই ওঁর প্রেমে পড়েছিলেন। কোটিপতি রুসক সোনার খনির মালিক, পদস্থ সরকারী আমলা, ভাগ্যান্বেষী যুবা পুরুষ—কেউই বাদ ছিল না। অসংখ্য বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার সৌভাগ্যও ওঁর হয়েছিল। তবে কারুর কোনো প্রস্তাবেই উনি একটুও সাড়া দেননি। তাই উনি যখন হঠাৎ একদিন 'ডসন' ছেড়ে চলে গেলেন তখন পেছনে ফেলে গেলেন অসংখ্য হতাশ প্রেমিকের দল। ওঁর মৃত স্বামী কর্নেল শেথার ছিলেন একজন নামকরা খনি বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া ঝানু তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যবসাদার হিসেবে আমেরিকা আর ইংলণ্ড—এই দুই দেশের শিল্পপতিরাই ওঁকে খুব সমীহ করে চলতেন। এরকম একজন লোকের স্ত্রী যে হঠাৎ কেন ডসনের মতো একটা পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় এসে হাজির হলেন—সেটা সকলের কাছেই একটা বিরাট হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছিল। তবে ডসনে মিসেস শেথারের শেষতম ব্যর্থ প্রেমিক জ্যাক কাউঘ্রান আচমকাই এই হেঁয়ালির কিছুটা মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিল। মিসেস শেথারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে এবং যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়ে জ্যাক যখন ভগ্ন হৃদয়ে রাত্রিবেলা নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎই ওর সঙ্গে পিয়ের ফতেঁন-এর আলাপ হয়ে যায়। পিয়ের আবার ছিল মিসেস শেথারের স্লেজ ও নৌকা চালক বাহিনীর খোদ কর্তা। মাঝরাত পর্যন্ত পানশালাতে এক সঙ্গে বসে মদ খেতে খেতে

নেশার ঝোঁকে খুব তাড়াতাড়িই দু'জনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল, আর দু'জনেই দু'জনের যত প্রাণের কথা, সুখ-দুঃখের কথা বলতে লেগে গেল। জ্যাকও জানতে পারল যে মিসেস শেথার 'ডেভিড পেইন' নামে একটা লোকের খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন।

'বুঝলে দোস্ত'—পিয়ের জড়ানো গলায় জ্যাক্‌কে বলে চলল, 'কেন যে শেথার মেমসায়েব এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তা আমি কিস্‌সু বলতে পারব না। তবে ডেভিড পেইন বলে একটা লোকের নাম প্রায়ই ওঁর মুখে শুনি। আমাকে ডেকে একদিন উনি বললেন, লোকটাকে খুঁজে বার করতে পারলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটি হাজার ডলার বক্‌শিস দেবেন। কিন্তু ভায়া, অনেক চেষ্টা-চরিত্র চালিয়ে, খোঁজ-খবর করেও কিছুতেই আর লোকটার পাত্তা করতে পারছিলাম না। ভাবলাম, ঐ হাজারটা ডলার আর আমার ভাগ্যে নেই। এমন সময় হঠাৎ 'সার্কেল সিটি'র কয়েকটা লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল। তারা বলল, ডেভিড পেইন-কে তারা খুব ভালভাবেই চেনে—লোকটা থাকে 'বার্চ ক্রীক' অঞ্চলে। আমার কাছ থেকে এই খবর পেয়ে মেমসায়েব তো একেবারে লাফিয়ে উঠে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে চাইলেন। আর আমাকে বললেন, তার দেখা পেলে হাজার নয়, পাক্কা দু'হাজার ডলার আমাকে পুরস্কার দেবেন। আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি—ভাবলাম যাক এবার বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিক বেরোবার মুখেই 'সার্কেল সিটি' থেকে আর একদল লোক এসে হাজির হল। তারা বলল, ডেভিড পেইন কয়েকদিন আগে আবার ডসনের দিকেই বেরিয়ে পড়েছে। ব্যাস, মেমসায়েবও আর বেরোলেন না। তবে আজকে হঠাৎ উনি আমার হাতে পাঁচশো ডলার দিয়ে একটা ভালো বড় নৌকা কিনে সেটাকে একদম ঠিকঠাক করে রাখতে বলেছেন—আগামী কালই নাকি উনি নদীপথে বেরিয়ে পড়তে চান। অগত্যা বুড়ো সিট্‌কা চার্লি-র কাছ থেকে একটা নৌকা কিনতে হল—হতভাগা রেড ইন্ডিয়ানটা গুণে গুণে পাঁচশোটি ডলারই নিয়ে নিল—একটা পয়সাও কম করল না ইয়ার।'

পরের দিন সকালে সত্যি সত্যিই মিসেস শেথার তাঁর দলবল নিয়ে নৌকায় চেপে দক্ষিণে নদীর বুকে যে অজস্র ছোট ছোট দ্বীপ ছিল তার গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে গেলেন। আর জ্যাক-এর মুখে তাঁর কাহিনী শুনে গোটা ডসন শহরটা ভাবতে বসে গেল এই ডেভিড পেইন লোকটা-ই বা কে, আর মিসেস শেথারের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কি!

॥ দুই ॥

নৌকাতে চড়েই মিসেস শেথার পিয়েঁরকে তাঁর গন্তব্যস্থান কোথায়—তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'য়ুকন' নদী থেকে স্টুয়ার্ট নদীতে ঢুকে খানিকটা পথ গিয়েই পিয়েঁর মিসেস শেথারকে ডেকে বলল—'মেমসাহেব, আমাদের জায়গায় এসে গেছি। স্টুয়ার্ট নদীতে ঢুকেই তিন নম্বর দ্বীপের কথা বলেছিলেন না? তা এই সামনের দ্বীপটাই তিন নম্বর।'—বলতে বলতে পিয়েঁর নিপুণ হাতে নৌকাটাকে দ্বীপটার তীরে এনে লাগাল। তারপর সেটাকে ঘাটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে বলল—'মেমসাহেব আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি নেমে এগিয়ে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসি।" নদীর পাড় বেয়ে উঠে চোখের আড়ালে চলে গেল পিয়েঁর। আর মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এসে জানাল—"ম্যাডাম, লোকটার কেবিনটা খুঁজে বার করেছি। এই তো, একদম সামনেই। কেবিনটা অবশ্য এখন বন্ধ। তবে কুকুরগুলো সব কেবিনের সামনেই বাঁধা আছে, তাই মনে হয় লোকটা বেশি দূরে কোথাও যায়নি। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি ফিরে আসবে সে।"

"ঠিক আছে পিয়ের। এবার আমাকে নৌকা থেকে নামাও। ওঃ, তোমাকে তাড়াতাড়ি নৌকা বাইতে বলে কি ভুলটাই না করেছি। এমনই নৌকা চালিয়েছ যে তার ঠেলায় আমার সারা শরীর ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে।"—কথাগুলো বলতে বলতে মিসেস শেথার উঠে দাঁড়ালেন। পাতলা, ছিপ্‌ছিপে সুন্দরী তরুণী হলেও যেভাবে তিনি পিয়ের-এর হাত ধরে লাফিয়ে নৌকা থেকে নামলেন, তাতে বেশ বোঝা গেল যে দামী 'ফার'-এর পোশাকে ঢাকা তাঁর সুগঠিত, দীর্ঘ তনুখানি যথেষ্ট শক্তি ধরে। নৌকা থেকে নেমে নদীর পাড় বেয়ে উঠে মিসেস শেথার আস্তে আস্তে কেবিনটার দিকে এগিয়ে চললেন। নিজেকে উনি প্রাণপণে সংযত রাখবার চেষ্টা করছিলেন বটে, কিন্তু ওর পা কাঁপছিল, বুক ধড়ফড় করছিল। কেবিনটার সামনে গিয়ে যখন উনি দাঁড়ালেন, তখন ওঁর সমস্ত মুখ চোখ লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে। কেবিনের চারপাশটাই উনি ঘুরে এলেন। একবার দরজার হাতলটা তুলে ধরে আবার ছেড়ে দিলেন। তারপর হঠাৎই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে নিচু হয়ে দরজার শক্ত, এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো চৌকাঠে একটা চুমু খেলেন। দৃশ্যটা দেখে পিয়ের কি ভাবল তা সেই জানে, তবে হঠাৎ সে হেঁড়ে গলায় সাঙ্গপাঙ্গদের হুকুম দিল, "এই হতভাগারা, ম্যাডামের জন্যে নদীর উঁচু পাড়ের ওপরে গদী আর তাকিয়া দিয়ে খুব ভালো করে

একটা বিছানা তৈরি কর্—উনি এখন বিশ্রাম করবেন।' বিছানা তৈরি হয়ে গেলে মিসেস শেথার সেটাতে আরাম করে আধশোয়া হয়ে বসে নদীর দিকে চোখ ফেরালেন। নদীর ওপারে দূরে উঁচু পাহাড়ের সারি, পাহাড়ের জঙ্গলে কোথাও আগুন লেগেছে, সেখানে আকাশটা ধোঁয়ায় ঝাপ্সা হয়ে আছে। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলো গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ে নানা রকম জাল বুনে চলেছে নিচের ছায়াচ্ছন্ন মাটির ওপর। যতদূর চোখ যায়, নদীর বুকে পাইন গাছে ভরা ছোট ছোট ঘন সবুজ দ্বীপ, ওর বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া। চারদিক শুন্‌শান্, চুপচাপ, আদিগন্ত ঊষর প্রান্তরে কোথাও কোনো জীবনের স্পন্দন চোখে পড়ছে না। সব মিলিয়ে কি রকম যেন থম্‌থমে, রহস্যময় একটা পরিবেশ। এই পরিবেশ যে মিসেস্ শেথারকে-ও বেশ খানিকটা অস্থির আর চঞ্চল করে তুলেছে, তা তাঁর হাবভাব দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল। অনবরত উনি এপাশ ওপাশ করছিলেন, আর কি যেন দেখতে পাওয়ার আশায় নদীর বাঁকের দিকে, তীরের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন।

আস্তে আস্তে মাটির বুকে সন্ধ্যা নেমে এল। হঠাৎ পিয়ের কান পেতে কি যেন শুনে বলে উঠল—'এই যে! এবার আসছে সে!' দাঁড় টানার একটা ছপ্‌ছপ্ আওয়াজ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। কয়েক মিনিট বাদেই একটা নৌকা কাছেই এসে তীরে লাগল। একজোড়া তরুণ-তরুণী লাফিয়ে নেমে এল নৌকা থেকে। তরুণীটি রেড ইণ্ডিয়ান। তার বন্য সৌন্দর্য দেখে চমকে গেলেন মিসেস শেথার। মেয়েটির গায়ে চামড়ার আঁটোসাঁটো জামা, তাতে রং বেরং-এর ঝলমলে পুঁথির কাজ। জামা-কাপড়ের ভেতর থেকে তরুণীর সুঠাম, উদ্ধত স্বাস্থ্য যেন ফেটে বেরোচ্ছে। মাথায় ঘন নীলচে কালো চুল সিল্কের রুমালে বাঁধা। তবে সব চাইতে বৈশিষ্ট্যময় হল মেয়েটির মুখ—তামাটে মুখখানা যেন ব্রোঞ্জের ছাঁচে ফেলে তৈরী করা। বাঁকা, সুন্দর দুটি ভ্রূর নিচে একজোড়া নীল, বড় বড় ঈষৎ তীর্যক চোখে তীব্র উজ্জ্বল দৃষ্টি। উঁচু চোয়াল, পাতলা সুগঠিত ঠোঁট জোড়া। কোন সুদূর অতীতে যে এর পূর্বপুরুষের দেহে মঙ্গোলিয়ান রক্ত মিশে ছিল, তার কিছুটা ছাপ এখনো ওর চোখে-মুখে লেগে আছে। সব মিলিয়ে ওকে দেখে পোষ মানানো বুনো বাজপাখির উপমাই প্রথমে মনে আসবে।

নৌকা থেকে নেমে দু'জনে মিলে নৌকাটাকে ডাঙায় টেনে তুলল। পোষা কুকুরগুলো দৌড়ে এসে ওদের ঘিরে ধরে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। কুকুরগুলোকে আদর করতে গিয়ে পুরুষটির হঠাৎ চোখ পড়ল মিসেস শেথারের ওপর প্রথমটায় তার মনে হল, সে নিশ্চয়ই ভুল দেখছে। চোখের ওপর একবার হাতটা বুলিয়ে

নিয়ে আবার তাকিয়ে দেখে তবেই ও নিঃসন্দেহ হল। তারপর এগিয়ে এসে হাত হাত বাড়িয়ে দিয়ে খুব সহজভাবে, হালকা সুরে বলে উঠল—'আরে কারেন না? প্রথমটায় ভেবেছিলাম, ভুল দেখছি না তো? কখন এলে? পুরুষটিকে দেখা অবধি ভেতরের চাপা উত্তেজনায়, আবেগে মিসেস শেথারের সারা চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল। কিন্তু যাকে দেখে এই চঞ্চলতা, তার কাছ থেকে এরকম সহজ, আবেগহীন ঠাণ্ডা অভ্যর্থনা পাওয়ার জন্য উনি মোটেই তৈরী ছিলেন না। তবে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে মিসেস শেথারও পুরুষের বাড়িয়ে দেওয়া হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলতে গেলেন—'বুঝলে ডেভ, আমি অনেকদিন ধরেই তোমাকে জানাচ্ছিলাম যে আমি এখানে চলে আসব। কিন্তু ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডেভ—অর্থাৎ ডেভিড পেইন—হাসতে হাসতে বলে উঠল—'কিন্তু উত্তরে আমি কোনো কিছুই জানাইনি, এই তো? মিসেস শেথারের—অর্থাৎ কারেনের সঙ্গে কথা বললেও ডেভ্-এর চোখ কিন্তু ছিল ওর রেড ইণ্ডিয়ান সঙ্গিনীর দিকে। সঙ্গিনী এতক্ষণ একটু অবাক হয়েই ওদেরকে—বিশেষ করে কারেনকে লক্ষ্য করছিল। এবার সে হাতে একগাদা জিনিসপত্র নিয়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

'যাক্‌গে ডেভ, ঠিক আছে। তোমার জায়গায় আমি হলেও হয়তো তাই করতাম। তবে, এবার আমি সত্যিই এসে গেছি।' ডেভ কিন্তু কারেনের কথাগুলোকে হাল্কাভাবেই লুফে নিয়ে বলক—'তা, এতটা যখন এসেই গেছ, তখন আর একটু এগিয়ে এসে আমার কেবিনটায় ঢোক, কিছু খেতে দিই তোমাকে।' কারেনের গলায় যে আকুলতার ছাপ ফুটে উঠছিল, সেটা খুব সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ডেভ সমানে কথা বলে চলল—'তুমি এখন নিশ্চয়ই 'ডসন' থেকেই আসছ, তাই না? ওখানে শীতকালটায় ছিলে বুঝি? আমি গত শীতকালটা 'সার্কল সিটি'তেই কাটিয়েছি। আপাততঃ কিছুদিন এখানেই আড্ডা গেড়ে কিছুদিন ধরে 'হেন্‌ডারসন্‌-এর খাঁড়ি'র কাছাকাছি খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখছি, যদি কিছু পাই। কিছু না মিললে ভাবছি এবার স্টুয়ার্ট নদীর ঐ দিকটায় পাড়ি জমাব।'

এতক্ষণে ওরা দু'জনে কেবিনের ভেতরে এসে বসেছিল। কারেনের অবশ্য এসব কথা শুনতে একেবারেই ভালো লাগছিল না। ও দু'জনের কথাবার্তাকে ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। ডেভ-এর রেড ইণ্ডিয়ান সঙ্গিনীটির সম্বন্ধেও ওর কৌতূহল ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। চোখের কোণ দিয়ে মেয়েটার গতিবিধি, চলাফেরা সমানে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ও। মেয়েটা এখন খুব নিপুণ হাতে বড় বড় মাংসের টুকরো ভাজছিল। ডেভ একটা কুড়ুলের বাঁট তৈরি করতে করতে ওকে

আবার জিজ্ঞেস করল—'তা, ডসনে কি অনেকদিন ছিলে নাকি ?' কারেন কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল—'তা, মাসখানেক হবে বোধহয়। যা জায়গা একখানা, বাপ্‌স্‌ ! পুরুষগুলো একেবারে আদিম স্বভাবের কোনরকম আদবকায়দার ধার ধারে না। তা, ওসব কথা ছাড়। তোমার খবরটবর কি ? কি করে দিন কাটাচ্ছ ? আশেপাশে সঙ্গী সাথী, প্রতিবেশী কেউ আছে ?'

'ছিল কিছুদিন। একজোড়া স্বামী-স্ত্রী ছিল, আর কয়েকটা ছেলে। কিন্তু সবাই কিছুদিন আগে 'এল ডোরাজে'র দিকে চলে গেছে।'

কারেন এবার মেয়েটার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করল—'তবে, কাছাকাছি অনেক রেড ইন্ডিয়ান পরিবার আছে নিশ্চয়ই ?'

'ছাই আছে। এই যে ওকে দেখছ—ওর নাম উইনাপি—ও ছাড়া এই তল্লাটে একটা রেড ইন্ডিয়ানও খুঁজে পাবে না তুমি। আর উইনাপি তো 'কোয়োকুক' গোষ্ঠীর রেড ইণ্ডিয়ান, ওর বাড়ি এখান থেকে নদীর ভাঁটিতে অন্ততঃ এক হাজার মাইল দূর।'

ডেভ-এর উত্তর শুনে কারেনের মনে হল, সে বোধহয় এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হতে লাগল, ডেভ যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে,—কেবিনের দরজা, জানলা, ছাদ—সব যেন ওর চোখের সামনে ঘুরপাক খাচ্ছে। অতি কষ্টে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে টেবিলে ওদের সঙ্গে খেতে বসল কারেন। খেতে বসে বিশেষ কথাবার্তা হল না। খাওয়া শেষ হওয়া মাত্রই উইনাপি কুকুরগুলোকে খাবার দিতে কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। কারেনকে একেবারেই আমল দিল না সে। এতক্ষণ পরে ডেভকে একলা পেয়ে কারেন ওকে জিজ্ঞেস করল—'কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না আমি এখানে এলাম কেন ? তুমি আমার চিঠি পাওনি, যাতে আমি সব লিখেছি ?'

'তার মানে তোমার শেষ চিঠি ? কই, না তো ! দেখগে যাও, সেটা মাঝরাস্তায় কোথাও বস্তাবন্দী হয়ে পড়ে আছে হয়তো ! এ দিকে চিঠিপত্র বিলির যা শোচনীয় অবস্থা, তার আর কি বলব। একেবারে যাতা'—

'দোহাই ডেভ, থামো। অনেক হয়েছে।' কারেনের গলায় পুরনো দিনের মতো একটু ঝাঁঝ মিশল—'তুমি আমার কথা জিজ্ঞেস করছ না কেন ? আমার স্বামী যে মারা গেছেন, সে খবর তুমি জানো ? আমি তোমাকে অনেকগুলো চিঠিই লিখেছি। তার কয়েকটা অন্ততঃ তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। তবে আমার একটা চিঠির জবাবও তুমি দাওনি।'

'নাঃ, তোমার শেষ চিঠিটা সত্যিই এখনো পাইনি। আহা, তোমার কর্তামশাই মারা গেছেন তাহলে? ঈস, খুবই দুঃখের কথা। তবে হ্যাঁ, তোমার আগের কয়েকটা চিঠি আমি নিশ্চয়ই পেয়েছি, আর সেগুলো উইনাপি-কে পড়েও শুনিয়েছি। যাতে ও সাদা চামড়ার দিদিভাইদের আসল রূপটা চিনতে পারে। মনে হয়, তাতে ওর খুব উপকারই হয়েছে। তুমি কি বল?'

ডেভ-এর বিদ্রূপ গায়ে না মেখে কারেন বলে চলল—'শেষ চিঠিটাতেই আমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ ছিল। অবশ্য সেই চিঠি ছাড়া আগেকার চিঠিগুলোতেও আমি বারবার লিখেছি যে তুমি যদি আমার কাছে ফিরে না যাও তো আমিই তোমার কাছে চলে আসব। তাই আমি এবার আমার কথা রেখেছি। এখানে চলে এসেছি।'

'হ্যাঁ, তুমি ঐ ধরনের কথা তোমার আগেকার চিঠিগুলোতে লিখেছ বটে। কিন্তু আমি তো ঐসব চিঠির কোনো উত্তর দিইনি। কোনো প্রতিশ্রুতিও চাইনি তোমার কাছ থেকে। কাজে-কাজেই তুমি কোনো কথা দিয়ে থাকলে তা সম্পূর্ণ একতরফা। কিন্তু অনেক দিন আগে তোমার দেওয়া একটা মৌখিক প্রতিশ্রুতি আমার খুব ভালো করেই মনে আছে। তোমারও সেটা মনে থাকা উচিত।' ডেভ এবার সোজাসুজি কারেনের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল—'তুমি আর আমি একদিন তোমার মায়ের গোলাপ বাগানে বসেছিলাম, মনে পড়ে? চারিদিকের প্রকৃতিতে বয়ে যাচ্ছিল খুশির জোয়ার। আমাদের রক্তেও লেগেছিল নতুন বসন্তের জোয়ার। সেদিনই আমি তোমাকে প্রথম চুমু খাই। তুমি আমাকে সেদিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, চিরদিন তুমি আমারই থাকবে, আর কারো হবে না। শুধু সেদিনই নয়, তার পরেও এরকম প্রতিশ্রুতি আমাকে অনেকদিনই দিয়েছিলে। আমিও অন্ধের মতো সমস্ত মনপ্রাণ উজাড় করে তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু এমন সময় হঠাৎই তোমার জীবনে এলো মিস্টার শেথার—প্রায় তোমার বাবার বয়সী, কুৎসিত দর্শন একটা লোক। শিক্ষা দীক্ষা রুচিতেও লোকটা ছিল একেবারে ভোঁতা, স্থূল প্রকৃতির। কোনোরকম সূক্ষ্ম, মার্জিত বোধই তার মধ্যে ছিল না। তবে হ্যাঁ, সে ছিল পয়সা উপার্জন করার একটি যন্ত্র বিশেষ,—আইন বাঁচিয়ে কি করে দু'পয়সা কামাতে হয়, তা সে খুব ভালোভাবেই জানত। অনেক বিষয় সম্পত্তিও ছিল তার, —বেশ কয়েকটা খনি, বিশাল জমিদারী, অর্থকৌলিন্যের সামাজিক বিচারে সে নামী লোক ছিল ঠিকই, কিন্তু অঢেল টাকা ছাড়া আর কি যোগ্যতা তার ছিল যাতে তুমি সব ভুলে গেলে, গোলাপ বাগানে আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে যে প্রতিশ্রুতি

আমাকে দিয়েছিলে, তার মর্যাদা ধুলোতে লুটিয়ে দিলে? কেন ঐরকম একটা কদাকার, লোভী, স্বার্থপর লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিলে?'

কারেন ওর কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌ল—'ডেভ, তোমাকে তো আমি জানিয়েই ছিলাম যে সংসারের অভাবের জন্য বাধ্য হয়ে, চাপে পড়ে নিজের কোনোরকম ইচ্ছে না থাকলেও মিঃ শেথারকে আমার বিয়ে করতে হয়েছিল। আমি নিজেও যে এতে কত কষ্ট পেয়েছি, তা কি তোমাকে বলিনি?'

'চাপে পড়ে? বাধ্য হয়ে? তোমার নিজের কোনো ইচ্ছে ছিল না? ওসব আমাকে বোঝাতে যেও না, কারেন। তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করে বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না।'

'কিন্তু ডেভ, তোমার ওপর থেকে ভালবাসা আমার কোনো সময়েই চলে যায় নি, বিশ্বাস কর।'—দুর্বল গলায়, খানিকটা যেন মিনতি করেই কথাগুলো বলল কারেন। কিন্তু তাতে ডেভের মন নরম হল না। কঠিন গলায় সে জবাব দিল—'জানি না, ভালবাসা বলতে তুমি কি বোঝ। আমি কিন্তু এ ধরনের ভালবাসা বুঝি না, পেতেও চাই না।' কারেন কিন্তু এতে দমে না গিয়ে ওকে বোঝাতে লাগল—'ওসব পুরনো কথা ভুলে যাও, ডেভ। এখনকার কথা ভাব। মিঃ শেথার মারা গেছেন। কিন্তু তুমি আর আমি তো বেঁচে আছি, ঠিক আছি। আমি না হয় অন্যায় করেছি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। কিন্তু তুমিও কি তাই করনি? তুমিও তো আমাকে কথা দিয়েছিলে যে সারাজীবন ধরে তুমি আমাকে ভালবাসবে। কোথায় গেল সেই ভালবাসা?'

ডেভ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। নিজের বুকে সজোরে ঘুষি মেরে প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠ্‌ল, 'এই যে, এখানেই আছে। কোন সময়েই তা হারিয়ে যায়নি।'

'তাহলে, ডেভ? যদি তোমার ভালবাসা সত্যি সত্যিই এত বিশাল, মহান হয়, তাহলে তোমার কি উচিত নয় আমাকে এখন, এই অবস্থায় ক্ষমা করা? একবার ভেবে দেখ, ডেভ। তুমি আর আমি,—দুজনেই ঠিক আগের মতোই আছি।'—কারেন কথা বলতে বলতে ডেভ-এর একেবারে কাছে ঘেঁষে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল, 'ডেভ, আমি আর সেই কচি কিশোরীটি নেই। এখন আমি একজন পরিণত মহিলা,—দুনিয়ার হালচাল সব বুঝি। তুমি যা করেছ, এখানকার সব নিঃসঙ্গ শ্বেতাঙ্গ পুরুষই তাই করে। আমি এতে কিছু মনে করিনি। হ্যাঁ, তোমার রেড ইণ্ডিয়ান সঙ্গিনীটির কথাই বলছি। তুমি তো নিশ্চয়ই সামাজিক ভাবে, খ্রীষ্টান

মতে ওকে বিয়ে করনি, এখানকার স্থানীয় প্রথামতো একসঙ্গে আছ মাত্র। তোমাদের কোনো বাচ্চাকাচ্চাও হয়নি। এই সুদূর উত্তর দেশে এটা কোনো সমস্যাই নয়। —এখানে এটা খুব স্বাভাবিক, নিয়মিত ঘটনা। যে সব পুরুষরা ভাগ্য ফেরাবার আশায় এখানে আসে, তারা কেউই এখানে সারাজীবন বাঁধা পড়ে থাকবার জন্যে আসে না। যে মেয়েটিকে নিয়ে তারা এখানে অস্থায়ী ঘর বাঁধে, চলে যাওয়ার সময় সরকারী দোকানকে বলে মেয়েটার এক বছরের মতো সমস্ত খাবার দাবার আর অন্যান্য সব দরকারী জিনিনপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়। তা ছাড়া বেশ ভালোরকম টাকাপয়সাও দিয়ে যায় মেয়েটির হাতে। মেয়েটাও এই ব্যবস্থায় খুব খুশিই হয়। আমরা না হয় এই মেয়েটির জন্য একেবারে সারাজীবনের মতো খাবারদাবার আর জিনিসপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করে যাব। ওর হাতেও দিয়ে যাব অনেক টাকা-কড়ি। তুমি কি বুঝতে পারছ না, এর সঙ্গে সারাটা জীবন এখানে কাটানো তোমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়? একবার ভেবে দেখ, তোমার সঙ্গে যখন উইনাপির দেখা হয়, তখন ও কি ছিল? আদতে ও তো কাঁচা মাংসখেকো একটা অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানের মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে ও এখনো তাই থাকত। ভুলে যেও না, তুমি পৃথিবীর সব চাইতে উন্নত, সভ্য জাতের পুরুষ। এই মেয়েটার সঙ্গে তোমার জীবনকে, মনকে, তুমি কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারবে না,—কিছুতেই না। বরং তুমি যদি ওর সারা জীবনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে যাও, তাহলেই ও খুশি হবে বেশি,—নিজেদের আদিম পরিচিত সমাজে আবার ফিরে যাবে ও। ফিরে এসো, চলে এসো, ডেভ। আমি তোমাকে সারা মনপ্রাণ দিয়ে চাইছি, ভাবছি। আমরা দুজনে পরস্পরের জন্যেই তৈরি হয়েছি। নতুন জীবন, সভ্য পৃথিবী আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমাদের দুজনের আরামে, আনন্দের জোয়ারে ভেসে জীবন কাটানোর মতো যথেষ্ট পয়সা আমার আছে। কোনো চিন্তা কোর না,—চলে এসো আমার সঙ্গে।'

কারেনের দীর্ঘ প্রেমগুঞ্জন শুনতে শুনতে কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিল ডেভ। কখন যে কারেনকে ও নিজের বাহুবন্ধনের মধ্যে টেনে নিয়েছে, তা ও লক্ষ্যই করেনি। আবেগে, উত্তেজনায় কারেনের নরম দেহখানি থরথর করে কাঁপছে, ওর নরম গাল ডেভ-এর গালের সঙ্গে লেগে আছে, চুল আর শরীর থেকে ভেসে আসছে মনোরম, লঘু সুগন্ধি। বর্তমান জীবনের কঠোর, শুকনো ছবিটা হঠাৎ যেন পরিষ্কার হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠল—দিনের পর দিন যাযাবরবৃত্তি, নীরস কঠিন জীবনসংগ্রাম। কোনো সমাজ নেই, বন্ধু নেই, বৈচিত্র্য নেই। অকরুণ

রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে তাকে বাঁচতে হচ্ছে—ভবিষ্যতেও হবে। এদিকে তার মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে চরম প্রলোভন,—সুখী, উষ্ণ, আনন্দময় জীবনের প্রতীক, সৌন্দর্য, যৌবন আর স্বাচ্ছল্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি কারেন বাঁধা পড়ে আছে তার বাহুবন্ধনের মধ্যে। ওর স্মৃতিপটে পুরনো দিনের সব ছবি ভেসে যেতে লাগ,ল—হঠাৎ ওর মনে হল, ও যেন ফিরে গেছে অতীতের সেই গানবাজনা, হৈচৈ আর হুল্লোড়ের মধ্যে। কিরকম একটা দুর্বলতা ওকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। কারেনকে নিয়েই আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই হঠাৎ কেবিনের বাইরে থেকে ভেসে এলো ওর পোষা কুকুরগুলোর চীৎকার।—খাবার নিয়ে ওরা ঝগড়া লাগিয়েছে। আর উইনাপি তার তীব্র, তীক্ষ্ন, মিহি গলায় চেঁচিয়ে, বকে ঝকে তাদের ঠাণ্ডা করছে। এই শব্দটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটা দৃশ্য চট্ করে ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল। গভীর জঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড, হিংস্র 'গ্রিজলি' ভাল্লুকের সঙ্গে ওর মরণপণ লড়াই চলছিল। পোষা কুকুরগুলো প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, আর উইনাপি তীব্র, তীক্ষ্ন গলায় তাদেরকে ভাল্লুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বলছে। ভাল্লুকের থাবার আঘাতে মরণাপন্ন কুকুরগুলোর রক্ত সাদা বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে লাল আলপনা এঁকে যাচ্ছে। ভাল্লুকের কামড়ে আর নখের আঁচড়ে আস্তে আস্তে ওর নিজের জীবনদীপ নিভে আসছে। এমন সময় উইনাপি হাতে একটা লম্বা, বড় ছোরা নিয়ে উগ্রমূর্তিতে ভাল্লুকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুল উড়ছে, চোখ জ্বলছে তার—নিজের জীবনের কোনো পরোয়া না করে সে ভাল্লুকটার গায়ে সমানে ছোরা বসিয়ে যাচ্ছে।

ডেভ্-এর সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল—এক নিমেষে সমস্ত ঘোর আর আচ্ছন্নতা কেটে গেল তার। ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, কপালে দেখা দিল ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। কারেনের আলিঙ্গন থেকে প্রায় জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিল সে। ওর আকস্মিক পরিবর্তনটা কারেন-এর কাছেও সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে গেল—কারেন বুঝতে পারল, ঠিক চরম মুহূর্তটিতেই বোধহয় সে যা পেতে যাচ্ছিল তা হারিয়ে ফেলল। আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না কারেন। বসে পড়ে ডেভ্-এর হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে সে বলে চলল—'ডেভ, ডেভ, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না। ঠিক আছে, তুমি যদি এখান থেকে না যেতে চাও, তাহলে আমিই সব ছেড়ে এসে তোমার কাছে থাকব। পাদ্রী ডেকে বিয়ের মন্ত্র না পড়লেও কোনো ক্ষতি নেই, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার দলবলকে আমি ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ওপর

আমি সত্যিই অন্যায় করেছি, তোমার সঙ্গে বিশ্বাঘাতকতা করেছি।—তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দাও। কত দিন, কত বছর ধরে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি, কষ্ট সহ্য করেছি, সেটাও একবার ভেবে দেখ। এই সুদূর উত্তরে স্ত্রীদের যে সব কাজ করতে হয়, আমিও তাই করব। তোমাকে রান্না করে খাওয়াব, তোমার কুকুরগুলোর দেখাশোনা করব। বরফের ওপর দিয়ে 'স্লেজ' চালাবার সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা তৈরি করব, নৌকা চালাবার সময় দাঁড় টানব। আমার শরীরে সেই শক্তি, মনে সেই ইচ্ছা আছে, বিশ্বাস কর।'

কারেন-এর সুঠাম, সবল দেহ সৌষ্ঠবের দিকে তাকিয়ে ডেভ বুঝতে পারল যে, কারেন মিথ্যা বলেনি। সত্যি সত্যিই এসব কাজ করবার মতো শক্তি ওর মধ্যে আছে। কিন্তু ডেভ-এর মন এতক্ষণ পুরোপুরি শক্ত হয়ে গেছিল, কারেন-এর প্রতিকোনোরকম দুর্বলতাই আর ওর মধ্যে ছিল না। ও নিচু হয়ে কারেনকে তুলে ধরল। তারপর কেবিনের দরজা খুলে কারেনকে বাইরে নিয়ে এসে বলল—'শোনো কারেন, তুমি যা বলছ, তা হতে পারে না। শুধু আমাদের দুজনকে নিয়ে কোনো চিন্তা করা এখন আর একেবারেই অসম্ভব। তোমাকে চলে যেতেই হবে। তোমাকে অবশ্য খুবই কঠিন, দুর্গম, লম্বা রাস্তা পেরিয়ে ফিরতে হবে, কিন্তু তার জন্য তোমার কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। যারা তোমাকে এখানে নৌকা চালিয়ে নিয়ে এসেছে, তাদের চাইতে ভালো দাঁড়ি সারা পৃথিবীতে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। ঠিক নিরাপদেই ওরা তোমাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এবার এসো, কেমন? কি, আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবে না?'

কারেন ইতিমধ্যেই নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একবার শেষ চেষ্টা করবার জন্য হতাশভাবে সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা, উইনাপি যদি রাজি হয়, তাহলে—?' কথাগুলো ওর গলায় আট্‌কে গেল। ডেভ অবশ্য বুঝতে পারল কারেন কি বলতে চাইছে। প্রথমটায় অন্যমনস্কভাবে সে-ও বলতে গেল—'হ্যাঁ, তাহলে—' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন কথাটার আসল মানে বুঝতে পেরে চম্‌কে উঠে জবাব দিল—'এ সব অসম্ভব চিন্তা মনে আনাই উচিত নয়। এ রকম কোনো কিছু হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

কারেন এতক্ষণে পুরোপুরি নিজেকে সামলে নিয়েছিল। ফিসফিস করে ও বলল—'ঠিক আছে। চলে যাচ্ছি আমি। বিদায় জানিয়ে আমাকে একটা চুমু দাও।'

নদীর ধারে ফিরে গেল কারেন—এতক্ষণে সে আবার কর্তৃত্বময়ী মিসেস্

শেথারের রূপে ফিরে গেছে। পিয়ের জেগেই ছিল। তাকে ডেকে উনি বললেন—'পিয়ের, তল্‌পি-তল্‌পা গোটাও। আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে।' ওঁর ফ্যাকাসে মুখে চরম হতাশার চিহ্ন অবশ্য পিয়ের-এর জিজ্ঞাসু চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। কিন্তু কোনোরকম কৌতূহল না দেখিয়ে বা প্রশ্ন না করে ও নিজের দলবলকে ঘুম থেকে তুলে এমন হাঁকডাক শুরু করে দিল যেন এই রাতের বেলায় এভাবে নদীর বুকে নৌকা ভাসানোটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেল। মিসেস্‌ শেথার নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের কর্মব্যস্ততা দেখছিলেন। হঠাৎ উনি টের পেলেন, পেছনে কারা যেন ছুটে আসছে। ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, উইনাপি প্রায় দৌড়ে তাঁর দিকে আসছে, সঙ্গে একপাল কুকুর। মিসেস্‌ শেথারের সামনে এসে দাঁড়াল সে। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে, প্রচণ্ড রাগে সমস্ত মুখটা যেন জ্বলছে তার। কোনরকম ভনিতা না করে ও সোজাসুজি মিসেস্‌ শেথারকে জিজ্ঞেস করল—'এই যে মেয়ে, বলি তুমি আমার মানুষটাকে কি করেছে বল দেখি? তুমি চলে আসার পর কেবিনে ঢুকে দেখি ও বিছানায় শুয়ে পড়েছে, চোখমুখ থম্‌থম্‌ করছে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে বলল, ওর নাকি কিছুই হয়নি, একটুখানি একলা শুয়ে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে সরে যেতে বলল। নিশ্চয়ই তুমি ওর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছে। আমি বুঝতে পারছি, তুমি একটা বাজে মেয়ে।'

মিসেস শেথার কোনো জবাব না দিয়ে একদৃষ্টে উইনাপির দিকে তাকিয়ে রইলেন—এই বুনো, আদিম মেয়েটাই তাঁর ডেভ-এর জীবনযাত্রার অংশীদার, এখুনি ফিরে যাবে ডেভ্‌-এর কাছে। আর তাঁকে এই রাতের অন্ধকারে একলা ডেভ্‌কে ছেড়ে নিঃশব্দে চলে যেতে হচ্ছে চিরদিনের মতো।

উইনাপির কথা তখনো শেষ হয়নি। সে আবার বলে চলল—'তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও, বুঝলে? আর কখনো যেন ফিরে এসো না। আমি রেড ইণ্ডিয়ান মেয়ে, আমার জীবনে এই একটাই পুরুষ আছে। কিন্তু তুমি আমেরিকান মেয়ে, দেখতে এত সুন্দর। গায়ের রং সাদা, চোখ নীল। অনেক পুরুষ মানুষই তোমার জীবনে আসবে। এখুনি বেরিয়ে পড়, ডাইয়ার দিকে চলে যাও। বিদায়।'

মিসেস্‌ শেথার এর পরে যা করলেন, তা দেখে পিয়ের তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল! হঠাৎ উনি উইনাপিকে জড়িয়ে ধরে তার দু'গালে দুটো চুমু খেয়ে ঝরঝর

করে কেঁদে ফেললেন। তারপর ভাঙা গলায় বলে উঠ্‌লেন—'যাচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি ডেভ্‌কে কিন্তু খুব যত্ন কোরো, কেমন? ওর সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার কোরো, ওর শরীরের দিকে নজর রেখো—বিদায়।' কথাগুলো বলেই উনি জোরে জোরে পা চালিয়ে নদীর পাড় বেয়ে নেমে নৌকায় গিয়ে উঠলেন। পিয়ের-ও ওঁর পিছু পিছু নৌকায় উঠে নৌকা ছাড়তে হুকুম দিল। মিট্‌মিটে তারার আলোয় একদল অশরীরীর মতো মাঝিরা দাঁড় বাইতে শুরু করল। দেখতে দেখতে অন্ধকার নদীর বুকে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল নৌকাখানা,—দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দও আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

———